চমৎকৃত হইল, এবং বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে না পারিয়া যুবকের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যুবক বলিলেন "যা বুড়ী তুই ঘর যা, আমি এইবার কোন্ রাস্তায় যাব বল্ দেখি"। বৃদ্ধা আর দেখিতে পাইতে ছিলনা, তত্রাচ কৃতজ্ঞতা বশে আরও কিছুদূর যুবকের সঙ্গে যাইয়া বলিল এই সোজা রাস্তা বাবা, ঐ বামুণদের সব ঘর দেখা যাচ্ছে। তোমারা কি বাবা।

যুবক। আমরাও বামুণ।

বৃ। তা বেশ হয়েচে, গাঁ ঢুকতেই বামুণ বাড়ী। আমি বাবা রাত্তিরে ভাল দেখিতে পাইনা, তা নাহলে তোমাকে পঁহুচে দিয়ে আস্তাম। এখন প্রণাম করি।

যু। না বুড়ী তুই ঘর ফিরে যা, অন্ধকারে পড়ে গিয়ে কি আবার হাত পা ভাঙ্গবি। আমি এ রাস্তাটুকু একলা বেশ যেতে পারিব। বৃদ্ধা প্রণাম করিয়া ফিরিল। যুবক বৃদ্ধার প্রদর্শিত পথে গ্রামাভিমুখে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গরিবের কুটীরে।

ঝড় বৃষ্টির পর জগত সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষের পত্র পর্য্যন্ত আর নড়িতেছে না। প্রকৃতি যেন স্নানান্তে স্থিরভাবে আপনচিত্ত আপনার নির্ম্মাতার চিত্তে সমর্পণ করিয়াছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু পশ্চিমাকাশের সায়ংকালীন মনোরম শোভা এখনও দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছে। অন্ধকার ক্রমে বনভূমি, উদ্যান জনপদ আকাশ সমস্তই গ্রাস করিতেছে। আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে ও ফুটিতেছে। পথ পার্শ্বস্থ বৃক্ষে ঝিঁ ঝিঁ পোকা সপ্তমে স্বর ধরিয়াছে। পুষ্করিণী তীরে ভেককুল নূতন জল পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিয়াছে, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটা বৃহদাকার ভেক তাহাদের বিকট রবে সে একতান স্বরের মিষ্টতার হ্রাস করিতেছে। উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে জল পতনের কুল্ কুল্ শব্দ চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে। পথ কর্দ্দমময় হইয়াছে। যুবক ধীর পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রাম সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন গ্রামের অপর প্রান্তস্থ দেবালয় হইতে সান্ধ্য সংকীর্ত্তন কালীন খোল কর-তাল ধ্বনি শ্রুত হইল বৃক্ষাবলীর মধ্য দিয়া গৃহস্থদের প্রদীপালোক দেখাদিল। শিশুর রোদনধ্বনি ও দুই একবার শুনিতে পাওয়া গেল। যুবক বুঝিতে পারিলেন লোক-নিবাস অতি নিকটেই। এক গাভী রাস্তায় দাঁড়াইয়া পার্শ্বস্থ বন্য পত্র চর্ব্বনে নিযুক্ত ছিল। রাখাল ভূতভয়ে ততদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছেনা, নানারূপ প্রচলিত শব্দে গাভীটীকে ডাকিতেছে। গাভী কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করিতেছে না। যুবককে আসিতে দেখিয়া রাখাল কাতর স্বরে বলিল "কে আসচ ভাই, আমার

গাইটিকে ফিরাইয়া দাওত”। যুবক হস্তস্থ যষ্টি উঠাইলেই গাভীটী রাখালের দিকে ধাবিত হইল। যুবক রাখালের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ওরে সামনে এই ঘরখানি কাদের জানিস্”। রাখাল যুবকের দিকে দৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে নূতন লোক বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি কাদের বাড়ী যাবে”।

যু। বামুণদের।

রা। বামুণদের তুমি কুটুম নাকি।

যু। হাঁ রে, আমাকে বামুণদের বাড়ীটা দেখিয়ে দিবি চল্ দেখি।

রা। তুমি বামুণদের কুটুম আর তাদের ঘর জাননা, আঁধারে কি ধাঁধাঁ লেগে গেছে নাকি। দেখে নাও তুমি বামুণদের বাড়ী, আমার বলে এখন ক্ষিদেয় পেট জ্বলচে।

এই বলিয়া রাখাল গাভীর লাঙ্গুল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্বগৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। যুবক মনে মনে হাসিতে হাসিতে সম্মুখস্থ এক গৃহে যাইয়া উঠিলেন। এ গৃহখানি একটী বৃহৎ পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপ; অবস্থা সম্পূর্ণ পরিত্যক্তের ন্যায়; চালখানি ঝাঝরা, কোথাও আচ্ছাদন আছে কোথাও নাই। বসিবার স্থান সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে; তাহাতে আবার অপরিস্কার; গো, মেষ, ছাগলের মলে পরিপূর্ণ। যদি আলোক থাকিত তাহা হইলে আরও দেখিতে পাওয়া যাইত দেওয়ালের গায়ে খড়ি বা কয়লার অঙ্কে কত হস্তী অশ্ব মনুষ্য প্রভৃতির চিত্র চিত্রিত আছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দুর্ব্বাক্যও লিখিত আছে। যুবকএই চণ্ডীমণ্ডপে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। দেখিলেন কয়েকটী নিশাচর পক্ষির যাতায়াত ভিন্ন আর কোন জীবের যাতায়াত সেখানে নাই। অন্ধকার খুব ঘোর হইয়া উঠিল। যুবক সেই স্থান হইতে উঠিয়া যে দিক হইতে মনুষ্য কণ্ঠধ্বনি মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইতেছিল সেইদিকে চলিলেন। কয়েকটী ভগ্নগৃহ এবং একটী বহুল তুলসী বৃক্ষ পরিপূর্ণ ইষ্ঠক নির্ম্মিত ভগ্নকায়

ঠাকুরবাটী পার হইয়া তিনি একটী গলিতে উপস্থিত হইলেন। গলির দুই পার্শ্বে কয়েকখানি বাড়ী। কথাবার্ত্তা বাড়ীর মধ্যেই হইতেছে, বাহিরে কোন লোকের যাতায়াত নাই। এক ভগ্ন প্রাচীরের মধ্যদিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন একটী যুবতী রমণী একটী হৃষ্ট পুষ্ট শিশুকোলে লইয়া বারান্দায় বসিয়া সুললিত সুরে "ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল" গান ধরিয়াছেন। একটী বৃদ্ধা নিকটে বসিয়া মালা ঘুরাইতেছেন ও শিশুটীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। শিশু অনেক চেষ্টাতেও চক্ষু মুদিতেছে না। মধ্যে মধ্যে ঝাঁকিয়া উঠিয়া বৃদ্ধার হস্ত হইতে মালাটি কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেছে। যুবক বড় মুস্কিলে পড়িলেন। কেমন করিয়া অজানিত গৃহে প্রবেশ করেন। কোন পুরুষ মানুষের সহিত দেখা হইতেছে না। ভদ্রলোকের গৃহ সন্নিকটে অন্ধকারে এমন ভাবেই বা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, লোকে দেখিলেই বা বলিবে কি। শরীরও ক্লান্ত হইয়াছে, বস্ত্রাদি সব সিক্ত। তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অপরিজ্ঞাত-পূর্ব্ব অবস্থায় পতিত হইবার জন্য যে অল্প-বয়স-সুলভ কৌতূহল, তাহা শুকাইয়া গেল। তিনি পুনরায় সেই চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। মনে করিলেন যদি কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, সেই স্থানেই বসিয়া দাঁড়াইয়া কোনরূপে রাত্রিটা কাটাইয়া দিবেন। এমন সময়ে দেখা গেল একটি লোক গুন্‌গুন্ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে সেই দিকে আসিতেছেন। লোকটির কোঁচার টেপটি গায়ে দেওয়া, স্কন্ধে একখানি গামছা; অন্ধকারকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া, হাতের তালিতে নিজের গানে তাল দিতে দিতে ধীর ও নিশ্চিন্ত পদ বিক্ষেপে লোকটি সেই দিকে আসিতেছে। যুবকের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কে।" যুবক উত্তর করিলেন "আমি একজন অপরিচিত লোক"।

লো। অপরিচিত লোক রাত্রিতে এখানে ?

যু। আমি যাইতে ছিলাম কামিনীপুর, পথে ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় যাইতে পারিলাম না, রাত্রিতে এই গ্রামে থাকিবার মানসে আসিয়াছিলাম কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এদিকে মানুষের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিয়াছিলাম।

লো। আপনার নিবাস কোথায় ?

যু। দেবগ্রাম।

লো। মহাশয়ের নাম ?

যু। শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

লো। পিতার নাম ?

যু। শ্রীলোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোকটি যুবকের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন "সেকি ! আপনি দেবগ্রামের লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ! আপনি একক এরূপ অবস্থায় কামিনীপুর যাইতেছিলেন কেন ?

বিনয়কুমার। কামিনীপুরে আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলাম। বন্ধুর সহিত দেখা করিতে আবার লোক-জন সঙ্গে লওয়া আমার ভাল লাগে না। আর কামিনীপুর ত আমাদের গ্রাম হইতে অধিক দূর নয়, কেবল ঝড়বৃষ্টির জন্য দেরি হওয়ায় এরূপ গোলযোগে পড়িলাম।

লোকটি। মহাশয় দূর অধিক হউক আর কম হউক আপনাদের মতন লোক্‌কে কি রাস্তায় একলা বাহির হইতে আছে ? সে যাহা হউক আমাদের সৌভাগ্য বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছে। আপনার পিতা একজন দেশ-মান্য মহাশয় লোক। তাঁর পুত্রের যে আমাদের মতন লোকের বাটীতে শুভাগমন হইবে তাহা স্বপ্নের অতীত। আসুন আসুন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

বিনয়কুমার লোকটির অনুসরণ করিলেন। নাম জিজ্ঞাসা করিয় জ্ঞাত হইলেন তাঁহার নাম গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গোপালচন্দ্র পূর্ব্বোল্লিখিত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুদূর যাইয়া একটি অর্গলবদ্ধ দরজায় আঘাত করিলেন। ভিতর হইতে বালিকা-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা হইল "কেগা, গোপাল দাদা!" গোপালচন্দ্র উত্তর করিলেন "হাঁগো, শীঘ্র দরজা খোল।" বালিকা তৎপর আসিয়া দরজা খুলিল। অন্ধকার রাত্রি গরমের দিন, সাপের ভয়, তাহাতে গোপালচন্দ্র এত অধিক রাত্রি করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন এজন্য বালিকা দরজা খুলিতে খুলিতে তাঁহাকে অনেক স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনা করিতেছিল। দরজা খুলিবার পর একজন অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বালিকার মুখ চাবিবন্ধ হইল। গোপাল চন্দ্র বলিলেন "দিদি, আমার জন্য তোদের ভয় নাই, সাপ আমার পায়ের শব্দে তিন ক্রোশ তফাতে পলায়; এখন তুমি শীঘ্র এক গাড়ু জল ও একটি প্রদীপ পশ্চিম দ্বারী ঘরের বারান্দায় দিয়া যাও দেখি"। বালিকা আপন সংস্কারানুসারে তৎপর বসিবার বিছানা, পদপ্রক্ষালনের জল ও একটি প্রদীপ সেই ঘরে আনিয়া দিল। বিনয়কুমার হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া এবং গোপালচন্দ্রের অনুরোধানুসারে সিক্ত বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক একখানি শুষ্ক বসন পরিধান করিয়া বসিলেন। গোপাল কয়েক খানি বাতাসা ও একগ্লাস সুশীতল জল তৎপর আনিয়া দিলেন। বিনয়কুমার ধনীর সন্তান, অনেক প্রকার আরাম উপভোগ করিয়াছেন; কিন্তু আজ এই পথ শ্রান্তির পর কয়েক খানি বাতাসা ও একগ্লাস জল খাইয়া যে আরাম অনুভব করিলেন তাহা পূর্ব্বে কখন করেন নাই।

বিনয়কুমার পশ্চিম দ্বারী ঘরের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। তাহার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্রতর পূর্ব্বদ্বারী ঘর। এইটি ঠাকুর ঘর। ইহার আশে পাশে, সম্মুখে, জুঁই, জবা, বেলা, বক, কাঞ্চন, করবরী প্রভৃতি অনেক-গুলি পুষ্প বৃক্ষ; তাহাদের অনেকগুলিতেই স্তবকে স্তবকে ফুল; অন্ধ-

কাহের মধ্যেও গাছগুলি যেন হাসিতেছে এবং ক্ষুদ্র বাড়ীটীকে সৌরভ-ময় করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর দিকের প্রাচীরে ভিতর বাড়ী যাইবার একটি ক্ষুদ্র দরজা আছে। ভিতর বাড়ীতে একটি বৃহৎ দক্ষিণ দ্বারী ঘর, একটি রাঁধিবার ঘর এবং ক্ষুদ্র একটি গোশালা। বিনয়কুমার আরামে বসিয়া বাড়ীটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাড়ীটি অতি পরিস্কার পরি-চ্ছন্ন; ফুলগাছগুলি বেড়ার মধ্যে সুবিন্যস্ত ভাবে রহিয়াছে; বাহিরে উঠানটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, কোথাও সামান্য মাত্র আবর্জ্জনা নাই। স্থানটি তাঁহাকে অতি পবিত্র ও শান্তিময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গোপাল চন্দ্র তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া ভিতর বাড়ীতে গেলেন। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "গোপাল দাদা ইনি কে গা?" গোপাল উত্তর করিলেন "ওঁর বাড়ী দেবগ্রাম, কামিনীপুর যাচ্ছিলেন, জলঝড় হওয়ায় যাইতে পারেন নাই। বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, একটু ভাল করে খাওয়াবার যোগাড় করিতে হবে, জ্যেঠাই মা কোথায়?" বালিকা বলিল "মায়ের আজ একাদশী, দিনের বেলায় বড় গরম হওয়ায় একাদশী বড় লাগিয়াছে, বৃষ্টির পর ঠাণ্ডা হওয়ায় একটু ঘুমিয়েচেন।" গোপালচন্দ্র দক্ষিণদ্বারী ঘরের ভিতরে গেলেন। মেজের উপর এক ছিন্ন পুরাতন পাটীতে একটি শীর্ণ দেহা বৃদ্ধা অতি অবসন্ন ভাবে নিদ্রিতা। গোপাল তাঁহাকে উঠা-ইতে একটু ইতস্ততঃ করিলেন। বালিকা বৃদ্ধার শির পার্শ্বে যাইয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন "মা মা"! বৃদ্ধা সসব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এঁ্যা এঁ্যা কেন মা, শরত কি বাহিরে যাবে?"

বা। না গো একটি লোক এসেচে।

গো। জোঠাই মা, একটি ব্রাহ্মণের ছেলে কামিনীপুর যাইতেছিল, পথে জলঝড় হওয়ায় যাইতে পারে নাই, রাত্রিতে এইখানে থাকিবে, তাহার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বৃদ্ধা উঠিয়া বসিলেন; যে জীর্ণ শীর্ণদেহ নৈদাঘ একাদশীর তীব্র

যাতনায় অজ্ঞানাভিভূত হইয়া, অর্দ্ধ মৃতবৎ শয্যায় বিলীন ছিল, দুর্য্যোগ রাত্রিতে ব্রাহ্মণ অতিথির সমাগম বার্ত্তা শুনিবা মাত্র তাহা যেন জীবন প্রাপ্ত হইল। বৃদ্ধা উঠিয়া বসিয়াই বলিলেন "তা ভাবনাকি, এখনই সব ব্যবস্থা হবে। মা সুকো আমি কাছে বসে থাক্‌বো, তুমি দুটি ভাত আর শরতের জন্য যে মাছ আছে তাহার ঝোল রাঁধিয়া দিতে পারিবে না?" বালিকা সুকুমারী উত্তর করিল "তা পারিব না কেন, খুব পারিব, তোমার যদি কষ্ট হয়, তুমি কাছে বসিয়া না থাকিলেও, কেবল কি করিতে হবে বলিয়া দিলেই সব পারিব"। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন "দৈবসাবার জন্য যে দুধ আছে তাহাতে কি দমল দিয়াছ?" বালিকা বলিল "না"। বৃদ্ধা বলিলেন "তবে বেশ হয়েচে সেই দুধ গরম করিয়া দিলেই হবে, চল আমি রান্নাঘরে যাইয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিইগে।" গৃহ পার্শ্বে তক্তপোষের উপর একটি বালক নিদ্রিত ছিল, এই সকল কথাবার্ত্তার সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং একলম্ফে নীচে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েচে" মা! গোপাল তাহার হাত ধরিয়া বলিল "এস দেখসে বাহিরে কে আসিয়াছে।" বালক বাহিরে যাইয়া গুরু মহাশয় শিক্ষিত প্রথায় বিনয় কুমারকে পরিচয় দিয়া এবং তাঁহার পরিচয় লইয়া নানারূপ গল্পে নিযুক্ত হইল। এ দিকে মাতা ও কন্যার যত্নে শীঘ্রই আহারীয় প্রস্তুত হইল। গোপালচন্দ্র বিনয়কুমারকে ভিতর বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া দক্ষিণ দ্বারী ঘরের বারান্দায় বসাইয়া যত্নের সহিত আহার করাইলেন। বৃদ্ধাও আসিয়া, কাছে বসিলেন। বৃদ্ধার বয়স কিঞ্চিদূন পঞ্চাশ, কিন্তু দেখিলে তদপেক্ষা অনেক অধিক বোধ হয়; বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, কিন্তু কালের ছায়ায় সে উজ্জ্বলতা অনেক বিনষ্ট হইয়াছে, দেহ মধ্যমাকৃতি এবং সুগঠিত, কিন্তু ক্ষীণ ও সর্ব্বাঙ্গে অবসাদময়, দৃষ্টি বিশাদ ভরা, কিন্তু গভীর স্নেহপূর্ণ; সমগ্র মুখশ্রী সুন্দর শান্ত এবং জননী-ভাবোদ্দীপক। তিনি বিনয় কুমারের কাছে বসিয়াই বলিলেন "ওমা, এ'য় দেখছি ছেলে

মানুষটি, কেন বাবা এমন ঝড় ঝটীর দিনে, অবেলায় বাড়ী হতে বেরিয়ে ছিলে, কত কষ্টই না হয়েছে। তুমি না হয় ছেলে মানুষ তোমাদের বাড়ীর লোকের মানা করা উচিত ছিল।

বি। মা আমার মানা করেছিলেন, কিন্তু আমার কি ঝোঁক হইল আজই কামিনীপুর যাব, তাঁর কথা শুনিলাম না।

বৃ। এমন কায কি করে বাবা, যে দুর্য্যোগ আজ কাটিয়া গিয়াছে রাস্তায় কত রকম বিপদ হতে পারিত। খাও বাবা, ভাল করিয়া খাও, গরিবের ঘরে যা কিছু আছে ভাল করিয়া খাও।

বি। অভাব ত কিছু দেখিতেছি না, দুধ, ঘী, মাচ সকলই আছে, আর চাই কি, আমি অতি পরিতৃপ্তির সহিতই আহার করিলাম, সেজন্য আপনাদিগকে কিছুই ভাবিতে হইবে না।

বৃ। বাবা যখন সময় ভাল ছিল, তখন রাত দুপহরে দশ জন লোক আসিলেও কিছুমাত্র ভাবি নাই, একলা সব করিয়াছি। সে সময় গেছে, শরীর গেছে, মনের সুখ শান্তি সবই গেছে, আর অতিথি সজ্জনের যত্ন হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। ভগবানের ইচ্ছা, তা না হলে যে বৈঠকখানা সারারাত লোকজনে, গানে গল্পে, হাসি তামাসায়, গম্ গম্ করিত, আজ তাহা শেয়াল কুকুরের ঠাঁই হয়েছে। মানুষ বিনে এ দুর্দ্দশা।

বৃদ্ধার নয়নদ্বয়ে অশ্রু জমিতে ছিল, কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল। বিনয়কুমার ইহা দেখিয়া তাঁহাকে অন্য মনস্ক করিবার জন্য নিকটে উপবিষ্ট বালক শরতের সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধারও সস্নেহ দৃষ্টি বালকের দিকে আকৃষ্ট হইল।

আহারান্তে বিনয়কুমার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। গোপালচন্দ্র তামাকু সেবন করিতে করিতে তাঁহাকে গ্রামের, পরিবারের, নিজের সম্বন্ধীয় কোন কথাই বলিতে বাকি রাখিলেন না। বিনয়কুমার আগ্রহের

আমি এখনই কামিনীপুর যাইব, আমার ধুতিখানা ও চাদরটা অনুগ্রহ করিয়া আনাইয়া দেন।

গো। কামিনীপুর এখান হইতে অধিক দূর নয়। এক ক্রোশ কি তিন পোয়া রাস্তা হবে। আপনার ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই।

বি। তা হলেও একটু সকাল সকাল যাইতে ইচ্ছা করি।

"আচ্ছা" এই বলিয়া গোপাল চন্দ্র বাড়ীর দিকে গেলেন। ক্ষণ কাল পরেই বালক শরৎ বিনয়কুমারের বস্ত্রাদি আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। বিনয়কুমার প্রীতির চক্ষে একবার সেই প্রফুল্ল বদন বালকটির দিকে চাহিয়া গোপালচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "দেখুন মহাশয় এই বালকটি বড় বুদ্ধিমান বলিয়া বোধহয়। ইহাকে কি লেখা পড়া শিখাইবার কোন উপায় করিতেছেন?"

গো। কি উপায় করিব বলুন। এই আপনি যে গ্রামে যাইতেছেন, সেখানে একটি ভাল স্কুল আছে। কিন্তু সেখানে ভর্ত্তি করিলে মাসে এক টাকা করিয়া বেতন দিতে হয়। তাহা ছাড়া পুস্তকের দাম আছে; স্কুলে পড়িলেই ভাল জুতা, ভাল কাপড় চাই, আর ছেলে মানুষ, এতটা রাস্তা হাঁটিয়া প্রতিদিন যাইতে আসিতে হইলে সেখানে কিছু খাবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এতগুলি খরচ মাসে মাসে যুটিয়া উঠে না। আর গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে, ইংরেজী শিখিয়াই বা কি হইবে? সেইজন্য পাঠশালাতেই বাঙ্গলা পড়িতেছে। শরতের কিন্তু স্কুলে পড়িতে বড় সাধ।

বিনয়কুমার বালকটির মস্তকে হাত দিয়া সস্নেহ ভাবে বলিলেন—"কি হে তোমার ইংরাজি পড়িতে ইচ্ছা হয়"? বালক মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল—"হুঁ"। বিনয়কুমার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আপনারা যদি এই ছেলেকে পড়ান, আমি বিশেষ সাহায্য করিতে রাজি আছি, আর আপাততঃ ইহার পুস্তকাদি খরিদ করার জন্য আমি ১০টি টাকা দিতেছি গ্রহণ করুন।"

গোপাল প্রথমতঃ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন ; কিন্তু বিনয়কুমারের নির্ব্বন্ধাতিশয়জন্য অবশেষে গ্রহণ করিলেন, এবং বিনয়-কুমারের ও তাঁহাদের বংশের অনেক প্রশংসা করিতে করিতে কামিনী-পুরাভিমুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বিনয়কুমার কামিনীপুরসন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। আজ বৈশাখের প্রথম দিন। গ্রামবাসিনী প্রবীণাগণ পট্টবসনে শোভিতা হইয়া গ্রামসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক ধীরে ধীরে জলপূর্ণ কলসি কক্ষে আপন আপন প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষের দিকে আসিতেছেন। তাঁহা-দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকারা, কেহ ঠাকুরমা, কেহ দিদিমা, বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে, এক একটি ছোট ছোট জল পাত্র লইয়া, প্রাপ্তবয়স্কা রমণীদিগের গমনভঙ্গী অনুকরণ করতঃ পূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে দলে দলে আসিতেছে। পূতদেহা প্রযতমনা প্রবীণারা স্নেহ ভরে জল-কলস অশ্বত্থ মূলে ঢালিয়া দিলেন। দেখা দেখি বালিকারাও তাহাদের ক্ষুদ্র কলসের জলটুকু সেই মূলদেশে ঢালিয়া দিল। অশ্বত্থ বৃক্ষগুলি সেই স্নেহ ধারা প্রাপ্ত হইয়া যেন আনন্দে অধীর হইয়া, আপনাদের ছোট ছোট, কচি কচি, সবুজ পাটল পত্রগুলি কাঁপাইয়া দিল। বিনয়কুমার এই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এক ভাবে দেখিলে বাস্তবিকই এই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রথাটি অতি সুন্দর ও সুফল প্রসবী। এই প্রখর রবি-কিরণ-দগ্ধ দেশে, মরুতুল্য প্রান্তর মধ্যে, এক একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণের যে ফল, আর এক একটি বট অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতেও সেই ফল। বরং বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার অধিক ফল। ইহাদের সুপক্ক ফলে কতশত প্রকৃতি-শোভন কলকণ্ঠী বিহগকুল প্রতিপালিত হয়। যিনি কখন পথ-শ্রান্ত ও রৌদ্র-তাপিত হইয়া, সুকোমল-তৃণাচ্ছাদিত বহুবিধ-বিহগ-কূজন পূরিত নিবিড় বট অশ্বত্থ বৃক্ষ তলের সুশীতল শান্ত ছায়ায় বসিয়া শ্রমোপনোদন করিয়াছেন, তিনিই জানেন ইহা বিচিত্র কারপেট মণ্ডিত বহুমূল্য দ্রব্যাদি-

সহিত সব শুনিলেন, গ্রামের এবং যে পরিবারের তিনি অতিথি হইয়াছেন সেই পরিবারের অতীত সুখের অবস্থা এবং বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া মর্ম্ম পীড়িত হইলেন। কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইল। গোপালচন্দ্র স্বহস্তে শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বিনয়কুমার এই গরিব পরিবারের সজ্জনতা ও আতিথেয়তার মনে মনে প্রশংসা করিতে করিতে শয়ন করিলেন। তাঁহার সংসার ও মানব চরিত্র সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা যেন আজ উপরের স্তর হইতে কিছু ভিতরে প্রবেশ করিল। তিনি অনেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের বাড়ী গিয়াছেন, আদর যত্ন পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের প্রসরতা এত বৃদ্ধি পায় নাই, অনেক ধনীর গৃহে অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, বহুবিধ ভোগ্য বস্তুতে সেবিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এত পরিতৃপ্তি পান নাই। সে সকল আদর যত্ন সম্ভাষণ আজ যেন তাঁহাকে কৃত্রিম বাহিরের বস্তু বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "আজ যদি কোন সুসজ্জিত আরাম-গৃহোপবিষ্ট সুললিত সঙ্গীত-শ্রবণ-নিযুক্ত প্রিয়ভাষী-বয়স্য-দল-বেষ্টিত ধনী সন্তানের গৃহে আমার মত কোন অসহায় অতিথি আসিত, তাহা হইলে কি সে এইরূপ সহৃদয় ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইত? হয়ত সে দ্বারবান কর্ত্তৃক অতি পরুষ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইত। ধনীর ঘরে মনুষ্যত্ব প্রায়ই বাহিরের পরদায়ও অভিমানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। গরিবের ঘরেই যথার্থ প্রাণস্পর্শী সহৃদয়তা পাওয়া যায়, গরিবের ঘরেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। আহা এই গরিবের কুটীর কি যথার্থ স্বর্গ নয়"! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিনয়কুমার নিদ্রিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্ধু সম্মিলনে।

রাত্রি অবসান প্রায়। বিনয়কুমারের নিদ্রা ভাঙ্গিল; তিনি আর শয্যায় থাকিতে না পারিয়া বাহিরে আসিলেন। পূর্ব্ব দিকে প্রভাত তারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, পশ্চিমে কৃষ্ণ-পক্ষীয় একাদশীর ক্ষীণ চন্দ্রমা শোভা পাইতেছে; জ্যোৎস্না ফিকে ফিকে হইয়াছে; তাহাতে নবোদ্গত কচি কচি অশ্বত্থপত্রগুলি ঝিক্ মিক্ করিতেছে; স্নিগ্ধ বাতাস মৃদু মৃদু বহিতেছে। বিনয়কুমার একবারে বিগত সন্ধ্যায় যে চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহার সম্মুখস্থ ময়দানে আসিয়া পদাচারণ করিতে লাগিলেন এবং পুরাতন বর্ষের কার্য্য কলাপ স্মরণ করতঃ ক্ষিণ্ণ মনে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহাকে বিদায় দিয়া পবিত্র মনে আশ্বস্তচিত্তে নূতন বর্ষের সমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক লোহিত-চ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, চন্দ্রমা রহিল, কিন্তু চাঁদিমা মিশাইয়া গেল। চতুর্দ্দিক হইতে বিহগকুল কলরব করিয়া উঠিল। চড়ুই ঝাঁকে ঝাঁকে কিচির মিচির করিতে করিতে গৃহস্থের ঘুম ভাঙ্গাইতে লাগিল। কাক কা কা করিতে করিতে দুই চারিটা করিয়া গৃহের চালে আসিয়া বসিল, ক্রমে উঠানে নামিল এবং ঘরে দ্বারে নানা স্থানে আহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। গোপালচন্দ্রও এই সময় হুঁকা হাতে করিয়া কাশিতে কাশিতে বাহিরে আসিলেন এবং বিনয়কুমারকে দেখিয়া বলিলেন "আপনি যে এত সকালেই উঠিয়াছেন! নিদ্রা কি তবে ভাল হয় নাই" ?

বি। নিদ্রা বেশ হইয়াছে। আমি শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে আর বিছানায় থাকিতে পারি না, সেই জন্য বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

শোভিত সুন্দর প্রাসাদ অপেক্ষাও কত অধিক আরাম-প্রদ ও নিত্য-অভিনবত্ব-গুণ বিশিষ্ট। কিন্তু আজকাল সাধারণ অর্থক্ষয়কারী বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী হইতে সামান্য কন্ট্রাক্টর পর্য্যন্ত অনেকগুলি জীবের পেট ভরাইয়াও যে বৃক্ষরোপণ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, হিন্দু সমাজ নেতৃগণ সে কার্য্যটী লোকের ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া কেমন সুকৌশলে একটি স্বেচ্ছাপ্রবর্ত্তিত সমাজিক অনুষ্ঠানরূপে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

বিনয়কুমার ক্রমে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। স্নাতা, পরিস্কৃত-বসন-পরিহিতা বালিকা ও নব বধূগণ নব বর্ষারম্ভ দিনে নূতন নূতন ব্রত গ্রহণ করিয়া উল্লাসে এ বাড়ী ও বাড়ী করিয়া বেড়াইতেছে, এবং ব্রত পালন ও শুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে প্রবীণাদের নিকট নানাবিধ উপদেশ লইতেছে। কেহ কেহবা ব্রাহ্মণপ্রতীক্ষায় ফল হস্তে পথপার্শ্বে দণ্ডায়মানা আছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে বিনয়কুমার কামিনীপুর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। নব বর্ষারম্ভে নূতন ব্রত-গ্রহণরূপ অনুষ্ঠানের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল,আমিও কি এইরূপ শুদ্ধাচারী ও সংযমী হইয়া, সজীব ভাবে বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন কর্ত্তব্য ব্রত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবনা, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রতময় এই জীবন রূপ সুদীর্ঘ কঠোর ব্রত প্রকৃত ব্রতাবলম্বীর ন্যায় নিরলস ভাবে প্রযত মনে ও একান্ত এক লক্ষ্যতার সহিত উদ্যাপন করিতে সমর্থ হইব না ?"

বিনয়কুমার কামিনীপুর গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি বালকের সহিত আলাপ করিয়া লইলেন, এবং তাহার সহায়তায় শীঘ্রই বন্ধুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র, বিগত দিনে বিনয়কুমার না আসায় তাঁহার আগমনের আশা একবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ; আজ হঠাৎ বিনয়কুমারকে দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অকপট হাসিভরা মুখে, আবেগপূর্ণ হৃদয়ে, তিনি বন্ধুকে আলিঙ্গন

করিয়া সমাদরে বৈঠকখানায় বসাইলেন। অনেক দিন পরে দুই বাল্য বন্ধুর সাক্ষাৎ; কথা আর শেষ হয় না; হাসি গল্প আর ফুরায় না; ক্রমে বেলা হইল। উভয়ে স্নান আহার করিলেন এবং তৎপরে, মাঝের বাড়ীতে শ্রীশচন্দ্রের এক নিভৃত গৃহ ছিল, তথায় যাইয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন এবং উভয়ে প্রাণ খুলিয়া নিজের নিজের সুখ দুঃখের, পরীক্ষার পাস ফেলের, ভবিষ্যতের আশা উন্নতির, কথা কহিতে লাগিলেন। তৎ সঙ্গে সঙ্গে অনেক হাসি গল্পও চলিতে লাগিল। অধিক সময়েই শ্রীশচন্দ্র বক্তা, এবং বিনয়কুমার শ্রোতা। একবার বিনয়কুমার বলিলেন "ভাই শ্রীশ তোমার ঘরখানা ত বেশ সাজান গোজান দেখ্‌চি, আর যেখানকার যে জিনিষটি বেশ ব্যবস্থা মত আছে। এ নিশ্চয়ই নিজের হাতের সাজান নয়।"

শ্রীশ। নিজের হাতে কি ভাই এত সাজাইয়া রাখা যায়!

বি। তাই ত দেখ্‌চি, আমি কত চেষ্টা করি আমার পড়িবার ঘরখানি বেশ ব্যবস্থা মত রাখিব, তা কোন মতে পারি না। সৌখিন হাতের সহায়তা না থাকিলে দেখ্‌চি ঘর সাজাইয়া রাখা হয় না।

শ্রী। নিজের দোষেই ত সে সহায়তা পাও নাই। এত দিন কি আর বাকি থাকিত, কি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ "শীঘ্র বিবাহ করিব না।" নিতান্ত আহম্মকি আর কি, বিবাহ করিলে কি কখন উন্নতির বাধা হয়? আর যাদের হয়, তাদের বিবাহ না করিলেও হয়, না করিলে বরং অধিক হয়, হয় ত একবারে উচ্ছন্ন যায়। ওসব কেবল হুজুগের কথা। ভাগ্যে বাবা ছেলে বেলায় বিয়েটা দিয়ে দিয়েছিলেন, তাই বেঁচে আছি, দুঃখের মধ্যেও প্রাণটা ঠাণ্ডা থাকে।

বিনয়কুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমার কথা ছাড়িয়া দাও, এখন বল দেখি সরোজ লোকটা কেমন, তোমার মত বেশ আমুদে ত? তা না হলে প্রাণ এত ঠাণ্ডাই বা থাকিবে কেন!"

শ্রী। তা ভাই ঠিক মনের মানুষ বটে, আমুদে ত ষোল আনা, তার উপর অন্য গুণও সব আছে। রাগ, কি কাহারও উপর বিরক্তির ভাব, সে সকল কিছুই নাই। সমস্ত দিনটি পরিশ্রম করে, আর পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে হাসি ও রসিকতাটুকু চারপোয়া আছে। আর বাড়ীর সকলেরই প্রিয়পাত্র। আজ বাড়ীতে নাই, তা না হলে এতক্ষণ কোন না কোন পরিচয় নিশ্চয়ই পাইতে।

বি। কোথায় গিয়াছে ?

শ্রী। আমাদের এক জ্ঞাতির বাড়ী বিবাহ আছে, সেখানে গিয়াছে।

বি। তবে ত দেখচি এখন রং মেখে টুকটুকে হয়ে আসবে।

শ্রী। শুধু নিজে হয়ে আস্‌বে, কত লোককে টুকটুকে করে আস্‌বে।

বি। আচ্ছা তোমাদের ঘরে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে দেখ্‌লাম। সবগুলিই কি তোমার দাদাদের ?

শ্রী। আমার দুই কুলীনে দেওয়া ভগিনী আছেন, তাঁদেরও ছিলে পিলে অনেকগুলি আছে।

বি। তোমাদের পরিবারটি ত ভাই কম নয়। আবার তুমিও ত শীঘ্রই বংশ বৃদ্ধির সহায়তা আরম্ভ করিবে। তোমার দাদাদের বেতন ত অধিক নয়। তুমি কেন অত তাড়াতাড়ি পড়াটা ছাড়িয়া দিলে। অল্প বিদ্যায় আজ কাল কি আর কিছু হবে ?

শ্রী। বেশী বিদ্যার আশা থাকিলে ত পড়িব। অঙ্কে আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাতে এল্‌, এ পাশ করা আমার পক্ষে একবারে অসম্ভব ; না হক্‌ কেন কৃষ্ণের জীবকে কষ্ট দেওয়া। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া পড়া ছাড়িয়া দিলাম। আর ভাই আজকাল তোমার বি, এ, পাশ করিয়াই কি হবে বল দেখি ; হয় উকিল হইয়া ভেড়েণ্ডা বীজ ভাজা, না হয় ৩০৲। ৪০৲ টাকার চাকরীর জন্য নানাস্থানী হইয়া বেড়ান। তার চেয়ে আমার

গ্রামের মাইনার স্কুলের হেড্ মাষ্টারীই ভাল। এ ত ঘরে বসে পঁচিশ টাকা পাচ্ছি, এ বিদেশের ৫০৲ টাকার সমান। ওহে বিনয় তুমি এই দিকে একটু আড়াল হইয়া সরিয়া ব'সত।

বি। কেন?

শ্রী। আবশ্যক আছে, ব'সনা।

বিনয়কুমার বন্ধুর কথামত সরিয়া বসিলেন। শ্রীশচন্দ্র বাহিরে আসিলেন। দূর হইতে একটি শব্দ শুনিয়াই শ্রীশচন্দ্র বাহিরে আসেন, সে শব্দ বিনয়কুমারের কানে উঠে নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একখানি মন্দহাস্যময় কমনীয় মুখ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। মুখখানি পুরাতন বটে, কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের নিকট তাহা পৃথিবীর সকল নূতন জিনিষ অপেক্ষা অনেক অধিক নূতন-সৌন্দর্য্যময় বলিয়া বোধ হইল; রৌদ্রতাপে গণ্ডস্থল ও নাসিকাগ্রভাগ রক্তাভ হইয়াছে, ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ কণার সহিত কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তল চূর্ণ সকল সংলগ্ন হইয়াছে, কর্ণ যুগলে কুণ্ডল দুলিতেছে, অধরে হাসি খেলিতেছে, নয়নে প্রীতি উছলিয়া পড়িতেছে। শ্রীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নির্ণিমেষ লোচনে এই সৌন্দর্য্য রাশি নিরীক্ষণ করিলেন, এবং তৎপরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি সরোজ, বাড়ীঢুকিয়াই যে, একবারে এখানে?"

স। আমার খুসী। তুমি এখানে কেন?

শ্রী। আমি কোথায় গিয়াছিলাম তা এখানে থাকিব না?

স। আমিই বা কোথায় গিয়াছিলাম?

শ্রী। কেন বিয়ে বাড়ীতে।

স। বিয়ে বাড়ীতেই না হয় গিয়াছিলাম, বিয়ে করিতে ত আর যাই নাই, যে আর এখানে আসিব না, বরের সঙ্গে চলে যাব!

শ্রী। বর কেমন হলো, পছন্দ হয়েচে ত? বিয়েটা তবু কেমন দেখলে?

স। বর বেশ হয়েছে। বিয়েও বেশ দেখ্‌লাম। তবে কি জান বিয়ে দেখলেই মনটা কেমন উড়ো উড়ো করে, বিয়ের দিন মনে পড়ে, সাধ যায় আবার যেন বিয়ে হউক, এই বড় দোষ।

শ্রী। সত্যি নাকি, এমন কথা, তবে পাত্রের অনুসন্ধান করিব না কি? কেমন ধারা পাত্রটি হবে বল দেখি?

স। (শ্রীশচন্দ্রের চিবুকে হাত দিয়া) কই ঠিক এমনি ধারা মুখটি, এমনি নাকটী, এমনি চোক দুটি, এমনি রঙ্, এমনি দেহটি ও মনটি এমনি ধারা সর্ব্বস্বটি, এমন একটি পাত্র এনে দাও দেখি, না হয় আবার একবার বিয়ে করি।

শ্রী। পাত্রের দুঃখ কি, এস, ঘরে এস; তোমার হাতে কি?

স। পাত্র খোঁজার বিদায়।

শ্রী। তবে দাও।

স। এরই মধ্যে! পাত্র কৈ?

শ্রীশচন্দ্র সরোজকে হাত ধরিয়া গৃহ মধ্যে লইয়া যাইয়া বিনয় কুমারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "দেখ দেখি পাত্রটি কেমন?"

সরোজবালা বিস্ময়-চকিতা ও লজ্জাবনতমুখী হইয়া হাতের পান গুলি শ্রীশচন্দ্রের দিকে ছুড়িয়া দিয়া, অতি সত্বরে বাহিরে আসিয়া, গৃহের চৌকাটের নিকট একটি ঢিপ করিয়া প্রণাম করতঃ, একটু মধুর হাসি হাসিয়া, পশ্চাৎদিকে এক একবার শ্রীশচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ-পাত করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল। শ্রীশ ও বিনয় কুমারের মধ্যে হাসির গোল পড়িল। বিনয়কুমার বলিলেন "জানি তোমাকে, চির কালের বখা, তা নাহলে আর কিছু হ'লনা"!

শ্রী। বখামিটা আর কি হইল? এমন একটু আমোদ করিব না ত আর জীবনে সুখ কি? তুমি যেমন চির কেলে গম্ভীর, অন্নপ্রাশন না হইতে হইতেই ভবিষ্যৎ ভাবনায় মগ্ন! আমোদের সময় যদি একটু

আমোদ না করা যায়, ত জীবনটাই যে বৃথা। সে বয়সত আর ফিরিয়া আসিবে না। যদি জীবনের মিষ্টতার একটু আস্বাদন পাইতে চাও, এইবার বিবাহটা কর।

বি। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না, নিজের ভাবনা ভাব।

শ্রী। নিজের ভাবনার দরকার হয়েছে বটে, তুমি খুব মনে করে দিয়েছ, চাকরদিগকে একটা কাযে পাঠাতে হবে, তুমি ভাই একটু বস, আমি এখনি আস্‌চি।

এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র বাহিরে আসিলেন; দেখিলেন চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় ভৃত্যগণ সকলেই সটান পতিত হইয়া গভীর নাসিকা ধ্বনি উত্থিত করতঃ সুষুপ্তি সুখ অনুভব করিতেছে; ঘর্ম্মে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত। শ্রীশচন্দ্রের উচ্চাহ্বানে সকলে একে একে উঠিল এবং বাহিরের কট্‌মটে রৌদ্রের দিকে এক এক বার তাকাইয়া বদন কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে, আপন আপন আদিষ্ট কর্ম্মে অগ্রসর হইল।

শ্রীশ বাবু যখন বাড়ীতে থাকিতেন না, তখন ইহাদের বড় আরাম ছিল। ছোকরা কর্ত্তা হইয়া ইহাদের বড়ই মুস্কিল হইয়াছে, কথায় কথায় কড়া হুকুম। এইজন্যই বোধ হয় গ্রামের লোকের কাছে শ্রীশ বাবুর ভৃত্যবর্গ সর্ব্বদাই তাঁহার লেখা পড়া ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য অতিশয় নিন্দা করিত।

ভৃত্যগণকে উঠাইয়া দিয়া শ্রীশচন্দ্র অন্দর বাড়ীতে গেলেন। তখন বেলা তিন প্রহর অতীত; তাঁহার মাতা ও ঠাকুর মাতা সংসারের সকল জীবকে শান্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে, আহারে বসিয়াছেন। পরিচর্য্যার জন্য শ্রীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া নিকটে উপস্থিত আছেন। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকা ঠাকুরমা ও আয়িমার পাতের প্রসাদ প্রত্যাশী হইয়া এবং একটি হৃষ্ট পুষ্ট বিড়াল দুধের বাটিটি চাটিবার আশায়,

তাহাদিগকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে। শ্রীশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে সেই খানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার মাতা স্নেহময় দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"বাছা আমার আজকে স্থির হইয়াছে, কয়দিন বন্ধু আসিবে বন্ধু আসিবে করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। এরমধ্যে উঠিলে কেন বাবা, এখনওত খুব রোদ রয়েছে; কোথায় শুয়েছিলে, বৈঠক খানা বাড়ীতে?

শ্রী। না মাঝের বাড়ীর ঘরে।

ভ্রাতৃজায়া। হেঁ গা ও বাড়ীর ঘরে ছিলে, তা ছোট বউকে যে ও বাড়ীর ঘরের দিকে যেতে দেখে ছিলুম।

মাতা। মানা করিতে পার নাই।

ভ্রাতৃজায়া। আমি কি তা জানি যে ঠাকুর পো আপনার বন্ধুকে লইয়া মাঝের বাড়ীতে আছে।

মা। শ্রীশ তোর বন্ধুটিত বেশ ছেলে বাছা, দেখতে শুনতে যেমন, লেখা পড়াতেও তেমনি ভাল। এইবার তিনটে না চারটে পাশ হবে? তুই যেমন বাছা লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরে এসে চাস করিতে বসলি। আর গাঁয়ের ইস্কুলে চাকরিতে কি মান আছে বাবা, বিদেশে সাহেব সুবোর চাকরি না করিলে কি মানুষের মান মর্য্যাদা হয়।

ঠাকুরমা। লেখাপড়া ছেড়ে দেবে কেন গা, আজকাল আমার সুরোজের ইস্কুলে লেখাপড়া আরম্ভ করেচে।

ভ্রাতৃজায়া। (হাস্য করিয়া) এমাগীর এক কথা। সত্যি ঠাকুর পো তোমার বন্ধুটি বেশ; নাক মুখ চোকের খাশা গড়ণ। তোমরা যখন খেতে বসেছিলে আমি জানালা দিয়া সব দেখে এসেচি।

মা। হেঁরে ছেলেটির বিয়ে হয় নাই?

শ্রী। না এখনও হয় নাই?

মা। তবে তোর ভাইঝির সঙ্গে সম্বন্ধ কর না রে।

ভ্রাতৃ জায়া। আহা অমনি জামাইটি আমার হয়। এমন কিইবা কপাল করেছি।

শ্রী। ইস্ তোমাদের আশাত মন্দ নয়!

মা। তার আর ইস্‌কি, তোর ভাইজী মেয়ে কেমন বাছা, অমন পাত্র না হ'লে কি দিতে পার্‌বি।

শ্রী। ওযে বড় লোকের ছেলে মা, ওর বাপ জমীদার, ছেলে চারটে পাশকরা, তাতে আবার কুলীন; ওর বাপ দশ হাজার টাকা নেবে, তবে বিয়ে দিবে।

মা। তোর সঙ্গে যে অত ভাব রে।

শ্রী। ওর ভাব থাকলে কি হয়, ওর কথাত আর কথা নয়। কি বড় বউ, তুমি যে অবাক হয়ে শুন্‌চ! আমার বন্ধুকে যদি জামাই করিতে চাও, ভাল করিয়া জল খাবারের যোগাড় করগে, বেলা শেষ হয়ে এসেচে। কেমন করিয়া জামাইর আদর করিবে তাহার নমুনা দেখাও।

ভ্রাতৃ জায়া। তা ভাই আদর খুব কর্‌ব, তুমি আমার অমনি জামাইটি করিয়া দাও দেখি।

শ্রী। তার ভাবনা নাই, ওর চেয়ে ভাল জামাই হবে। এখন যাও।

ইহার পর শ্রীশচন্দ্র বিনয়কুমারের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং পুনরায় নানাপ্রকার গল্প আরম্ভ করিলেন। দুই তিন দিন বন্ধুর সহিত পরম আনন্দে অতি বাহিত করিয়া বিনয়কুমার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

বিনয়কুমারের সঙ্গে এপর্য্যন্ত আমাদের পথে পথেই দেখা। এখন একবার তাঁহার পরিচয় লই। আমরা ইতিপূর্ব্বেই জানিয়াছি তিনি দেবগ্রামের একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও বনিয়াদী বংশসম্ভূত। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ধনশালী ও প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন; তবে কাল ক্রমে বিষয়াদির অনেক বিভাগ হওয়ায়, এবং বিনয় কুমারের পিতামহের অপরিণামদর্শী বদান্যতা হেতু এখন আর পূর্ব্বের মত অবস্থা নাই; তথাচ মান সম্ভ্রম প্রতাপ প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে। বিনয়কুমারের পিতা একজন মিতব্যয়ী ও হিসাবী লোক। তিনি স্বীয় ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে জমিদারীর আয় অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন, বিষয় বৈভবের উন্নতি করিয়াছেন, এবং দুই পুত্রকে সুশিক্ষিত করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেশচন্দ্র পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করেন এবং বেশ পশার করিয়াছেন। কনিষ্ঠ বিনয়কুমার এইবার বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিয়া ছিলেন। দুই দিন হইল বিশেষ পারদর্শিতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ আসিয়াছে। সকলেই আনন্দিত। বিনয়কুমার পিতামাতার অতিশয় প্রিয় পুত্র; শুদ্ধ পিতামাতার কেন, শান্তমূর্ত্তি, বিনীত ব্যবহার, স্নেহ-পূর্ণ কথাবার্ত্তা ও সুধীর বুদ্ধির জন্য তিনি সকল স্থানে সকলেরই প্রিয় পাত্র; আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী, বালক বালিকা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে। তিনি বাড়ীতে থাকিলে বাড়ী যেন সর্ব্বদা উৎসবানন্দময় বলিয়া বোধ হয়। এবার তিনি শেষ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছেন, পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন, বাড়ীতে অনেক দিন থাকিবেন, তাঁহার বিবাহ হইবে, এই সমস্ত কারণে সকলে বিশেষ আনন্দিত। লোকনাথ

বাবু স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন বিনয়কুমারের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ না হইলে তাঁহার বিবাহ দিবেন না। এইবার সেই সময় উপস্থিত। ইহারই মধ্যে নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ কাল দেশে একটী অবিবাহিত পাশ করা ছেলে থাকিলে অচিরেই বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার নাম বিস্তৃত হয়। সংসারে প্রবেশ করিয়া অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না, পাশ করা ছেলেদের বিবাহের সময় বড়ই আদর। একটু না থাকিলে তাহাদের জীবন বড়ই দুর্ব্বিসহ হইত। এই সময়তেই তাহাদের জীবনের জ্যোৎস্নাময়ী সুরভি কুবাসিতা—বাসন্তি নিশা; ইহার পরই কিন্তু ঘোর অন্ধকার। বিনয়কুমার কেবল পাশ করা ছেলে নয়, তিনি বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং কুলীনের সন্তান সুতরাং সোণায় সোহাগা। দলে দলে ঘটকবৃন্দ বিনয় কুমারের পিতার নিকট আসিতেছে, কত কত সাক্ষাৎ গৌরী তুল্যা পরমা সুন্দরী একাদশ-বর্ষীয়া কন্যার পরিচয় দিতেছে। ঘটকগণ বোধ হয় সর্ব্বদা প্রেম বন্ধনের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজেরা ও প্রেমিক হইয়া পড়েন, কিংবা তাঁহার বড় তত্ত্বজ্ঞানী। প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানের চক্ষে সমস্তই এক। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা অমানিশিবিনিন্দিতা কুটিলকটাক্ষা রক্ষাকালী মূর্ত্তিকেও তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণা পদ্মপলাসনয়না গৌরী মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু অনেকেই বিনয়কুমারের তীক্ষ্ণবুদ্ধি পিতার দুই একটী তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক কথা কিংবা খরচ পত্রের মোটা বায়না শুনিয়াই ফিরিল। দুই একজন, যাহাদের অধ্যবসায় এবং পুনঃ পুনঃ স্তুতিবাদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একবারে আশা ছাড়িতে না পারিয়া উপর্য্যুপরি যাতায়াত করিতে লাগিল।

বিনয়কুমারদের গ্রামের অনতিদূরে হরিপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। সেখান হইতে তাঁহার একটী সম্বন্ধ আসিয়াছে। বিনয়কুমারের পিতামাতার কতকটা ইচ্ছা সেই খানেই বিবাহ হয়। হরিপুর একখানি

পুরাতন গণ্ডগ্রাম, চিরকালই সভ্য ভব্য, বিশেষ ধনী লোক কেহ না থাকিলেও মধ্য বিত্ত লোক অনেক আছে, এবং অনেকেই বুদ্ধিজীবী ও উপায়শীল। আগেকার আমলে লোকে পাঠশালায় পড়িত, হাতের লেখা পাকাইত এবং সেই বিদ্যাতেই উকীল মোক্তার পেস্কার সেরেস্তাদার নায়েব তহশিলদার হইয়া বিলক্ষণ দুপয়সা রোজগার করিত। এখনকার মত যেমন তেমন চাকরিতেই বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল না। পরিবার বাড়ীতেই থাকিত। চাকুরে বাবুরা মধ্যে মধ্যে ধূম ধাম করিয়া বাড়ী আসিত। মিষ্টভাষী পুরোহিত, চতুর নাপিত চাটুকার-প্রিয় অভিযাচক, গরিব আত্মীয়বর্গ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া ফরাস বিছানায় বসিয়া, গম্ভীর ভাবে আলবোলায় তামাকু সেবন করিতে তাহাদের বড় সাধ যাইত। বিদেশে হাত পোড়াইয়া খাইয়াও গ্রামে আসিয়া জাঁক জমক করিতে তাঁহারা ভাল বাসিতেন, কারণ তাঁহারা বুঝিতেন গ্রামের সম্ভ্রমই সম্ভ্রম। সেই কারণে গ্রাম খানিরও তখন বেশ শ্রী ছিল। দোল দুর্গোৎসবের বড়ই জাঁক ছিল। আশ্বিন মাসে হরিপুরে ৪০।৫০ খানি প্রতিমা আসিত, অনেক প্রকার আমোদ আহ্লাদ হইত, অনেক টাকাও খরচ হইত। তবে খরচ পত্র যে সকল সময়েই ভক্তিপ্রেরিত হইয়াই হইত তাহা নহে, ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়াও পূজার জাঁক জমক অনেক সময়ে বাড়িয়া যাইত। দত্তদের বাড়ী দুই মন ময়দা ভাজা হইবে, দুই রাত্রি কবির গান হইবে শুনিয়া মিত্রিদের বাড়ী ৪ মণ ময়দা ৩ রাত্রি কবির গানের ব্যবস্থা হইত। যাহা হউক, প্রতিবেশী পরাজয়—পিপাসাটা আজকাল যেমন কেবল কাছারিতে আসিয়া উকীল মোক্তার পুলিশ পিয়াদার উদর পূরণ করিয়াই সন্তুষ্ট করা হয়, তখন সেরূপ থাকে নাই। গরিব গ্রামবাসীদের উদর পূরণ করিয়াই এই দুর্দম মহদনিষ্টকর প্রবৃত্তি তখন শান্তি পাইত। বাবুদের রেষা রিষিতে অনেক সময় গ্রামের লোকও বালক বালিকাগণ কয়েক দিন ধরিয়া খাইয়া

মাখিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইত। ব্রাহ্মণের ছেলেরাত এক মাস ধরিয়া শুষ্ক লুচি মোণ্ডার আস্বাদন উপভোগ করিত।

হরিপুরে তখনকার স্ত্রীলোকদের মধ্যেও তৎকালানুযায়ী সভ্যতা বেশ ছিল। তাঁহারা রৌপ্যালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে খয়েরে তাহার অনুকরণ করতঃ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেন। পিড়ি লিখিতেন এবং কড়ির আলনা ও সিন্দূরপেতে তৈয়ার করিয়া অবসর কাটাইতেন। নবীনারা পাঁচালি গ্রথিত শ্রীরাধিকার বিরহ গীতি অভ্যাস করিয়া আপনাদের বিরহ বেদনা কিঞ্চিৎ শান্ত করিতেন; প্রবীণারা রামায়ণ মহাভারতের আখ্যায়িকা পয়ার ছন্দে অভ্যাস করিতেন। লেখা পড়া না জানিলেও এমন অসংখ্য ছড়াও কবিতা তাঁহারা অনায়াসে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। প্রসিদ্ধা গিন্নিগণ ক্রিয়া কারবারে উত্তম রাঁধিয়া ও পীড়া কালে মুষ্টি যোগ দ্বারা রোগ আরাম করিয়া বড় গৌরব বোধ করিতেন।

হরিপুরের সেই সভ্যতা ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ কাল ইহার অনেক রূপান্তর হইয়াছে। পুরুষেরা এখন ইংরাজী শিখিয়া বিদেশে চাকরী করেন বটে, কিন্তু এমন সৌখীন হইয়া পড়িয়াছেন যে গ্রামে আসিয়া দুই দিন থাকা আর বরদাস্ত হয় না; পাড়াগাঁয়ে সকলই কষ্ট, ভাল খাবার মেলে না, কথা কহিবার লোক মেলে না, রোগে চিকিৎসক মেলে না, দুই দিনেই রং ময়লা হইয়া যায় প্রভৃতি নানা কারণে প্রবাসী চাকুরে বাবুরা গ্রামের উপর বিরক্ত। বাস্তবিক পক্ষেও ম্যালেরিয়ার প্রভাবে এবং রেল বিস্তার হেতু সহরে সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্যের আকর্ষণে, পল্লীগ্রামের সুখ স্বচ্ছন্দতা আজকাল অনেক কমিয়া গিয়াছে। রমণীদের সভ্যতার ও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রৌপ্যালঙ্কার এখন উচ্চাঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ষাট ভরির মল বা আশী ভরির পাঁইযোড় রূপে চরণে পতিত হইয়াছে। খয়েরের গহনা ও কড়ির আলনার স্থান উলের জুতা মোজা গ্রহণ করিয়াছে। অঙ্গে

জ্যাকেট বডী উঠিয়া মাথায় ঘোমটার দীর্ঘতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। পাঁচালির স্থানে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস ও হেম বাবুর কবিতাবলী আদৃত হইয়াছে। মুষ্টিযোগের পরিবর্ত্তে হোমিওপ্যাথিক একোনাইট ইপিকার ব্যবস্থা দিতে অনেকে শিখিয়াছেন। সকলেই সহরবাসী হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে; সুতরাং গ্রামখানি নিতান্ত শ্রীবিহীন হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বের সে আমোদ আহ্লাদ পূজা উৎসব চুকিয়া গিয়াছে। আশ্বিন মাসে ৪০।৫০ খানি প্রতিমার স্থানে এখন আর একখানি প্রতিমাও আসে না। মৃণ্ময় প্রতিমায় লোকের ভক্তি কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই যেন কোন কোন প্রবাসিনী রত্ন-বসন-ভূষিত জীবন্ত প্রতিমা সাজিয়া দেখা দেন এবং বাহুযুগলশোভন ভুবনমোহন অনন্ত বলয় গরিমা গরিব গ্রামবাসিদিগকে তিন দিনের জন্য দেখাইয়া দশমী অন্তে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

এই আধুনিক হরিপুরে হরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির দিন সময় আজ কাল বড় ভাল। তাঁহার পিতা বৃন্দাবন গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতার একটি বড় সওদাগরী হোউসে কার্য্য করিয়া অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। হরেন্দ্রনাথ পিতার নিকটই সেই কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, উচ্চ বেতন পান এবং কোন কোন কোম্পানীর সরিকদারও হইয়াছেন। পাঁচ রকমে তাঁহার আয় খুব দাঁড়াইয়াছে; তিনি এখন কলিকাতায় বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া, সবই করিয়াছেন এবং এক প্রকার কলিকাতারই লোক হইয়া গিয়াছেন। তবে কোন কার্য্য কর্ম্মের উপলক্ষে দুই চার দিনের জন্য কখন কখন দেশে আসেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা একাদশ বর্ষীয়া, সুতরাং তাঁহাকে এইবার পাত্রের অন্বেষণ করিতে হইয়াছে। বিনয়কুমারের নাম তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। বিনয়কুমার যে এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন সে কথাও তিনি সংবাদপত্রে অবগত

হইয়াছেন ; বিনয়কুমার দেশস্থ সম্ভ্রান্ত জমীদার বংশীয়, সুশিক্ষিত এবং কুলীন, অতএব তাঁহা অপেক্ষা সুপাত্র আর হইতে পারে না। অনেক দিন হইতে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, কিন্তু শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিনয়কুমারের পিতা তাঁহার বিবাহ দিবেন না জানিয়া তিনি এত দিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এইবার তিনি কন্যার বিবাহ দিবেনই স্থির করিয়া সপরিবারে বাড়ী আসিয়াছেন। হরেন্দ্রনাথের কন্যাটি অতীব সুরূপা। বিনয়কুমারের পিতামাতা বিশ্বস্ত সূত্রে এ সংবাদ জানিতেন। বিনয়কুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্রের বিবাহ অতি দূরে হওয়ায়, ক্রিয়া কারবার তত্ত্ব তল্লাসের বিশেষ সুবিধা হয় নাই ; সেজন্য বিনয়কুমারের মাতা নিকটে কুটুম্বিতা করিতে বড় ইচ্ছুক। এই কারণে এবং হরেন্দ্রনাথের অবস্থা আজ কাল বিশেষ ভাল হওয়ায়, বিনয়কুমারের পিতারও এ সম্বন্ধে মত ছিল। তাঁহারা উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, কিন্তু লোকনাথ বাবু আর কাহারও নিকট এ মত প্রকাশ করেন নাই।

একদিন হরেন্দ্রনাথ, পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং একটী গ্রামস্থ ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে লোকনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। লোকনাথ বাবু অতি সুভাষী, সদালাপী এবং মজ্‌লিষী লোক। তিনি হরেন্দ্রনাথ এবং তদ্‌ সমভিব্যাহারীগণের প্রতি বিশেষ রূপ সম্মান প্রকাশ এবং আতিথ্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাদের সহিত নানা রূপ কথায় বার্ত্তায় নিযুক্ত হইলেন। হরেন্দ্রনাথ কিছু গম্ভীর, তত আলাপপটু নহেন ; আস্তে আস্তে দুই একটী কথা বলেন ; তবে যে কথা গুলি বলেন তাহার বাঁধুনি আছে। এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কথা উঠিলে, কখন কখন বাগ্মীতারও পরিচয় দেন ; কত কত কোম্পানীর সহসা ফেল হওয়ার, কত কোম্পাণীর সহসা উন্নতি হওয়ার, কত সেয়ার ইনভয়েস্‌ বিল্‌ প্রভৃতির, কথা অতি আগ্রহ সহকারে অনর্গল বলিতে

থাকেন, এবং তিনি যে কোম্পানির কার্য্য করেন তাহা একবারে ফেল হইয়া, কেবল তাঁহারই কার্য্যদক্ষতা গুণে যে আবার উন্নতি করিয়াছে, এবং সেই কারণ কোম্পাণীর বড় সাহেব খুসী হইয়া তাঁহাকে একজন শূন্য বখরাদার করিয়াছেন, এ বিষয়টী সকল স্থানেই অতি গৌরবের সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। অন্য বিষয়ের কথা উঠিলে তিনি প্রায় চুপ করিয়াই থাকেন। তবে তাঁহার সহিত যে ভদ্র লোকটী আসিয়াছিলেন তিনি বড় চোখল মুখল লোক, যে কোন বিষয়ই হউক না দুই কথা না বলিয়া ছাড়েন না। লোকনাথ বাবুর সহিত তিনি নানা বিষয়ের আলাপ করিয়া অবশেষে আধুনিক শিক্ষিত যুবকদিগের কথা আনিয়া ফেলিলেন। বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের কিছু নিন্দা করিলে যদি পাত্রের কিছু দর কমে। তিনি কথায় কথায় বলিলেন— "মহাশয় আজ কালকার ইংরেজী শিক্ষিত ছেলেদের একটা বড় দোষ দাঁড়াইতেছে, তাহারা গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মান্য বড় কম করে।" লোকনাথ বাবু উত্তর করিলেন—"এ দোষটি আজ কালকার শিক্ষিত ছেলেদের উপর দেওয়া হয় বটে এবং কথাটা লইয়া অনেক গোলমালও হইতেছে, কিন্তু মহাশয় আমি এরূপ দোষারোপের তত কারণ দেখি না। প্রকৃত কথা কি জানেন, যাহার যেমন স্বভাব শিক্ষায় তাহার বড় বৈলক্ষণ্য হয় না। অনেক দুর্বৃত্ত দুরন্ত প্রকৃতির লোক শিক্ষা পাইয়াও সেরূপ থাকে। আমরা সে দোষটা কিন্তু অনেক সময় তাহাদের শিক্ষার উপরই দিয়া থাকি; আর এক কথা, যেমন আমাদের অনেক পুরাতন ধরণধারণ রীতিনীতির পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেরূপ সম্মান প্রকাশেরও ধরণ ধারণ ভাব ভঙ্গি অনেক পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আমার বোধ হয় অনেক সময় পুরাণ পদ্ধতিতে সম্মান প্রকাশ করা আজ কালকার ছেলেরা অনাবশ্যক মনে করেন। এবং গুরুজনেরাও শৈশবকাল হইতে ছেলেদিগকে সেই সকল পদ্ধতি শিক্ষা দিতেও যেন আর তত

আগ্রহশীল নহেন। কিন্তু তা বলিয়া ইংরাজী শিক্ষার জন্য যে পিতা মাতার বা গুরুজনের প্রতি তাহাদের আন্তরিক অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে একথায় আমি বিশ্বাস করিনা। প্রথম যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়, কতক পরিমাণে এই দোষ জন্মিয়াছিল। কিন্তু আজকাল আর তাহা নাই। অবশ্য দুই একটা ছেলে দেখা যায় যাহারা দুপাত ইংরাজী পড়িয়াই এরূপ চাল চলন আরম্ভ করে যে, তাহা অনেক সময়েই বরদাস্ত করা যায় না। সেটা কেবল অল্প শিক্ষার দোষ। অধিক পড়িলে আর সেটা থাকেনা। এই আমার ছেলেদিগকে দেখুন না। যেমন যোগেশ, তেমনি বিনয়। অহঙ্কার নামমাত্র নাই, এবং ভুলিয়াও কখন কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি অন্যায় ব্যবহার বা অসম্মান প্রকাশ করিতে দেখি নাই।" ভদ্র লোকটী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে সেকথা সত্য, আপনার ছেলে-দের প্রশংসা সর্ব্বত্র শুনা যায়।" এই মজলিশে একটী প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ছিলেন, সম্পর্কে লোকনাথ বাবুর জ্যেঠা। তিনি বলিলেন—"মশায় আজকালকার ছেলেদিগকে আবার অশান্ত অবাধ্য বলা হয়! তাহাদের আবার অশান্ততা কোথায়? তাহাদের বয়সে আমাদের যে দৌরাত্ম্য ছিল, সে সব কথা তাহারা শুনিলে অবাক হইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ নিজের এবং নিজ সমবয়স্কদিগের বাল্য কীর্ত্তি সমূহের সবিশেষ বর্ণনা আরম্ভ করিলেন; কেমন করিয়া গুরু মহাশয়ের বসিবার আসনের নীচে কাঁটা বিঁধিয়া রাখিতেন, চৌকীর পায়ের নীচে সুপারী রাখিতেন, অষ্টাদশ বৎসর বয়সেও পাঠশালায় যাইবার সময় কেমন তেঁতুল গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং গুরু মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত সহপাঠীদূতকর্ত্তৃক বহমান কালে কেমন গর্দ্দভবিনিন্দিত রব ছাড়িতেন ও সবেগে বাহকদলের বক্ষস্থলে পদাঘাত করিতেন, এবং তাহার পরে গুরু মহাশয়ের অজস্র বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া নাড়ুগোপাল হইয়া রৌদ্রে বসিয়া

থাকিতেন, কেমন দল বাঁধিয়া কাঁঠাল চুরি করিয়া এক একটী গোটা কাঁঠাল এক এক জনে ভক্ষণ করিতেন, ইত্যাদি নানারূপ গল্পে বৃদ্ধ সকলের মধ্যে হাসির তরঙ্গ তুলিতে লাগিলেন। সকলে চুপ করিলে বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিলেন—"আজ কালকার ছেলে দুরন্ত হবে কিসে? পেটে খেতে পারিলে, গায়ে শক্তি থাকিলে তবে ত দুরন্ত হবে? আমি এখন যাহা খাইতে পারি, এখনকার একজন ২০ বৎসরের জোয়ান তাহা পারে না। আর খাবে কেমন করিয়া, পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই মুখ শুকাইয়া কেবল কেতাবের পাত উলটাইতে থাকিবে, তাহাতে ক্ষুধাই থাকে কেমন ক'রে, শক্তিই বা হয় কোথা হইতে, দুরন্তপনাই বা করে কি লয়ে?"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর বৃদ্ধ লোকনাথ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওগো লোকনাথ, একবার বিনয় বাবুকে বাহিরে ডাকিয়া পাঠাও; এঁরা একবার কেমন আজ কালকার ছেলে দেখে সন্তুষ্ট হন।" লোকনাথ বাবু বলিলেন—"সংবাদ দিয়াছি আসিতেছে। বিনয় বাড়ী আসিয়া আবার তাহার একটী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, ৩।৪ দিন পরে আজই এই কিছুক্ষণ হইল বাড়ী আসিয়াছে, সেই জন্যই বিলম্ব হইতেছে।" অল্পক্ষণ পরেই বিনয় বাবু বাহিরে আসিলেন এবং সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। ক্রমে হরেন্দ্রনাথ লোকনাথ বাবুকে কন্যা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হরেন্দ্রনাথের সঙ্গী ভদ্র লোকটী বলিলেন—"মহাশয় কন্যাটি অতীব সুন্দরী এবং সুশীলা, দেখিলেই আপনার পছন্দ হইবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে এক খরচ পত্রের কথা, অবশ্য হরেন্দ্র বাবুর প্রথম কন্যার বিবাহ, যথা সামর্থ্য খরচ পত্র করিবেন বৈকি! তাহার পর আপনার অনুগ্রহ। কন্যা দায় যে আজকাল কি ভয়ানক দায় হইয়া উঠিতেছে—তাহা কন্যার পিতা মাত্রেই বুঝিয়াছেন। তবে আপনাদের

মত সদাশয় ব্যক্তির সহিত ব্যবহারে অবশ্য কোন বেদনা পাইতে হইবে না। বাস্তবিকই মহাশয় পুত্রগণের এত বাড়াবাড়ি হইতেছে যে, একটা কোন প্রতীকার না হইলে সমাজ উচ্ছন্ন যাইবে। আজ কাল এ সম্বন্ধে অনেক সভা সমিতি হইতেছে তাহাতে অনেকটা উপকার হইতে পারে।" লোকনাথ বাবু কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"মহাশয় এ কথাটা অনেকে বড় ভুল বুঝিয়া থাকে। পুত্র পিতার সর্ব্বস্ব পায়, কন্যাও সন্তান, তাহারও ত পিতার ধন কিছু পাওয়া চাই। অবশ্য যাহার যে রূপ সামর্থ্য সে সেইরূপ দিবে, তাহার অধিক পাইবে কোথায়? এখন মনে করুণ যদি একটী পাত্রে দশজন লোক কন্যাদানের প্রার্থী হয়, এবং যদি সকল কন্যাগুলিরই রূপ গুণ বংশ প্রায় তুল্য মূল্য হয়, তাহা হইলে যে স্থলে অধিক প্রাপ্য সেই স্থলেই বিবাহ দেওয়া কি পুত্রের পিতার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য নয়? এইরূপ করিয়াই না আজ কালকার পাশ করা ছেলের দর বাড়িয়াছে! যখন লোকে দেখিবে যে পাশকরা পাত্রে কন্যা দিলে কন্যার বিশেষ কিছু সুখের সম্ভাবনা নাই, তখনই সেরূপ পাত্রের দর কমিতে আরম্ভ হইবে। সভা সমিতি করিয়া যাঁহারা এরূপ বিষয়ে সফল হইবার প্রত্যাশা করেন তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী। তাহাতে বরং কপটতা বৃদ্ধি পাইবে, অনেকে সভায় কন্যার পিতার প্রতি দয়া প্রকাশের প্রতিজ্ঞা করিয়াও গোপনে তাহাকে শোষণ করিবে। সে যাহা হউক হরেন্দ্র বাবু প্রথম কন্যার বিবাহ দিবেন। তিনি একজন বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত লোক, আপনার কর্ত্তব্য তিনি বুঝিয়া করিবেন, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য কিছু নাই। আমি ইতিমধ্যে একবার কন্যা দেখিতে স্বীকৃত আছি।" হরেন্দ্রনাথ কৃতার্থ হইয়া বলিলেন—"তবে মহাশয় নিকটে একটী দিন স্থির করিলে বাধিত হইব, আমার ছুটী আর অধিক নাই।" লোকনাথ বাবু এই সময় একবার বাড়ীর ভিতরের দিকে গেলেন। বিনয়কুমার চুপে চুপে তাঁহার দাদা মহাশয়কে অর্থাৎ উপরি পরিচিত

বৃদ্ধ লোকটীকে ডাকিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইয়া বলিলেন—"দাদা মহাশয় আমার বিবাহ করিতে এখন মত নাই, আপনি বাবাকে বলুন এখন যেন কোন কথা বার্ত্তা স্থির না করেন।" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"সে কিরে ভাই, এখনও আবার বিবাহে মত নাই কি? আর কি তুই ছেলে-মানুষটি আছিস্? আর ত ভাই পড়াশুনাও সব শেষ হয়ে গেছে, ওজর করিবার কোন কারণ দেখি না। তবে এক কারণ হতে পারে। তোমরা সাহেবি মেজাজের লোক, হয় ত একটী মেমসাহেব খুঁজিবে। এমন যদি হয় মেয়েটিকে না হয় একবার দেখিয়াই আয়।" বৃদ্ধ বিনয়কুমারের কানের নিকট মুখ লইয়া ধীরে ধীরে সস্নেহ স্বরে বলিলেন—"আমি খুব খাঁটি খবর পেয়েছি, মেয়েটি বড় সুন্দরী, এখন আর অমত করিস্ না, যদি অমত করিস্ ত শালা আখেরে ঠকৃবি।" বিনয়কুমার বিনীত ও সলজ্জ ভাবে উত্তর করিলেন—"না দাদা মশায় আমার এখন বিবাহে মত নাই।" এই কথা বার্ত্তার পর বৃদ্ধ ও বিনয়কুমার উভয়ে বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিলেন। লোকনাথ বাবুও ভিতর বাড়ী হইতে বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধ একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন—"ওগো লোকনাথ, বিনয় বলে যে তাহার এখন বিবাহে মত নাই, কিরে বিনয় এখনও ঠিক করিয়া বল্।" বিনয়কুমার সলজ্জ অথচ দৃঢ় ভাবে উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে না আমার এখন বিবাহে মত নাই।" এবং এই কথা বলিয়া তিনি সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

বিনয়কুমার নিজের মত বজায় রাখিতে কিছু জিদী, ইহা তাঁহার পিতা জানিতেন। অতএব লোকনাথ বাবু তখন কিছু না বলিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হরেন্দ্রনাথের মুখ শুকাইয়া গেল; তাঁহার চতুর সহচর ভাবিলেন—"এটি বুঝি টাকা বাড়াইবার ফন্দী আর কিছু না।" এবং সুযোগ পাইয়া একটু গর্ব্বের স্বরে স্বমত সমর্থন করতঃ বলিলেন—"দেখিলেন মহাশয়, আমি যাহা

বলিতেছিলাম, কতকটা সত্য কি না? আজ কালকার ছেলেদের গুরু-জনের প্রতি অসম্মানের ভাব জন্মিয়াছে কিনা! পূর্ব্বে কোন পুত্র পিতার সমক্ষে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ করিতে কি সাহসী হইত?" বৃদ্ধ বলিলেন—"আমি দেখিতেছি আজ কালকার ছেলেগুলো বড় বোকা হয়ে গিয়াছে; প্রথম বিবাহ, তাতে আবার অমত! আমরা, বাপ খুড়ায় সাতটা বিবাহ দিয়া দিলেও কখন 'না' বলি নাই, বরং মনে মনে খুসী হইয়াছি।"

লোকনাথ বাবু কাহারও কথায় কোন উত্তর না দিয়া হরেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এবিষয়ে কি স্থির হয় আমি অতি শীঘ্রই পত্র দ্বারা আপনাকে অবগত করাইব।" অতপর হরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ প্রস্তাব।

বিনয়কুমার বাহির হইতে ভিতর বাড়ীতে আসিয়া নিজ কক্ষে গমন করিলেন। চিন্তায় মন আন্দোলিত, সুতরাং একস্থানে স্থির থাকিতে না পারিয়া কক্ষমধ্যে চঞ্চল ভাবে পদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার কি কর্ত্তব্য ?

তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে। অতএব শীঘ্রই যে তাঁহার বিবাহ হইবে এবং হওয়াই উচিত ইহা যেন সকলের মনেই স্থির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলেই সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামবাসিগণের মধ্যে এক প্রকার আন্দোলন উঠিয়াছে। সকলেরই মনে কোন না কোন প্রকারের সুখ-কল্পনা জাগিতেছে। পিতা কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহে বহুল অর্থ সম্মান স্বরূপ পাইবেন এবং সাধ মিটাইয়া খরচ করিবেন এই ভাবিয়া সুখী হইতেছেন। মাতা নববধূমুখ সন্দর্শনের কল্পনায় উৎফুল্ল হইতেছেন। পাড়ার বালকগণের কল্পনায় নানাপ্রকার বাদ্যভাণ্ড, মিষ্টান্ন ভোজন ও আতস্‌বাজী জাগিতেছে। গৃহিণীগণ রাঁধিবে, বাড়িবে গৃহিণীপণা দেখাইবে ভাবিয়া সুখী হইতেছে। যুবতীগণ নানাবিধ আমোদ কৌতুকের কল্পনা করিতেছে। কোন সুগায়িকা বিনয়কুমারের বিবাহে কলকণ্ঠের মিষ্টতা শুনাইবার অবকাশ পাইবে ভাবিয়া মনে মনে ভাল ভাল গানগুলি বাছিয়া রাখিতেছে। কোন রূপসী বা সুচিক্কণ বেণারসী মণ্ডিতা হইয়া সুবর্ণ-

শোভিত বাহুযুগল ধীরবাতান্দোলিত লতিকার ন্যায় প্রকম্পিত করিয়া বর কন্যার বরণ করিবে ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছে। কোন চিত্রনিপুণা বা পিঁড়ি লিখিয়া প্রশংসা লইবার আশায় সে কার্য্য এখন হইতে সুরু করিয়াছে। যাহাদের এরূপ কোন গুণপণা নাই তাহারা কুণ্ডলশোভিত গণ্ডস্থল ফুলাইয়া শঙ্খে ফু দিবে ও হুলুধ্বনিতে বাড়ী ফাটাইবে ভাবিয়া খুসি হইতেছে। ভৃত্যবর্গ, নাপিত ও চৌকীদার প্রভৃতি পুরস্কারের আশায় এখন হইতেই কার্য্যতৎপরতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা কিছু অধিক দেখাইতেছে। ধাত্রী ভাবিতেছে, সে বিনয়বাবুকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাঁহার বিবাহে কোন্ না একখান সোণার গহনা ও দুই বিঘা জমী পুরস্কার পাইবে।

এইরূপ বিনয়কুমারের বিবাহের কথায় সকলেই সুখী। বিনয়কুমার নিজে কিন্তু চিন্তিত। কারণ কি? যাহার অভাব আছে সে বিবাহের পূর্ব্বে চিন্তিত হইতে পারে। বিনয়কুমারের চিন্তিত হইবার তো সে কারণ নাই। তিনি ভাবিতেছেন, বিবাহ জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ঘটনা, তাহা কি হঠাৎ এরূপ লঘু ভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত? বিবাহের দায়িত্ব তিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সংসারানভিজ্ঞ কল্পনা সেই দায়িত্বকে অতি গাঢ়তর বর্ণে রঞ্জিত করিতেছে। আধুনিক শিক্ষা ভাবপ্রবণ ও উত্তেজনশীল হৃদয়ে যে আত্মমনস্প্রাধান্যের ভাব সচরাচর জন্মাইয়া দেয়, বিনয়কুমারের হৃদয়ে তাহা পূর্ণমাত্রায় জন্মিয়াছিল। তিনি নিজের বিচার-সম্মত কর্ত্তব্য জ্ঞানকে কাল প্রবর্ত্তিত প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতির নিকট অবনত মস্তক হইতে দিবেন না, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। সেই জন্যই এরূপ অপ্রস্তুত ভাবে হঠাৎ বিবাহের গুরু দায়িত্ব মস্তকে লওয়া, বাহ্যিক আমোদে ও নিরর্থক ক্রিয়া কলাপে মত্ত থাকিয়া এক অজানিতা বালিকার সহিত আত্মজীবন চির সূত্রে আবদ্ধ করা, তিনি অন্যায় বিবেচনা করিতেছেন এবং সেই জন্যই

বিবাহে মত দেন নাই। তবে এইটীই তাঁহার অমতের সম্পূর্ণ কারণ কি না একথা আমরা এখন বুঝিতে পারিব না। অতঃপর কি ঘটিল এখন তাহারই অনুধাবন করি।

বিনয়কুমার চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে ক্লান্তি বোধ করিয়া পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধশয়িত ভাবে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে তাঁহার বিমলাদিদি ধীর পদ বিপেক্ষে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং নীরবে সস্নেহ ভাবে বিনয়কুমারের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন। বিনয়কুমার বলিলেন "কি ঠাকরুন দিদি, চোরের মত এমন চুপি চুপি আসিতেছ যে?" বিমলা-দিদি দূতীর ন্যায় হাত নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন——

"আহা

মলিন বদনে বসি কেন ওহে শ্যামচাঁদ,
গরবিণী রাই, ধরিয়া আনিব
বুঝিয়া পেতেছি ফাঁদ।
বসাইব বামে, হেরি রাধা শ্যামে,
ছুটিবে প্রেমের ধার
টুটিবে হৃদয় বাঁধ॥

ভাই একটা সু খবর দিতে এলাম, এমন করে মলিন মুখে একলা একলা আর অধিক দিন থাকিতে হইবে না।"

বিনয় বাবু স্ত্রীলোকের সহিত, বিশেষতঃ বিমলা দিদির সহিত রসভাষে কখন জয়লাভ করিতে পারিতেন না। তিনি ভাবিতেন, বিমলা দিদি এক জন রীতিমত বাগ্মিণী। বাস্তবিকই যিনি বিমলা দিদির কথার প্রাচুর্য্য, তেজ ও সচ্ছলতার পরিচয় পাইয়াছেন, অগণ্য উপমা বলে, অসংখ্য ছড়ার আবৃত্তি দ্বারা, নজীর স্বরূপ রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা উল্লেখ করিয়া, তিনি কিরূপ স্বমত সমর্থন করিতে এবং বিপক্ষকে নির্ব্বাক করিতে পারি-তেন, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি অবশ্যই ভাবিবেন, শিক্ষা ও স্বাধীনতা

পাইলে বিমলা দিদি টাউনহলের প্লাটফরম বা ব্যবস্থাপক সভায় সন্মান পাইবার যোগ্যা হইতেন। গ্রামে তাঁহার অক্ষুন্ন প্রতাপ, সকলেই ভয় ও খাতির করিত। গ্রামের নব জামতারা তাঁহাকে দেখিলে আর মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না! বাস্তবিকই বিমলা দিদি তাঁহার এই বুদ্ধিবলে ও মুখের জোরেই অনাথা নিঃসহায়া বিধবা হইয়াও গ্রামে আপন স্বত্ব বজায় রাখিয়া, পরের গলগ্রহ না হইয়া জীবন কাটাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের আর একটি দিক আছে। তাঁহার হৃদয়টি বড় প্রেমপূর্ণ। গ্রামে এমন লোক থাকে নাই যাহার বিপদে তিনি উপকার করিতে প্রস্তত না হইতেন। বিনয়কুমারের পিতার তিনি গ্রাম্য সম্পর্কে পিসি হইতেন, সুতরাং তিনি বিনয়কুমারের ঠাকরুন দিদি। বিনয় কুমার বিমলা দিদির বুদ্ধিবল, স্বাধীনচিত্ততা ও সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে বড় মান্য করিতেন। বিমলা দিদিও বিনয়কুমারের শিষ্টতা দেখিয়া তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। বিনয়কুমারের পিতা ইহা অবগত ছিলেন এবং সেই জন্যই বিনয়কে বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য আজ বিমলা দিদির সাহায্য লইয়াছেন! বিনয়কুমার বিমলা দিদির আগমনেই ইহা কতক বুঝিলেন এবং একটু ত্রস্ত হইয়া তাঁহার কথার উত্তর করিলেন,— "কৈ মলিন মুখে কেন থাকিব?"

দিদি। মলিন বৈকি ভাই,

যে মুখেতে সদা হাসি,
শরৎ চাঁদিমা ভরা
আজি তাহা হেরি যেন
বরষার মেঘে ঘেরা।

বুঝি,
শুনি রাধার বারতা, উদাসী প্রাণ গেছে তথা,
শূন্য হিয়া দেহ খানি
আছে পড়ি কান্তি হারা॥

বিনয় কুমার হাসিয়া বলিলেন—"না না তা কেন হবে, বিমলা দিদি অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই তাই মনটা কেমন করিতে ছিল, আজ সন্ধ্যের পর তোমাদের বাড়ী যাইব ভাবিতে ছিলাম।"

বিমলা দিদি বলিলেন—"ভাই আমার কাছে যাইয়া আর কি সুখ বল ?

হায়, আমার সুখের দিন ফুরাইয়া এল।
নবীনা নাগরী আসি নাগরে কাড়িয়া নিল॥
নাই রূপ নাই বেশ, শুষ্ক দেহ পক্ক কেশ,
পারি কি তুষিতে আর তৃষিত চাতক প্রাণ ?
চারু কেশা চন্দ্রাননী, আড় নয়নে বাণ হানি
বসিবে বামে মুচকি হাসি উঠিবে প্রেমতুফান"॥

ঐই বলিয়া বিমলা দিদি বিনয়কুমারের পালঙ্কে খান কয়েক পুস্তক সরাইয়া একটু জায়গা করিয়া বসিলেন। "বিমলা দিদি, তোমার পেটে এত ছড়াও আছে, এসব কোন্ বয়সে মুখস্থ করা হয়েছিল, তখন ত চুলগুলি কাল ছিল" এই বলিয়া বিনয় কুমার ঠাকুরুনদিদির পক্ক কেশগুচ্ছ হাতে লইলেন। তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন—"হাঁ ভাই, তখন চুল কাল ছিল বৈকি"। বিনয়কুমার চুলগুলি হাতে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"বিমলা দিদি তোমার বার আনারও অধিক চুল পাকিয়া গিয়াছে, বয়সটা কত হবে বল দেখি, তুমি বাবার চেয়ে কত বড়" ?

বৃদ্ধ লোককে বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইবার আশা কম। বিনয়কুমারের প্রশ্ন হইবা মাত্র বিমলা দিদির কল্পনায় স্মৃতি শক্তির যতদূর বিস্তার, আত্ম জীবনের অতীত ঘটনা সকল চকিতের ন্যায় প্রতিফলিত হইল। মানুষের জীবন কার্য্যগত ও কল্পনাগত। আমাদের দৈনিক কার্য্যময় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে, কত অতীতের স্মৃতি

কত ভবিষ্যতের আশা, স্মৃতি ও আশা মিশিয়া কত নূতন চিন্তা মনের মধ্যে অবিরাম খেলা করিতে থাকে। ইহাতেই জীবনের সুখ ও মাধুর্য্য। পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী যেরূপ ছায়া দানে প্রস্তরময় রৌদ্রতপ্ত পথকে সুখ-গম্য করে, পত্রপুষ্পলতিকা যেমন বৃক্ষের কঠিন কাষ্ঠময় বৃন্তকে আবৃত করিয়া তাহাকে নয়ন তৃপ্তিকর শোভা প্রদান করে, আমাদের কল্পনাময় জীবনও সেইরূপ শুষ্ক কার্য্যময় বাস্তব জীবনের সন্তাপকে শমিত ও সহনীয় করে এবং ইহার কঠোরতা আবৃত করিয়া ইহাকে মনোহর বর্ণে রঞ্জিত করে। এই জন্যই বুঝি ভগবান দুঃখের স্মৃতিকেও সুখকর করিয়াছেন। যে ঘটনা একদিন মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়াছে, হৃদয়কে পেষণ করিয়াছে, তাহাও যখন অতীতের স্মৃতিরূপে কল্পনায় প্রতিভাত হয়, মন সে স্মৃতিতেও বিচরণ করিতে ভাল বাসে। কৃষ্ণবর্ণ মেঘের চারিদিকে সান্ধ্য সূর্য্যের কিরণ রেখার ন্যায় কাল সেই শোকাবহ স্মৃতিতেও মাধুরিমা মাখাইয়া দেয়। আবার যাহাদের ভবিষ্যৎ শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহাদের কল্পনা অতীতেই ব্যাপৃত থাকে। এই জন্য বৃদ্ধ বৃদ্ধা তরুণ তরুণীর নিকট আত্ম কাহিনী কহিতে এত ভাল বাসে। ঠাকুর দাদা ঠাকুরুন দিদির সহিত যে নাতি নাতিনীর গাম্ভীর্য্য-রহিত তামাসা কৌতুকের সম্পর্ক, এটী বড় স্বাভাবিক। ইহাতে একের নিরঙ্কুশ গল্প-প্রবৃত্তি, অপরের সরল বিস্ময় ও জ্ঞানলালসা কর্ত্তৃক পরিতৃপ্ত হয়। বিনয়কুমার বিমলা দিদিকে তাঁহাদের গ্রামের এবং পরিবারের একখানি জীবন্ত ইতিহাস বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং আগ্রহের সহিত তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। বিমলা দিদিও এই জন্য বিনয়কুমারের নিকট গল্প করিতে কিছু অধিক ভাল বাসিতেন। আজ তিনি বিনয়কুমার কর্ত্তৃক আত্ম বয়সের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজ আগমনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া আত্ম জীবনের কথা বলিতে লাগিলেন। বিনয়কে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন—"ভাই বিনয়, আমার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমার বয়সের কি আর ঠিকানা আছে, আমি তোমার বাপকে হতে দেখিয়াছি। লোকনাথ ত সেদিনের ছেলে, ন্যাংট হইয়া বেড়াইত, সে ত সেদিন মনে হইতেছে। আহা আমার খেতু যদি বাঁচিয়া থাকিত, তাহলে প্রায় লোকনাথের বয়সী হইত। লোকনাথ চেয়ে খেতু ৩।৪ বৎসরের ছোট ছিল বইত নয়। আহা কমবক্তা ত বাঁচিতে আসে নাই, কেবল ঘোষণা রাখিতে আসিয়াছিল। যে কয়বৎসর বাঁচিয়াছিল তোমার ঠাকুরদাদা ত তাহাকে বুক হইতে নামাইত না। আর ছেলের চেহারাই ছিল কি, যে দেখিত সেই বলিত এ ছেলে যদি বাঁচে একজন হবে। আমাদের কপালে তা বাঁচিবে কেন? আর তার এমন হলে পর তোমার ঠাকুর দাদাওত আর বেশী দিন বাঁচিলেন না, পুত্র শোক সহ্য করিতে পারিলেন না। আমি অভাগিনী পাষাণী, তাই আজও বাঁচিয়া আছি। তাই না হয় পতিপুত্র হীন হইলাম, নিজের সুখের আশা জন্মের-মত বিসর্জ্জন দিলাম, তা যম কি পরকে লইয়াই সুখী হতে দিল? রাবণের পুরী শ্বশুরকুল কয়েক বৎসরের মধ্যে ছতিছন্ন হইয়া গেল।—বাপের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিলাম, মনে করিলাম ভাইপোটিকে লইয়া সুখী হইব। ওমা, পোড়া বিধাতা কি তাহাতেও বাদ সাধিল।" এইবার বিমলা দিদির কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। অতি পুরাতন শোকের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি নূতন শোকের কথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। এই সুদীর্ঘ শোক-কাহিনী ধারাবাহিকরূপে কহিতে কহিতে, তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে উষ্ণ বাষ্পরাশি সঞ্জাত হইয়াছিল তাহা ক্রমে চক্ষুদ্বয় পূর্ণ করিয়া দুইটি বড় অশ্রু বিন্দুরূপে গণ্ডবাহি হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। বিনয় কুমার প্রাণে ব্যথা বোধ করিলেন। বয়স জিজ্ঞাসা করায় যে এতকথা উঠিবে তাহা তিনি ভাবেন নাই। বিমলা দিদিকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন—"দিদি আর ওসব কথা ভাবিয়া কি হবে, সংসারে অনেকেরই

ভাগ্যে এরূপ হয়, এখন ইষ্টদেবকে স্মরণ করিতে করিতে ও আমাদের মত নাতি নাতিনীর সঙ্গে হাসি গল্প করিয়া বাকী জীবন টুকু কাটাইয়া দাও।”

বি দি। আমি ভাই ভাবি না। আর ভাবিয়া কি পাগল হব? পাগলের বাড়া গাল নাই। যখন অসহ্য হইয়াছিল তখন কিছু টাকা কড়ি জোটপাট করিয়া তীর্থগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। সেই হতে মনটা অনেক স্থির হয়েচে। আর সহিতে সহিতে বুকও পাষাণ হইয়া যায়। এখন ভাই তোদিগে নিয়েই সুখ, তোদের ভাল হলেই মনটা ভাল থাকে।

বি। বিমলা দিদি তোমার মনটি হীরের টুক্‌রো। গ্রামে এমন লোক নাই তোমার নামে গলিয়া যায় না।

বি দি। তা ভাই পাঁচ জনের ভালবাসা আছে বৈকি। এই তোমার বাপ, বলিতে কি আমাকে সন্তানের অধিক শ্রদ্ধা করেন। আর কোন কাজ আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া করেন না। আজ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তুমি নাকি বলিয়াছ এখন বিবাহ করিবে না? লোকনাথের ইচ্ছা হরিপুরের যে মেয়েটির সহিত সম্বন্ধের কথা আজ আসিয়াছিল, সেইটিরই সহিত তোমার বিবাহ হয়। মেয়েটির বাপের অবস্থা নাকি আজ কাল খুব ভাল। আর গ্রামটি বেশ সভ্য ভব্য ভদ্রস্থান, সকলেই চাকুরী বাকরি করে। মেয়েটিও ভারি রূপসী, ডাকের সুন্দরী। কুটুম্বিতাও বেশ নিকটে হ’বে। যোগেশের শ্বশুর-বাড়ী দূরে হওয়ায় ভাল কারবার হয় নাই। সেই জন্য তোমার মায়ের একান্ত ইচ্ছা হরিপুরেই বিবাহ হয়। তা তুমি অমত করেছ কেন?

বি। না দিদি আমি এখন বিবাহ করিব না।

বি দি। বিনয় তুই পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বলিয়া ঘৃণা করিস্ না। মেয়েটী কলিকাতায় থাকে, বেশ লেখাপড়াও শিখেছে। তা ইচ্ছা হ’লে কাটা

পোষাক পরিয়ে মেম সাজাতে পারবি। এমন কি যা শুনেছি, নাচ গানের সখ হলেও বাহিরে যেতে হবে না, ঘরে বসেই সাধ মিটিবে।

বি। তুমি এত খবর পেলে কোথা হ'তে ?

বি দি। আমি সব খবর রাখি। হরিপুরের মেয়েরা বড় তৈয়ের, পুরুষ ভোলাতে তারা বড় জানে। এখন বিনয়, বল্ দেখি তোর মত কি ? লোকনাথ দুই এক মাসের মধ্যে বিবাহ দিতে চায়।

বি। আমি তো তোমাকে আমার মত বলেছি।

বি দি। কেন বল্ দেখি বিনয় অমত করিতেছিস, তোর আসল মনের কথাটা কি ?

বি। মনের কথা আবার কি, আমার এত শীঘ্র বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় না।

বি দি। শীঘ্র ? (বিনয়কুমারের চিবুক ধরিয়া) ওমা! কি আমার ছেলেমানুষটী গো। এতদিন বিয়ে হলে তিনটে ছেলে হ'ত। আজ কালকার ছেলেদের মন পাওয়া ভার,—কি জানি ভাই কোথা হয়ত লুকিয়ে মালা বদলাবদলি করেচিস্। তোমাদের অসাধ্য তো কিছু নাই।

বি। আরে দুর ঠাকুরুণদিদি, তুমি কি ক্ষেপেচ ? এ দিকে যে, সন্ধ্যে হয়ে এলো, তোমার যে জপ করার সময় ব'য়ে যায়, ঝুলিটে কি সঙ্গে এনেচ ?

বি দি। ঝুলি সঙ্গে আনি নাই। জপের সময় ব'য়ে যায় বটে এখন তবে আসি।

বি। আচ্ছা এস। আমি কাল দাদার সঙ্গে দেখা করিতে যাব।

বি দি। সেকি! কাল যাবে! তবে আমার সহিত দেখা করিয়া যাইও, আমার ঢের কথা বাকি আছে।

বি। হাঁ তা যাব বৈকি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভ্রমণ।

বিবাহের কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিনয়কুমার তাঁহার জ্যেষ্ঠ যোগেশচন্দ্রের কার্য্যস্থান ইসলামাবাদে গমন করিলেন। গ্রামের অনেকেরই আশাভঙ্গ হইল। নানারূপ কথাও উঠিতে লাগিল। কেহ বলিল, বিনয় বাবু খৃষ্টান হইয়া বিলাত যাবে ও মেম বিবাহ করিবে। কেহ কেহ বা ছোট বাবু বেহ্মজ্ঞানী হইয়াছে ভাবিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কেহ বলিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইবেন। যাহারা এ সব কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহারা বলিল, বিনয়কুমার অতি লজ্জাশীল, কেবল লজ্জা বশতঃই বাহ্যতঃ বিবাহে মত প্রকাশ করেন নাই। বিনয়কুমারের মাতার এই মত। তাঁহার সন্তান-বৎসল পিতা বিনয়কুমারের এ কার্য্যকে বিশেষ অবাধ্যতা বলিয়া মনে করিলেন না, ছেলে মানুষের খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। এবং মনে মনে ভাবিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেশচন্দ্রকে এ বিষয়ে একখানি পত্র লিখিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

বিনয়কুমার ইসলামাবাদে আসিয়া তাঁহার খেয়াল কল্পনা লইয়া, পথ মাঠ ঘাট, নূতন স্থান, নূতন বাগান, নূতন নূতন জনপদ দেখিয়া, নূতন লোকের সহিত আলাপ করিয়া, প্রহৃষ্ট মনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বিদ্যাধ্যয়ন কালে তিনি নিজের মনকে এক এক সময়ে যেন বন্দী ভাবাপন্ন বোধ করিতেন। তাঁহার সর্ব্ববিষয়গামিনী বুদ্ধি অনেক দিকে ছুটিতে চাইত। বাহিরের সকল প্রকার তরঙ্গ, কি সামাজিক, কি ধর্ম্ম বিষয়ক, কি রাজনৈতিক, তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিত, কিন্তু তিনি আত্মমন

শাসনে সক্ষম ছিলেন। চিন্তা-স্রোত ইচ্ছামত চালিত করিতে, এবং উপস্থিত কর্ত্তব্যে নিয়োগ করিতে পারিতেন; এবং সেই জন্যই জ্ঞানার্জ্জন রূপ সুকঠিন সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখন তিনি অবসর পাইয়াছেন। এক সময়ে কত প্রকার চিন্তা দল বাঁধিয়া আসিয়া তাঁহার মনে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাইত, কত প্রকার ভাব হৃদয়ে পরিস্ফুট হইবার উপক্রম করিত। কিন্তু তিনি—"এখন যাও সময় পাইলে ডাকিয়া লইব" বলিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতেন; তাহারা মনের ভিতর উঁকি ঝুকি মারিয়া বেড়াইত। এখন তিনি সময় পাইয়াছেন। একদিন বিকালে বিনয় কুমার প্রান্তরে যাইয়া তাঁহার সেই পুরাতন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সহিত আলাপ করিবার উদ্দেশ্যে ভ্রাতার বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সহর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটী বিখ্যাত উদ্যান আছে, তিনি তথায় গমন করিলেন। উদ্যানটী সুবিস্তীর্ণ, সুসজ্জিত, পরিপাট্যময়; তাহার মধ্যে একটী স্বচ্ছতোয়া পুষ্করিণী; পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে একটী বৃহৎ অত্যুচ্চ জৈন মন্দির; মন্দিরটি দেখিলেই বোধ হয়, উহা কোন ধনী লোক কর্ত্তৃক অতি যত্নে রক্ষিত; বহুদিনের হইলেও ইহা নবনির্ম্মিতের ন্যায় তুষারধবল। পুষ্করিণীর আজলতটবিস্তৃত সোপানশ্রেণী দূর হইতেই যেন আগন্তুককে মন্দিরের ভিতর পরিদর্শনে আহ্বান করিতেছে। ভিতরের শোভাও অপূর্ব্ব; মর্ম্মর নির্ম্মিত মন্দিরতল; দেওয়াল নানারূপ দেব দেবীর মূর্ত্তিতে ও বহুবিধ মনোহর পত্রপুষ্পাকারে খচিত; বহুবর্ণের বহুমূল্য বহুশাখ বেলওয়াড়ী ঝাড় চারি দিকে লম্বমান; মধ্যস্থলে বৃহদায়তন কারুকার্য্যময় শুভ্র রৌপ্য সিংহাসনে এক সুচিক্কণ শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত নিমীলিতনেত্র সৌম্যদর্শন যোগী মূর্ত্তি।

বিনয়কুমার এই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। উদ্যানদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ বট বৃক্ষ আছে। তাহাতে অসংখ্য বিহঙ্গম সমাগত হইয়া সম্মিলিত কাকলিধ্বনির একটি বহুদূর-ব্যাপী রোল তুলিয়াছে।

ধী। বল কি! সে যে অনেকদূর, তুমি কেমন সময় বেরিয়ে ছিলে?

বি। বোধহয় ৩॥ টা ৪টার সময়।

ধী। এই প্রচণ্ড রৌদ্রে তুমি ৩॥ টার সময় বেড়াতে বেরিয়েচ? এমন কাজও করে, ছেলেমানুষ কিনা!

বি। কৈ আজত তেমন রোদ্ থাকে নাই, আমিত কৈ কিছু কষ্ট বোধ করি না।

ধী। দাদা! এখনও ছেলেমানুষ কিনা! আমরাও একদিন বেড়িয়েছি। কিন্তু আর পারিনা। একটু না বেড়াইলে নেহাত হজম হয় না, কি করি সন্ধ্যার সময় একবার বাহির হই। তা দেখনা, বাড়ী হইতে আধ মাইল না আসিতে আসিতেই হাঁপিয়ে গেছি, আর ঘামে সমস্ত কাপড় ভিজে গেছে।

বি। আপনার বয়স কত হবে, চল্লিশের ত অনেক কম বোধ হয়।

ধী। আর প্রায় চারের কোঠায় পহুঁছিলাম বৈকি, দুই এক বৎসর কম হইবে।

বি! এরই মধ্যে আধমাইল হাঁটিয়া হাঁপাইয়া গেলেন! নিয়ম মত ব্যায়াম না করিলে এই রূপই হয়।

ধী। এই নূতন কলেজ হতে বেরিয়েছ কি না, ভায়া, এখন ও ইস্কুলী বুলি ছাড়িতে পার নাই। আমরাও পড়বার সময় একবার ব্যায়াম ব্যায়াম করে খেপেছিলাম। ও সব হে ভাই মিছে কথা, সাহেবী নকল; আমাদের এ গরম দেশে কি ব্যায়াম সহ্য হয়? এই যে আমরা নড়ে চড়ে বেড়াই, তাতে যে মেহনত হয়, সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ব্যায়াম। সংসারে প্রবেশ করিলেই এ সব কথা বুঝিতে পারিবে। এখন যাউক এ সকল কথা, যোগেশ দাদা সে দিন আমার সহিত পরামর্শ করিতে ছিলেন—তোমাকে কোন্ লাইনে দিলে ভাল হয়। আমি বলি তুমি ওকালতীই লক্ষ্য কর। চাকরীতে আজকাল কোন সুখ নাই, গাধার

খাটুনী খাটীতে হয়। আমি একবার ভেবে ছিলাম চাকরীতে ঢুকি, কিন্তু তাহলে কি ভুলই করিতাম!

বি। উকিল হয়ে আর কি হবে, উকিলে যে দেশ ছেপে গেল।

ধী। তা যাউক না, তাহাতে ক্ষতি কি, এ ব্যবসাটা কি জান ভাই, দাড়ী না পাকিলে কিছু হয় না, মাটী কামড়ে পড়ে থাকিলে নিশ্চয়ই কিছু হয়।

বি। মাটী কামড়াইয়া যদি ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তবেই না দাড়ী পাকা পর্য্যন্ত টিকিবে। আর ১০ জনের অন্নে এক শ জন ঝুকিলে সকলেরই কষ্ট, মান সম্ভ্রমও থাকেনা।

ধী। আরে ভায়া তোমার অত ভাবনার দরকার কি? যোগেশ দাদা আছেন, আমি আছি, তোমার শীঘ্রই পশার হয়ে যাবে। আমি এই দুই তিন জন জুনিয়ার উকিলের পশার করিয়া দিয়াছি।

বি। আমি এখন এসব বিষয়ে নিজের জন্য কিছুই ভাবি না। এই এঁত দিন পাশ করার চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম। এখন কিছু দিন ত নিশ্চিন্ত হইয়া বেড়াই।

ধী। সে বেশ কথা। কিছুদিন বিশ্রাম করা ভাল। তোমাদের অবস্থা ভাল, ব্যস্ত হবার ত কোন কারণ নাই। তবে এই সময়ে লোকের সহিত মিশিতে শেখ; তবে সংসারের জ্ঞান হইবে। এ ব্যবসায়ে ভাই উন্নতি করিতে হইলে একটু মিশুক হতে হবে। শুধু কবি হয়ে মাঠে মাঠে বেড়ালে চলিবে না। চল একটু হৃদয় বাবুর বাসা দিয়ে বেড়িয়ে আসি, যাবে?

বি। চলুন আমার আপত্তি নাই। হৃদয় বাবু কে?

ধী। তিনি আমাদের আউওয়াল সদর আলা। বড় ভাল লোক, যেমনি বুদ্ধিমান, তেমনি আমুদে, আর কাযেও বড় ক্ষিপ্রহস্ত। আজ তোমার সহিত আলাপ করাইয়া দিব।

এইরূপ কথা বার্ত্তা করিতে করিতে উভয়ে ধীরেন্দ্র বাবুর বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধীরেন্দ্র বাবু বিনয়কুমারকে বাহিরে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া কাপড় বদলাইতে গেলেন। বিনয়কুমার তাঁহার বাড়ীটি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। যে উকিলের বাড়ীর অবস্থা এরূপ, তিনি এত মুরব্বিআনা করেন কি করিয়া, এই ভাবিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। ধীরেন্দ্র বাবু কিন্তু বাহিরে আসিয়াই বলিলেন—"ভাই বাড়ীটার বড় অসুবিধা, তবে এই বাড়ীতে থাকিয়াই নাকি পশারটা হয়েচে, সেই জন্য শীঘ্র ছাড়িতে পারিনা। নিজের বাড়ী তৈয়ার করিব বলিয়া একটা জায়গা স্থির করিয়াছি, দাম বলিতেছে পাঁচ হাজার, আমি তিন হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়াছি।"

অতঃপর উভয়ে হৃদয় বাবুর বাসার দিকে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষিত সমাজ।

হৃদয় বাবু বিকালে কাছারী হইতে আসিয়া, চোগা চাপকানরূপ পুরা আফিশিয়াল পোষাক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোট পেণ্টেলুনরূপ ডেমি অফিশিয়াল পোষাক পরিধান করিয়া সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইলেন। ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, ক্ষণেক বা নিম্নদৃষ্টি হইয়া, ক্ষণেক বা স্বুবর্ণ চসমা-শোভিত বদন উন্নত করিয়া, এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক জন চাপরাশি কিছু দূরে আপদ বিপদে রক্ষার্থে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। অনেক বার তাঁহার পথরোধকারি অন্যমনস্ক হিন্দুস্থানী, চাপরাশীর সজোর "হট্ যাও" শব্দে চমকিত হইয়া, পশ্চাতে অশ্ব আসিতেছে ভাবিয়া সরিয়া দাঁড়াইল এবং অশ্ব দেখিতে না পাইয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল। হৃদয় বাবু এইরূপে কিয়দ্দূর আসিলেন। অন্যদিন বাড়ীর বাহির হইতে না হইতে অনেক সঙ্গী জুটিয়া যায়! আজ এ পর্য্যন্ত কেহ জুটিল না। একলা একলা ভ্রমণ শোভা পায় না। শালুকবেষ্টিত না হইলে পদ্মের সৌন্দর্য্য খোলেনা। বকমধ্যস্থ না হইলে হংসের গৌরব বোঝা যায় না। তিনি গৃহে ফিরিলেন।

গৃহ কিন্তু নামে মাত্র, কারণ হৃদয় বাবু কিছুদিন হইতে গৃহশূন্য। সেই শূন্য গৃহে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল; মশক-বৃন্দের সম্মিলিত ভোঁ ভোঁ শব্দে তাহার নির্জ্জনতা অতি বিকট ভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। হৃদয় বাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া বিষণ্ণ-মুখে ভাবিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ বিন্যস্ত আরও কয়েকখানি শূন্য চেয়ার তাঁহার দিকে জড়ময় শীতল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তিনি একবার স্থির করিলেন বসিয়া বসিয়া রায় লিখিবেন এবং চাপরাশিকে কাছারির বাক্স আনিবার হুকুম দিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া তাহাকে বলিলেন "দেখ ত ডাক্তার বাবু ঘরপর্ হ্যায়্ কি না, রহে ত হামারা সেলাম দেও।"

"হুজুর আচ্ছা" বলিয়া চাপরাশি চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার অল্প-ক্ষণ পরেই ডাক্তার বাবুর গাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। হৃদয় বাবু গাড়ীর শব্দ শুনিয়া তৎপর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন! কোটপেণ্টেলুনা-চ্ছাদিত, চেন-শোভিত প্রফুল্লবদন ডাক্তার বাবু গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন! হৃদয় বাবু বলিলেন—"আরে, এস হে ভায়া, এই যে তোমাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলাম"।

ডা। কেন, এত ডাকাডাকী কেন, আমারত অধিক বিলম্ব হয় নাই।

হৃ! আর নাও, ভারি ডাক্তারি করিতেছ, একটা ডিস্‌পেনসারি করেছ, সেটা যদি কোন কাযে লাগে, কোন ভাল জিনিষ যদি আব-শ্যক মত পাওয়া যায়। এস, এখন বসিয়া দুটো কথা বার্ত্তা ক[illegible]।

ডা। দাদা আজ আর ভাবনা নাই। কয়দিন চিঠির উপর চিঠি লেখায়, টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম করায়, আজ সব মাল আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

হৃ। দোকানে পঁহুছিয়াছে বলিতে পার, না ষ্টেসনে পড়ে আছে?

ডা। দোকানে পঁহুচান কি, প্যাক খোলা পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে।

আমি দাঁড়িয়া থাকিয়া খুলাইলাম, সেই জন্তই না একটু আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।

হৃ। আমার ফরমাসী জিনিসটা আসিয়াছে ত?

ডা। হাঁ সব।

হৃ। বাঃ বাঃ! মিঞাজান! মিঞাজান!

মিঞাজান "খোদাবন্দ্ শব্দে হাজির হইল। হৃদয় বাবুর সঙ্কেত মত ডাক্তার বাবু একফর্দ্দ কাগজে কি লিখিয়া মিঞাজানের হাতে দিলেন। মিঞাজান কাগজ লইয়া আদিষ্ট স্থানে গমন করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্যাম বাবু ও শশি বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামবাবু একজন নামজাদা পশারশালী উকীল। শশিবাবু একজন কর্ম্মচারী। হাকিম নহেন, তবে উচ্চ বেতন পান এবং সেই জন্য হাকিম কিংবা বড় দরের উকিল না হলে মেশেন না। তাঁহারা গৃহে প্রবেশ মাত্র হৃদয় বাবু ও ডাক্তার বাবু কর্ত্তৃক আনন্দময় কোলাহলের সহিত সমাদৃত হইয়া চেয়ার অধিকার করিলেন। চারি জনের মধ্যে যখন গল্প ও হাস্য-চ্ছটা উছলিয়া উঠিতেছে, সেই সময়ে ধীরেন্দ্র বাবু ও বিনয়কুমার হৃদয় বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। ধীরেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া ডাক্তার বাবু ও শ্যাম বাবু পূর্ব্ববৎ কোলাহলময় সম্ভাষণ করিলেন, কিন্তু হৃদয় বাবু কিছু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আর যে দেখাই পাওয়া যায়না হে, ডুমুর ফুল হলে নাকি?"

ধীরেন্দ্র বাবু যেন কোন মহৎ কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইয়াছে এইরূপ অপ্রতিভতা দেখাইয়া বলিলেন—"কয়েক দিন বড় ঝঞ্চটে পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য আসিতে পারি নাই।" হৃদয় বাবুর মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ধীরেন্দ্র বাবুর এই ঝঞ্চাট কি তাহা বিস্তার করিয়া বলিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এক জন নূতন লোক সঙ্গে থাকায় তাহা ঘটলনা। বিনয়কুমারের সহিত তাঁহাকে সকলের পরিচয় করিয়া দিতে হইল। হৃদয় বাবু পরিচয়

পাইয়া, একটু ভাবশূন্য হাসির সহিত হস্তাগ্রভাগ দ্বারা করমর্দ্দন পূর্ব্বক বিনয়কুমারকে বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি কেবল বেড়াইতে আসিয়াছেন না কোন কর্ম্ম উপলক্ষে আসিয়াছেন?"

বি। বেড়াইতেই আসিয়াছি।

ধী। মহাশয় এঁর বেড়ান বড় সোজা নয়, বেলা ৩ টার সময় মুলুক চাঁদের বাগানে বেড়াতে গিয়াছিলেন! আমি ধরিয়া আনিলাম, বলি শুধু বাগানে বেড়াইয়া আর কি হবে, লোক জনের সহিত আলাপ কর।

শ্যা। আরে ছোকরা বয়স, এখন একটু বাগানে না বেড়াইলে কবিত্ব ফুটিবে কেন? তোমার মত কি শুধু রাস্তার ধূলা খাইবে?

ডা। শ্যাম তুমি গত রবিবারে বড়ই কবিত্ব ফুটিয়েছিলে। দারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ যায়, আরম্ভ করিলে কিনা বসন্ত বর্ণনা। মাথায় তিন কলসী জল ঢালা হইল, তবু বসন্ত বর্ণনা আর বন্ধ হয় না, কোকিলের কুহুরব আর থামে না।

ধী। শেষে ধূলা খেতে হয়েছিল কি না!

ডা। ধূলো ছেড়ে শেষে কাদায় পর্য্যন্ত মাখামাখি।

শ। (বিনয়কুমারের দিকে লক্ষ্য করিয়া) আপনি বাগান কেমন দেখিলেন?

বি। অতি সুন্দর বাগান, মন্দিরটিও খুব জাঁকাল।

শ। হবেনা কেন, যে লোকের মন্দির, তার টাকা কত! আর মন্দিরে খরচও অনেক করে।

হ। দেখুন শশি বাবু মুলুক চাঁদ লোকটা ধর্ম্মের ভাঁড়ামি অনেক করে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড় জালিয়াত লোক।

শ। না না, তা কেন হবে, বেশ লোক। আমি বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্ম্মটা অনেক দিন নাকি বিশেষ রূপ অধ্যয়ন করিয়াছি, সেইজন্য আমি বুঝিতে পারি। আমি লোকটার সহিত কয়েকদিন কথা বার্ত্তা করিয়াছি। তা দেখিয়াছি লোকটার বেশ জ্ঞান আছে।

হৃ। আর রেখে দেন জ্ঞান। আমরা ত মোকর্দ্দমায় সব জানিতে পারি। লোকটার জাল জুয়াচুরী ঢের আছে, অনেক লোককে ঠকিয়েছে, সে দিন আমার কাছে একটা মোকর্দ্দমা ছিল।

শ। আপনারা মোকর্দ্দমার ভিতর দিয়াই সব দেখিতে চান, সেই না মুস্কিল।

হৃ। (একটু বিরক্তভাবে) আর মশায়, মোকর্দ্দমায় লোক বোঝা যায় না ত কি আর আপনার মত কেতাব পড়িয়া লোক বোঝা যায় ?

শ। (একটু উত্তেজিত হইয়া) কেন যাবে না, মুলুকচাঁদ ধনী লোক, সে ত আর নিজে মোকর্দ্দমা করে না, যে মোকর্দ্দমায় তাহার প্রকৃতি বুঝিবেন। আর আমি তাহার সহিত নিজে মিশিয়াছি, কথা বার্ত্তা কহিয়াছি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছি, আমি তাহাকে চিনিতে পারিব না ?

হৃ। কথা শুনে মানুষ চিনিবেন এরই নাম ছেলেমারা বুদ্ধি আর কি! কথায় কেনা আপনাকে ভাল দেখাতে চায় ?

শ। (একটু অপ্রস্তুত হইয়া) আমি তার শাস্ত্র জ্ঞানের কথা বল্‌চি।

হৃ। ও বেটাদের আবার শাস্ত্র! ওদের আছে কি ? আপনি যে বলিলেন বৌদ্ধদের ও জৈনদের শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, আপনি কি পালি ভাষা জানেন ?

শ। সংস্কৃত ভাষায় ও সম্বন্ধে অনেক কেতাব আছে এবং অনেক ভাল ইংরাজী কেতাবও আছে।

হৃ। আপনার স্কুলের লাইব্রেরীতে ত ? তবেই হয়েচে। মশায় বৌদ্ধ ও জৈনদের পুস্তক হিন্দুরা কি কিছু রাখিয়াছিল, সব জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

শ। আপনি এত বড় একটা কথা বলিয়া ফেলিলেন, কিছু প্রমাণ দিতে পারেন ?

ডা। ওহে শ্যাম বাবু এঁরা বড় মুস্কিল লাগালেন, পাণ্ডিত্যের ঝগড়া বাধান যে। মশায়, লোক চেনা শুধু মোকর্দ্দমা করেও হয় না, শুধু

কেতাব পড়েও হয় না, নাড়ী টেপা চাই"। কথায় বলে নাড়ী নক্ষত্র জানা, আমি তাই ও বেটাদের সব জানি, নাড়ী টেপার জোরে ভিতরের খবর বাহিরের খবর সব জানি।

শ্যাম বাবু ডাক্তার বাবুর পিঠে চাপড়াইয়া বলিলেন "তা বৈকি, দাদা নহিলে কি কেহ লোক চিনিতে পারে, বলত দাদা ভিতরের খবর টা কি জান?"

ডাক্তার বাবু হা হা শব্দে একবার হাস্য করিয়া বলিলেন "আর থাক্"।

শ্যা। আর থাক্‌বে কেন বলই না খুলে।

ড। আর খোলা খুলিতে কায নাই। কি জান বেটাদের বাস্তবিকই সব ভণ্ডামী। আর মেয়েগুলোত এক একটি কাশীর ভৈরবী; সন্ধ্যা বেলায় মন্দিরে যাওয়াটা নিয়ম মত চাইই।

শ। আর ছেড়ে দেন মশায় মেয়েদের কুচ্ছ, কি কায ও সব কথায়?

হ। আসল কথা কি জানেন, কি মেয়ে কি পুরুষ, ওদের মধ্যে মরালিটি যাকে বলে তা নাই, আমাদের জজসাহেবও সে দিন তাই বল্‌ছিলেন। তবে দান ধ্যানের কতকটা বাহ্যিক ভণ্ডামী আছে।

শ। দান ধ্যানটা কি কম কথা বিবেচনা করেন?

শ্যামবাবু শশিবাবুর কথায় কান না দিয়া বলিলেন—"আর মশায় শুধু ওদের মধ্যে কেন, ভণ্ডামীতে দেশটা ভরিয়া গেল। কত ভেক ধরিয়া কতলোকে যে শীকার ঢুঁরে বেড়াচ্চে তা বলা যায় না। জানেন না বুঝি, সে দিনে এক লম্বা দাড়ী, লম্বা কামিজ, চস্‌মা নাকে লোক আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত। একটু বসিয়াই দুইখানা চাঁদার খাতা বাহির করিল। বলিল তিনি একজন কলিকাতার অনাথ আশ্রমের লোক এবং কংগ্রেসেরও চ্যাম্পিয়ন। আমি তখন শ্যামপেনের চাম্পিয়ন হয়ে বসে ছিলাম, গোটাকয়েক কাটা কাটা বোল শুনিয়ে দিতেই আর পালাতে পথ পায় না।"

বিনয়কুমার চুপ করিয়াই বসিয়াছিলেন। এখন শ্যামবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় আপনি কি কখনও কোন বিষয়ে চাঁদা দিয়া ঠকিয়া ছিলেন?"

শ্যা। আরে মশায় চাঁদা দিই কোথা থেকে, আমাদের এই সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়ে দুপয়সা উপায় করা, এ হার্ড আর্নড্ মাণি কি আজ কালকার দিনে যাকে তাকে দেওয়া যায়?

শ। শ্যামবাবু আমাদের সে বৎসর এলাহাবাদে ডেলিগেট্ হইয়া যাইতে না পারিয়া অবধি কংগ্রেসের উপর বড় চটিয়াছেন।

শ্যা। না মশায়, আমি বরাবরই চটা, পাঁচ জনের সঙ্গে ডেলিগেট্ হয়ে যাবার একবার সখ উঠেছিল বটে, সে কেবল একটু বেড়াইবার জন্য। এখন দেখ্‌চি ও সব গোলমাল কোন কাজেরই নয়।

হ। আমাদের জজসাহেবও সেদিন বলিতে ছিলেন যে—"বাবু তোমরা করিতেছ কি, আপনাদের পায়ে আপনারাই কুঠার মারিতেছ; যদি এ সব হুজুগ আন্দোলন না করিতে, ত এতদিন কত ভাল ভাল পদ পেতে।"

ডা। বাবা, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি? ও সব কংগ্রেস ফংগ্রেসের তর্কে কি লাভ? এখন কাল যে নবীন বাবুর প্রমো-সনের খাওয়ানর দিন স্থির হয়েচে, তার ব্যবস্থা কি হবে বলুন দেখি?

ধী। ব্যবস্থাত শুনেছি সব হয়ে গেছে।

ডা। সে হউক, এখন আমাদের শ্যামকে লয়ে একটু গোল আছে।

শ্যা। সে কথায় আর দরকার কি, তোমরা ভাই খাওগে, আমোদ করগে, আমি আর কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি না।

শ। কেন বলুন দেখি?

শ্যা। সে মশায় ঢের কথা।

ডা। হয়েছিল কি জানেন, এক জায়গায় খাওয়ানের সময়, নামোল্লেখে

আর দরকার নাই, কোন কায়স্থ ভদ্রলোক হঠাৎ ব্রাহ্মণের পংক্তিতে খাইতে বসিলেন, তাই লইয়া একটা মহাহুলস্থূল হইয়া গেল।

শ্যা। এটা কি সহ্য করা যায় মশায়, বলুন দেখি? আমরা বিদেশে যাই করি না কেন, দেশে এখনও শূদ্রের ঘরে জল গ্রহণ করি না। সে ইজ্জৎ টুকু কেন খোয়াব বলুন দেখি?

ডা। আচ্ছা ভায়া, এবার এমন ব্যবস্থা করা যাবে, যাতে এ সব গোল যোগ কিছু হবে না। তুমি যাবে না প্রতিজ্ঞা ধরে থাকলে কিন্তু চলিবে না, যেতেই হবে।

শ্যা। আচ্ছা সে এখন দেখা যাবে। আমি কিন্তু কাঁচা কথায় কোন কাজ করি না।

এই সময় রহিম সেখ একটি তোয়ালে আবৃত বৃহৎ পাত্র হস্তে সদর আলা বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। রহিম সেখ ডাক বাঙ্গালার খানসামা। তাহার প্রবেশ মাত্র বাবুরা সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে তাকাইলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন "কি রহিম আজ যে বিনা খবরেই হাজির, অনেক সময়ে খবর দিয়েও পাওয়া যায় না, ব্যাপারটা কি?"

রহিম। হুর্জুর, আজ সাহেব লোগ্‌কা নাচ ঘরমে বড়া তামাসা হুয়া, বহুত জায়গাকা সাহেব মেম জমা হুয়া, হামার উপর বহুত উম্‌দা উম্‌দা চিজ বানানেকা হুকুম হুয়া, সব খরচ নেহি হুয়া। হুজুর লোগ্‌কা হাম পুরাণা তাঁবেদার আছি, ইসিসে বিনা খবর চলে আয়া হায়। হুজুর দেখিয়ে ক্যাসা উম্‌দা উম্‌দা চিজ্‌ বানায়া গিয়া, ইংলিশ ডি[illegible] হ্যায়, ফ্রেঞ্চ ডিস হ্যায় দেখনেসে দিল্‌ খোস্‌ হো যাগা।

এই বলিয়া সেখজী নত হইয়া হস্তস্থিত পাত্র বাবুদের মধ্যবর্ত্তী টেবিলের উপর স্থাপন করিল, এবং দগ্ধকাষ্ঠবিনিন্দিত দক্রু-বিনষ্ট নখ, অথচ শ্বেত চাপকানশোভিত হস্ত খানি দ্বারা ধীরে ধীরে পাত্রাবরণ তোয়ালে খানি উঠাইয়া লইল। এই সময় একটু মৃদুহাস্য দেখা

দেওয়ায় সেখজীর সম্মুখবর্ত্তী বহিরাগত-মূল সমল দীর্ঘ দন্ত দুইটির বড় শোভা হইয়াছিল, এবং প্রকাণ্ড একটি পাগরির নীচে কোটর-প্রবিষ্ট, কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মাবিন্দুসংযুক্ত চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তোয়ালে উঠাইয়া লইলেই বাবুরা সকলে পাত্রের দিকে অবনত মস্তক হইলেন। শ্যামবাবু বলিয়া উঠিলেন "Excellent Dish" ডাক্তার বাবু কি "চমৎকার ফ্লেভার" বলিয়া আনন্দে জানুপরি করতলাঘাত করিলেন। রহিম সেখ আপনার বুদ্ধিকে মনে মনে প্রশংসা করিয়া বলিল "আজ তাঁবেদারকে পুরা ইনাম দিতে হোবে।" হৃদয় বাবুর মুখ শুকাইল। ধীরেন্দ্রও তথৈবচ। শ্যামবাবু তাহাদের কষ্ট বুঝিয়া এবং নিজে বাহাদুরী লইবার জন্য বলিয়া উঠিলেন—"রহিম যাও, কাল আমার কাছে দশটা টাকা লইয়া যাইও।"

রহিম। দশ টাকায় হোবে না, ইনসাফ্ কিজিয়ে।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আচ্ছা যা আমি পাঁচ টাকা দিব।" রহিম খুসি হইয়া সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া গেল।

হৃদয় বাবু এখন মিঞা জানের বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। মিঞাজান কিন্তু তখনই আসিয়া পঁহুছিল এবং "উল্লুক, সুয়োর, এত বিলম্ব কেন" এই ভাবে সম্বোধিত হইতে হইতে টেবিলের উপর দুইটি বোতল রাখিয়া প্রস্থান করিল। বাবুরা তখন সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বিনয়কুমার বাবু ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে চাহিলেন। শশি বাবুও উঠিতে চাহিলেন, কিন্তু ডাক্তার বাবু ও শ্যাম বাবু বাধা দিলেন। তখন শশি বাবু বলিলেন—"আমি না হয় একটু বসিলাম, কিন্তু বিনয় বাবু ছেলে মানুষ ওঁকে যেতে দেন না।" ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ছেলে মানুষ তায় ক্ষতি কি, দুনিয়ায় ত সব দেখা চাই, শেখা চাই, আমাদের কাছে শিখিবে না ত আর কোথায় শিখিবে?" ডাক্তার বাবুর এই সুযুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং শ্যাম বাবু বলিলেন "তা

বটেইত।" হৃদয় বাবু কিন্তু একটু বিলম্বে গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আচ্ছা ছেলে মানুষকে যেতে দাও।" বিনয় বাবু উঠিলেন। শশি বাবু তাহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া বিনয় বাবু শশি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় আপনি এখানে কি করেন।" শশি বাবু বলিলেন আমি এখানকার হাইস্কুলের হেডমাষ্টার।

বি। আপনি যে এঁদের সঙ্গে মেশেন?

শ। কি করি বলুন, সমস্ত দিনই আপনার লেখা পড়া নিয়ে থাকি। সন্ধ্যার সময় একটু কথা বার্ত্তা করিবার ইচ্ছা হয়, তা এমন লোকত পাই না দুদণ্ড আলাপ করি, সবই মূর্খের দল। সেই জন্য হৃদয় বাবুর এখানে মধ্যে মধ্যে আসি। তা যে রকম বাড়াবাড়ি দেখছি, আর আমার আসা পোষায় না।

বিনয়কুমার কোন উত্তর না দিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। শশি বাবুও গৃহে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃদ্বয়।

আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি যে বিনয় বাবুর ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র একজন স্থানীয় প্রধান উকীল, বিশেষ পশার-শালী; সুতরাং বাড়ী, বাগান, গাড়ী ঘুড়ী প্রভৃতি সকল সৌভাগ্য লক্ষণই তাঁহার আছে। বিশেষতঃ তাঁহার পৈত্রিক অবস্থা ভাল হওয়ায়, স্বোপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই তিনি কার্য্যস্থানে ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেখানে বিষয়াদিও বেশ করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত, বাস্তবিকই দেখিবার শোভায়, স্বাস্থ্য ও কার্য্য শৃঙ্খলতার উপযোগিতায়, রুচির নূতনত্বে ও সৌখীনতায়, বাড়ীটি সহরের মধ্যে অতুলনীয়। গৃহসজ্জাও প্রচুর এবং সুন্দর। বাড়ীর মধ্যে একটি প্রশস্ত পুষ্পোদ্যান, নানা রূপ বিচিত্র পত্র পুষ্পে শোভিত ও সৌরভময়। তাহারই সহিত সংলগ্ন একটি শাক সবজীর বাগান; সেটিও পারিপাট্যময় এবং ঘন সরস শ্যামল শাক সবজীতে পূর্ণ; ব্যবহারোপযোগিতার সহিত, বিশেষতঃ উদরার্থ ব্যবহারোপযোগিতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশিলে তাহা যেরূপ তৃপ্তিপ্রদ হয়, এই উদ্যানটিতে একবার দাঁড়াইলে সেইরূপ তৃপ্তি পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। ইহার তত্ত্বাবধারক বা তত্ত্বাবধারিকা স্বয়ং যোগেশচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী প্রভাত কুমারী; তিনি প্রাতে ও বিকালে অতি যত্ন সহকারে উদ্যানের গাছ গুলি দেখেন, কখন বা নিজ হস্তেই জল সেচন করেন; অঙ্কুর অবস্থা হইতেই তাহাদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রাখেন এবং দিন দিন নব নব পত্র ও

পুষ্পোদ্গম দেখিয়া সুখী হন। লতিকা কলিকা বয়সে যে যষ্ঠি খণ্ডকে অবলম্বন করিয়া উত্থান করিয়াছে, পূর্ণ যৌবনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া কেমন নিজের রূপের গৌরবে দলমল করিতে থাকে, কেমন নধর গ্রীবা উত্তোলন করিয়া আনন্দ-হিল্লোলে দুলিতে থাকে, তাহা দেখিয়া তিনি আহ্লাদিত হইতেন এবং কখন কখন বা নিজের অবস্থার সহিত তুলনা করিতেন।

যে দিন বিনয় কুমার হৃদয় বাবুদের বাসায় বেড়াইতে যান, তাহার পর দিন বিকালে তিনি পুষ্পোদ্যান মধ্যস্থ একটি বেদীর উপর যোগেশচন্দ্রের একমাত্র কন্যাটিকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন; বালিকাটির কোলে একটি শ্বেত শশক শিশু এবং পদতলে একটি নধর হরিণ শাবক। বালিকার অত্যধিক আদরে ইহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া এক এক বার পলাইতেছে এবং বালিকা তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ছুটিতেছে, ফুলের দল ছিঁড়িয়া আহারের প্রলোভন দিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র মাথাটি নাড়িয়া কাকা বাবুকে সাহায্যার্থ ডাকিতেছে। বিনয় কুমার চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া দিতেছেন। প্রভাতকুমারী দূরে গাছপালা দেখিয়া বেড়াইতেছেন।

এইরূপ বালিকার সহিত খেলায় ও কথাবার্ত্তায় মনের আনন্দে বিনয় কুমার কাল অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় যোগেশচন্দ্র সেই স্থানে আসিলেন এবং উদ্যানস্থ একটি লৌহাসনোপরি উপবেশন করিলেন। বালিকা তাঁহার অঙ্কে যাইয়া ঝাঁপিয়া পড়িল। যোগেশ বাবু তাহাকে আদরে বক্ষে লইয়া বিনয় কুমারের সহিত কথা বার্ত্তায় নিযুক্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিনয়, কাল তোমার বাসায় ফিরিয়া আসিতে অত বিলম্ব হইল কেন?"

বি। কাল আমি বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম পথে ধীরেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি আমাকে আপনাদের সদর আলা হৃদয় বাবুর বাসায় লইয়া যান, সেই খানেই বিলম্ব হয়।

যো। সেখানে আর কে আসিয়া যুটিয়াছিল?

বি। শ্যাম বাবু ও শশি বাবু বলিয়া দুইটি ভদ্র লোক ছিলেন।

যো। ডাক্তার আসিয়া যোটে নাই?

বি। হাঁ ছিলেন বৈকি।

যো। তবে ত পুরা মজলিশ হইয়াছিল; তা সে মজলিসে তুমি কি করিয়া অতক্ষণ বসিয়াছিলে?

বি। গেলাম ধীরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে, তিনি ত আর উঠেন না, আমার একলা চলিয়া আসাও ভাল দেখায় না, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু ধীরেন্দ্র বাবু আর উঠিতে চান না। কাযেই শেষে নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলাম, ধীরেন্দ্র বাবুর ওকালতীতে কেমন চলে? আমাকে ত অনেক উপদেশ দিলেন এবং আমি ওকালতী করিলে অনেক সাহায্যেরও আশা দিলেন।

যো। (হাসিয়া) সে একটা মহা ফাজিল লোক, আর সকলের কাছেই মুরুব্বিআনা করিতে ভালবাসে, ভাবে সেরূপ না করিলে বুঝি ওকালতীতে নাম হয় না। সে যাহা হউক, দেখ বিনয় আজ আবার বাবার এক খানা পত্র পাইলাম, তিনি তোমার বিবাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; হরিপুরে বিবাহ দেওয়াই তাঁহার সম্পূর্ণ মত এবং বিশেষ করিয়া আমাকে জানিতে লিখিয়াছেন কি কারণে তুমি বিবাহ করিতে অমত করিতেছ।

বিনয়কুমার অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"হরিপুর বা অন্য কোনই স্থান বিশেষে বিবাহ হওয়া না হওয়ায় আমার কোন মতামত নাই। তবে বিবাহ আমাকে অতি গুরু-দায়িত্ব-বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া বোধ হয়; এই এত দিন লেখা পড়া শিক্ষার জন্য মন ব্যস্ত থাকিত; তাহা শেষ হওয়ায় একটা যেন বোঝা নামিয়াছে, এখন কিছু দিন স্বাধীন ভাবে থাকিতে ইচ্ছা যায়। ইহারই মধ্যে বিবাহের গুরুদায়িত্ব মাথায় লইতে যেন ইচ্ছা যায় না।" যোগেশচন্দ্রও অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর

করিলেন—“বিবাহে গুরুদায়িত্ব আছে সত্য, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতি সে দায়িত্ব আনন্দের সহিত বহনে সমর্থ করিবার জন্য যথেষ্ট উপাদান আমাদের প্রাকৃতিক গঠনে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিবাহের সকল দায়িত্বই, বিশেষতঃ সন্তান প্রতি-পালনাদি ত প্রেমের বোঝা বহন করা। প্রকৃতিস্থ লোক মাত্রেই ইহাতে পরম সুখ বিবেচনা করিয়া থাকে। ইহার অভাবে শত শত লোকে তীব্র দুঃখানলে দগ্ধ হয়। অতএব এ দায়িত্বে তোমার ভীত হইবার ত কোন কারণ আমি দেখিতেছি না। আমার মতে ভদ্রলোকের মধ্যে বিবাহ কেবল তখনই অবিবেচনাব কার্য্য, যখন নিতান্ত আর্থিক অভাব থাকে। তোমার সম্বন্ধে ত আর সে কথা খাটে না। আর আমাদের সামাজিক অবস্থার গুণে বিবাহের দায়িত্বের অনেক লাঘব হইয়া যায়। বিলাতী সমাজে বিবাহ তৎসঙ্গে সঙ্গেই একটি বিভিন্ন স্বয়ংপ্রধান পরি-বারের সৃষ্টি করে, সুতরাং বিবাহের সকল দায়িত্বই প্রথম হইতেই বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের স্কন্ধে পতিত হয় এবং কাযেই তাহারা এ দায়িত্বে ভীত হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে ত তাহা নহে; আমাদের সমাজে প্রথম প্রথম বিবাহের সকল দায়িত্বই সংসারের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরিপক্ক বুদ্ধি প্রবীণ লোকের স্কন্ধেই পতিত হয়; অতএব আমাদের নব বিবাহিত নব বিবাহিতারা কিছুদিন ধরিয়া কোন দায়িত্বেরই ধার ধারেনা, কেবল নিরঙ্কুশ আনন্দ নীরে ভাসিতে থাকে।

বি। কিন্তু সেটা কি ভাল?

যো। ইহার ভাল মন্দ সমাজের অন্যান্য অবস্থার সহিত নিরপেক্ষ ভাবে ত কিছুই নাই। যে সমাজে পিতা মাতা সন্তানের বিবাহজনিত দায়িত্বের অংশ লইতে প্রস্তুত, সেখানে তাহাতে মন্দত কিছুই দেখি না। যেখানে পিতামাতা সে দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত নহেন, সন্তানের সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়াই বিবাহ করা ভাল। এখন পিতামাতার এ দায়িত্ব গ্রহণে

ইচ্ছা অনিচ্ছা, সমর্থতা অসমর্থতা সমাজের অন্যান্য অবস্থার উপর নির্ভর করে।

বি। বিবাহ জীবনের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন; কিন্তু আমাদের সমাজে ইহা যেরূপ ভাবে নিরর্থক ক্রিয়া কলাপ ও হাসি তামাসার মধ্যে একটি অজানিতা বালিকার সহিত ঘটিয়া থাকে সেটা কি ভাল?

যো। অজানিতা বালিকা ঠিক বলিতে পার না। পিতামাতা আত্মীয়গণ যে বালিকার কুলশীল, রূপ গুণ লক্ষণ সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখে, সে বালিকাকে অজানিতা বলিবে কি করিয়া? পিতা মাতারত সে বিশেষ রূপেই জানিত। তবে বিবাহার্থী পাত্রের পক্ষে অজানিতা হইতে পারে। কিন্তু যখন পিতামাতার উপরই দায়িত্বের ভার রহিল, তখন তাঁহাদের জানাই কি আবশ্যক এবং যথেষ্ট নহে। যখন যে কোন কারণেই হউক সমাজের অবস্থা এরূপ হইবে যে, বিবাহের দায়িত্ব পিতা মাতার উপর কিছুই থাকিবে না, তখন অবশ্য পাত্রের নিজের জানা শোনা আবশ্যক হইবে। বিলাতী সমাজে পাত্র পাত্রীর মধ্যে প্রথমে আলাপ পরিচয় হইয়া বিবাহ হওয়ার রেওয়াজ থাকায় আমাদের ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, বিনা পূর্ব্ব পরিচয়ে বিবাহ হইলে তাহা বিবাহের দায়িত্ববোধানুযায়ী কার্য্য হয় না; কিন্তু আমাদের সমাজে ও বিলাতী সমাজে যে দায়িত্ব বিভাগের ভিন্নতা আছে তাহা তাঁহারা স্মরণ রাখেন না। আমার বিবেচনায় সমাজের যেরূপ অবস্থা প্রথম প্রথম পিতামাতার উপর দায়িত্বার্পণের অনুকূল, তাহাই বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহা সুখ স্বচ্ছন্দতা ও আর্থিক প্রাচুর্য্যের সূচক। সংসার যুদ্ধের তীব্রতা ও অতিশয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতুই পিতামাতা সন্তানের বিবাহ জন্য দায়িত্ব লইতে অনিচ্ছুক হয়। আর বিজ্ঞ গুরুজনে পাত্র পাত্রীর যোগ্যতা সম্বন্ধে যেরূপ বিচার করিতে সক্ষম হয়, অপরিপক্কবুদ্ধি সংসারানভিজ্ঞ রূপমাত্রমুগ্ধ যুবক যুবতী সেরূপ করিতে কি সক্ষম হয়?

কখনই না। আর এক কথা তুমি আমাদের বিবাহ কালীন ক্রিয়া কলাপকে নিরর্থক বলিয়াছ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিবাহ কালীন শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কলাপ অতি গুর্ব্বর্থ বিশিষ্ট, তবে শৈশবে বিবাহ দিলে, কিম্বা মূর্খের দ্বারা সে সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলে, সে অর্থ আর কে বুঝিবে বল? আর শাস্ত্রীয় ক্রিয়া ছাড়া যে সকল মেয়েলী বিধি বিধান আছে, সে গুলিকে যদি শুষ্ক যুক্তির দ্বারা বুঝিতে চাও, ত কোন অর্থ পাইবে না বটে, কিন্তু সে গুলিও বিবাহের অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। একটি গোটা শব্দের একটি অর্থ থাকে, কিন্তু সেই শব্দের একটু একটু অংশের কি কোন অর্থ করা যায়? সকল ক্রিয়া কলাপই হৃদয়ের এক একটি ভাবের অভিব্যক্তি। সেইভাব যত গভীর, যত বিস্তারশীল, যত আনন্দময় হইবে, তাহার প্রকাশক ক্রিয়া কলাপও সেইরূপ বিস্তৃত হইবে। আমাদের বিবাহে যে পরিবারের এবং প্রতিবেশীবর্গের সকল স্তর ব্যাপিয়া একটি আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিয়া থাকে, বিবাহের সমগ্র ক্রিয়া কলাপ গুলির অর্থ সেই আনন্দচ্ছ্বাস কিন্তু তাহাদের একটু একটু অংশ লইয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে অনেক সময় কিছুই বোঝা যায় না। বিবাহ বাস্তবিকই মানব জীবনের একটি প্রধান মহোৎসব। এ মহোৎসবে আনন্দ করিবে না। যে সকল মেয়েলি ক্রিয়া কলাপের কথা বলিতেছি, সেগুলি কেবল সে আনন্দ যাহাতে শীঘ্র ফুরাইয়া না যায়, পণ্ডিত, মূর্খ, পুরুষ রমণী, বালক বৃদ্ধ, নবীনা প্রবীণা, প্রভৃতি পাঁচ জনে মিলিয়া পাঁচ দিন ধরিয়া উপভোগ করিতে পারে, তাহারই সরল সুন্দর নির্দ্দোষ উপায়। তুমি জ্ঞানী, তুমি না হয় ইহার অনেকগুলি বাদ দিতে পার, কিন্তু তোমার বিবাহে যে বালিকার দল সাজিয়া গুজিয়া হুলু ধ্বনি দিতে দিতে জল সহিতে আসিবে, সে ক্রিয়াটি উঠাইয়া দিলে কি তাহাদের আনন্দের লাঘব হইবে না? এ সকল আমোদ আহ্লাদের ক্রিয়া বাদ দিয়া, যুবক যুবতীকে বিবাহের গুরু দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া,

বলিদানের ছাগের ন্যায় তাহাদিগকে বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত করিলে, কেবল সমাজের একটি সর্ব্বপ্রধান আনন্দের উৎস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র, আর লাভ কিছুই নাই।”

বিনয় কুমার অভিনিবেশ পূর্ব্বক সকল কথা শুনিলেন, ভাবিলেন, এবং অবশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট নিবেদন করিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে অনেক গভীর সামাজিক তত্ত্বের কথা নিহিত আছে। আমি অবশ্য এতদূর ভাবি নাই। আমার এখন বিবাহে অসন্মতির প্রধান কারণ এই যে, আমার মনটা যেন স্থির হয় নাই, যেন বিবাহের জন্য অপ্রস্তত। সেইজন্য আরও কিছুদিন পরে বিবাহ হইলেই ভাল হয়। এ বৎসর না হইয়া, আর বৎসর হইলেই ভাল হয় এবং বাবাকে সেইরূপই লিখিবেন।

যো। আর এ বৎসর বিবাহের সময় ও সুবিধা দেখিতেছি না। কাযেই বিবাহ ফের ফাল্গুন কিম্বা বৈশাখ মাসেই যাইবে। আজ আবার একটা নিমন্ত্রণ আছে, তুমি যাবে কি? আমার ত বোধ হয় যাওয়া হইবে না।

বি। কোথায়?

যো। নবীন বাবু মুন্‌সেফের প্রমোশন হইয়াছে, তাহারই খাওয়ান হইবে। ভগবৎ সহায় উকিলের বাগান বাড়ীতে। ধীরেন্দ্র আসিয়াছিল নিমন্ত্রণ করিতে। আমার যেরূপ শরীরের অবস্থা আমার যাইলে ত অত্যন্ত অসুখ করিবে।

বি। বলেন যদি আমিই যাইব। তবে আপনি না যাইলে ত কোন কথা হইবে না?

যো। তা কিছু হইবে না। নবীন বাবু আমার শারীরিক অবস্থা জানেন, কিছু মনে করিবেন না। আমি তাঁহাকে একখানা পৃথক চিঠি লিখিয়া দিব। নবীন আমার সঙ্গে পড়িত, লোকটি বেশ, তবে এখানে বড় কুসঙ্গে পড়েছে।

এই বলিয়া যোগেশচন্দ্র সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন প্রভাত কুমারী তখনও বাগান দেখিয়া বেড়াইতেছেন। বিনয় কুমার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ যে বাগানে বাগানেই দিনটা কাটালে, সন্ধ্যা হয়ে এল, আহারাদির ব্যবস্থাটা একবার দেখিবে না ?

প্র। আজ আবার ঘরে আহার কি, এত ধূমধামের নিমন্ত্রণ হয়েছে।

বি। সে খবর তুমি পাইলে কি করিয়া।

প্র। আমাদের বাড়ীতে বাড়ীতে টেলিগ্রাফের তার আছে। যে বাড়ীতে যা হবে পরদিন বেলা ১০টার মধ্যে আমার কাছে সে সব খবর পাইবে।

বি। কি খবর পাইয়াছ বল দেখি।

প্র। ডাক্তার বাবুদের ঝি ছেলে কোলে করে আজ আমাদের বাড়ী সকালে বেড়াতে এসেছিল। তারই কাছে শুনিলাম ডাক্তার বাবু কাল সমস্ত রাত্রি সদরআলা বাবুদের বাড়ী কাটিয়েছে। নবীন বাবুর আজ যে খাওয়ান হইবে তার জন্য ছুটো নাচওয়ালী আসিয়াছে। সে ছুটোকে নাকি কাল সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে ডাক্তার বাড়ী আসিলেই গিন্নির সহিত ধূম ঝগড়া। আহা ডাক্তার বাবুদের বউটি কিন্তু খুব ভাল। মদ খেয়ে খেয়ে ডাক্তারের একবার এমন ব্যারাম হয় যে, যায় যায় হয়। তাহার পর বউ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয় যে আর মদ খাবে না এবং সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহির হবে না। তা প্রতিজ্ঞা রাখিবে কি, যে কয়টা অধঃপেতে সঙ্গী যুটেচে। কাল কেমন প্রতিজ্ঞা রেখেচে দেখ না। বউটির বড় কষ্ট, অনেকগুলি ছেলে পিলে। ডাক্তার উপায় করে বটে কিন্তু কিছু ত রাখে নাই, যা আছে একটু বাইরের চটক, তারপর সব হো হা করিয়াই উড়াইয়া দেয়।

বি। তবে দাদা যে আমাকে নিমন্ত্রণ রাখিতে বলিলেন, দেখিতেছি বড় সোজাসুজী নিমন্ত্রণ নয়।

প্র। সোজাসুজী! দেখিবে এখন কত ব্যাপার, কত কাণ্ড কারখানা। আমি তোমার দাদাকে বলে ছিলেম "তিনি প্রবীণ মানুষ হয়ে গেলেন না, আর আই বুড়ো বেটা ছেলেকে পাঠাচ্চেন। তা তিনি হাসিলেন।"

বিনয় লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিলেন "এমন জানিলে আমি যাইতে স্বীকৃত হইতাম না।"

প্র। যাবে বৈকি। এই বয়সেই উদাসীন হইতে ইচ্ছা কর, বিবাহ করিতে মন যায় না; একটু নাচ গান দেখিলে অনেকটা মন ফিরিয়া যাবে। সেইজন্যই না ভাই যেতে বলেচেন।

বি। এমন মন রাখি না।

প্র। আচ্ছা ভাই দেখা যাবে শেষ পর্য্যন্ত কি সে গড়ায়।

এই বলিয়া প্রভাত কুমারী হাসিতে হাসিতে কন্যাটিকে কোলে লইয়া গৃহাভিমুখে গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

আমোদ।

সন্ধ্যাবেলায় ধীরেন্দ্র বাবুর সহিত বিনয়কুমার ভগবৎ সহায়ের বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ভগবৎ সহায়ও একজন স্থানীয় সৌভাগ্যশালী উকীল। তাঁহারই উদ্যোগে আজিকার অনেক ব্যবস্থা হইয়াছে। নাচ গানের খরচার ভার তিনিই লইয়াছেন।

বিনয় কুমার পহুঁছিবার পূর্ব্বেই অনেকগুলি ভদ্রলোক উদ্যান গৃহে পহুঁছিয়াছেন। উদ্যান গৃহটি একটি প্রশস্ত অট্টালিকা; মধ্যে একটি বৃহৎ হল, দুইপার্শ্বে দুইটি কামরা, সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা, এবং বারান্দার সম্মুখে নানাবিধ সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষবেষ্টিত একটি গোল বেদী। হলটি আজ শোভন সুকোমল কার্পেটাবৃত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে; তাহার ধারে ধারে কয়েকটি পাহাড়-প্রতিম তাকিয়া এবং দুই পার্শ্বে দুইটি অতি বৃহৎ আলবোলা; আলবোলার নল এত দীর্ঘ যে এক পার্শ্বে অবস্থিত হইয়াও সেই সুবৃহৎ গৃহের সকলেরই মুখচুম্বন করিতে সমর্থ হয়। উপরে, মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ বেলোয়ারী ঝাড় লম্বমান দেওয়ালে যোড়া যোড়া দেওয়াল গিরি; দেওয়াল গিরির মাঝে মাঝে অনেকগুলি চিত্র; চিত্রগুলির সন্নিবেশে বড় বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না; পুরাতন ধরণের কাশীর বর্ণ-শোভা-বহুল শিবদুর্গা মূর্ত্তির পার্শ্বেই আজ কালিকার কলিকাতার সৌখিন চিত্রকরের হস্তের অর্দ্ধ-বিবসনা, লোলনয়না ললনা মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। হলের মধ্যস্থলে দুইটি বৃহৎ

সামাদান এবং তাহার একদিকে শোভন আতর দান, গোলাব পাশ ও একটি রূপার থালায় এক রাশি সোণালী মণ্ডিত পানের খিলি। বারান্দা-সন্মুখস্থ বেদীর উপর অনেকগুলি চেয়ার টেবিল সোফা প্রভৃতি বিলাতী আসন সজ্জিত। উপস্থিত ভদ্রলোকেরা সেইখানেই বসিয়াছেন, চুরুট ফুকিতেছেন এবং স্থানীয় ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা বা প্রশংসাবাদ করিতে-ছেন। বিনয় কুমার ও ধীরেন্দ্র বাবু সেইখানেই আসিয়া বসিলেন। ধীরেন্দ্র আসিয়াই কিন্তু বেনিয়ান গায়ে, চুরুট মুখে, চঞ্চল ভাবে ইত-স্ততঃ—বিহারী ও ভৃত্যবর্গের উপর সদম্ভ আদেশকারী ম্যানেজার বা তত্বাবধারক বাবুর সহিত মিশিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ তাহার সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া কানে কানে কি পরামর্শ করিয়া একবার গ্রীন রুমে ঝট্ করিয়া প্রবেশ করিলেন।

সকলেই উৎসুক চিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুই খানি গাড়ী আসিয়া পহুঁছিল। একখানি হইতে বাহির হইলেন হৃদয় বাবু, নবীন বাবু ও ডাক্তার বাবু। হৃদয় বাবু ও নবীন বাবুর দেশী পরিচ্ছদ, ডাক্তার বাবুর কিন্তু কোট প্যাণ্টালুন, তিনি ডাক্তার মানুষ, নেটিভ পোষাকে একে-বারেই বাহির হন না; সকলেরই গলায় বেলফুলের মালা দোদুল্য মান। দ্বিতীয় গাড়ী হইতে দুই বারাঙ্গনা, অনুচর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদির সহিত অবতরণ করিল। তাহাদের মধ্যে একজনা কলিকাতাবাসিনী বাঙ্গালিনী, বহুলাভরনা কিন্তু স্বল্প বসনা; অপর জন বারাণসীবাসিনী, স্বল্পালঙ্কৃতা কিন্তু শোভন-পরিচ্ছদ পরিহিতা। তাহাদের আগমন মাত্রেই অভ্যাগত সভ্যমণ্ডলীর যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল, সকলেরই মনে আনন্দের তাড়িত প্রবাহ ছুটিল; যিনি সোফায় শয়িত ছিলেন, তিনি উঠিয়া বসিলেন; যিনি বসিয়া ছিলেন তিনি দাঁড়াইলেন; যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি তাহা-দের অনুগামী হইয়া হলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সুবিধামত স্থান গ্রহণ করিলেন। রমণীদ্বয় সামাদানের নিকটে উপবেশন করিল এবং

উজ্জ্বল আলোকে বসিয়া উভয়েই একবার ঈর্ষা-কষায়িত তীব্র দৃষ্টিতে পরস্পরের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গৃহ লোকপূর্ণ হইয়া গেল। শ্যাম বাবু এই সময়ে ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত এক রৌপ্যপাত্রে স্নিগ্ধ গোলাপ জল ঢালিয়া উভয়ের স্বেদ-খিন্ন ললাট দেশে পিচকারী দিয়া শীতল করিলেন এবং এক এক খিলি পান তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া গ্যালাণ্ট্রীর বাহাদুরি লইলেন।

ক্রমে গান বাজনা আরম্ভ হইল। বাঙ্গালী বাবুদের আদেশ মত বাঙ্গালিনীই প্রথম আসরে উঠিল। দুই একটা গানের পর একটু গোলমাল আরম্ভ হইল; কারণ বাঙ্গালিনী হাসি ও কটাক্ষে যে রূপ সুনিপুণা, সঙ্গীত বিদ্যায় সেরূপ সুশিক্ষিতা নহে। সুতরাং শ্রোতৃবর্গ বিশেষতঃ হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকগণ অধিকক্ষণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের কথামত কাশীবাসিনী বাইজি আসরে উঠিলেন। কোন কোন যুবক বাঙ্গালী বাবু ইহাতে কিছু অসন্তুষ্ট হইল। বাইজী ঠাকরুন উঠিয়া বহুমূল্য পেসওয়াজ খানি ময়ূরের পেখমের ন্যায় বিস্তৃত করিয়া একটু হাব ভাব দেখাইয়া ওস্তাদী ভাবে দুই একবার গলা ভাঁজিল। স্বরের তেজ ও মধুরতা সকলেরই আগ্রহ উদ্দীপিত করিল। তাহার পর গানের একটি পদ আরম্ভ হইল। কিন্তু সেই এক পদেতেই রাত্রি শেষ হইবার উপক্রম হইল! এক পদেতেই কত প্রকার রাগ রাগিণী বাহির হইতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত প্রকারের চাহনী, কতই মুখ ভঙ্গী, কত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা, হস্তের নাড়না, চলিতে লাগিল। ক্রমে ইহা বিরক্তি জনক হইয়া উঠিল। বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে প্রধান ও বুদ্ধিমান যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সেই কলিকাতাবাসিনী সুহাসিনীকে লইয়া গ্রীণরুমে প্রবেশ করাই সময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সদ্ব্যবহার বিবেচনা করিলেন। বিনয় কুমারের পার্শ্বে এক বাঙ্গালী যুবক ও হিন্দুস্থানী যুবকের মধ্যে একটু তর্কও বাধিয়া গেল। হিন্দুস্থানী যুবক প্রথমে গর্ব্বের সহিত

বলিলেন—"দেখ বাইজী কেমন গাহিতেছে, তোমাদের কলিকাতা-ওয়ালীত হারিয়া গেল; সেত কিছুই গাহিতে পারে না।" বাঙ্গালি যুবক বলিল—"আর রেখে দাও তোমার ভাল গাওয়া, সন্ধ্যা বেলা হইতে কি যে এক "সইয়ারে" ধরেচে, কাণ ঝালা পালা হইয়া গেল। আর কি যে কিল বিল করিয়া হাত নাড়িতেছে আর মুখভঙ্গী করিতেছে মাথামুণ্ড তার কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।" হিন্দুস্থানী যুবক বলিল—"তোমরাত বেয়ান বুঝনা, বেয়ান না থাকিলে কি গান ভাল লাগে, আঁখ মুখ না নড়িলে কি ভাব প্রকাশ পায়?" আজ কাল অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালিই অপর প্রদেশবাসিগণ বাঙ্গালীদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট এই রূপ যে একটু বৃথা গর্ব্ব রাখে, সেইরূপ গর্ব্বের সহিত বাঙ্গালী যুবকটি উত্তর করিল—"আঃ কি "বেয়ান" আর কি, যেমন ছাতুর দেশ তেমনি বেয়ান। অত কৃত্রিম হাত মুখ নাড়ায় কি ভাব প্রকাশ পায়, না ভাব দেশ ছাড়িয়া পালায়?" হিন্দুস্থানী যুবক এইরূপ উত্তরে কিছু রাগান্বিত হইয়া বলিল—"আচ্ছা বল দেখি সভ্যতা পশ্চিম হইতে পূরবে গিয়াছে না পূরব হইতে পশ্চিমে আসিয়াছে? বাঙ্গালা মুল্লুক ত জঙ্গল ছিল।"

যখন যুবকদ্বয়ের মধ্যে তিক্তভাব জন্মাইতে লাগিল, বিনয়কুমার সে স্থান হইতে উঠিয়া বাহিরের বেদীতে যাইয়া বসিলেন। ঘরটিও অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল। বেদী হইতে পার্শ্বস্থ যে কামরাটী বাবুদের গ্রীণরুম হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নজর চলিত। গ্রীণরুম এখন সর-গরম হইয়া উঠিয়াছে। হাসির হল্লায়, গল্পের ছটায়, রসিকতার চটকে বোতল খোলার ফট্ ফট্ শব্দে, কাঁটা চামচের টুং টাং আওয়াজে, আর প্রোজ্জ্বল ল্যাম্পের তীব্র আলোকে, ঘর জম্ জম্ করিতেছে। বিনয় কুমারের সেদিকে নজর পড়িল। দেখিলেন বাবুদের সম্মুখে, টেবিলের উপর বহুসংখ্যক বোতল গ্লাসের সঙ্গে বহুবিধ খাদ্য সামগ্রীও বিস্তৃত রহিয়াছে এবং বাবুদের মুখ ও বেশ চলিতেছে। মধ্যস্থলে সভাপতি

স্বরূপ বসিয়াছেন হৃদয় বাবু ; তাঁহার বাম পার্শ্বে সুহাসিনী ও তৎপরে শ্যাম বাবু এবং দক্ষিণ পার্শ্বে নবীন বাবু ও তৎপরে ধীরেন্দ্র বাবু। ডাক্তার বাবুর নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। তিনি সকল পাত হইতেই উঠাইয়া লইতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে রন্ধন গৃহে যাইয়া গরম গরম খাদ্যের আমদানী করিতেছেন। আরও কয়েকটী বাবু আছেন, কিন্তু সকলেই বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী কেহই আহারে যোগ দেয় নাই। হৃদয় বাবু ও সুহাসিনীর এক পাত্রেই ভোজন চলিতেছে। শ্যাম বাবুর পৃথক পাত্র, কিন্তু প্রসাদ ভিন্ন মুক্তি নাই ভাবিয়াই যেন তিনি রসিকতাচ্ছলে সুহাসিনীর পাত্র হইতে এটি সেটি, গুপ্তভাবে তুলিয়া লইতেছেন। একবার হৃদয় বাবু আদর করিয়া সুহাসিনীর পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন "হেঁরে সুহাসিনী আজ নবীন সদরআলা হলো, আমার ছোট ভাই স্বরূপ হইল, তা তুই আমার কাছেই বসিয়া রহিলি, তোর একটি ছোট বোন কলিকাতায় দেখেচি, সেটিকে সঙ্গে আনিতে পারিস নাই, নবীনের পাশে বসাইয়া দিতাম।" উচ্চ হাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। হাস্যধ্বনি নিরস্ত হইলে হৃদয় বাবুর চিবুক ধরিয়া কর্ত্তিত শ্বেতকৃষ্ণশ্মশ্রু কণ্টকময় চিবুক কোমল হস্তে ধরিয়া সুরা জড়িত জিহ্বায়, নাকি সুরে, সুহাসিনী বলিল—"তোমারও একটি ছোট বোন আছে না, সেটিকে আনিয়া বসাইয়া দাওনা।" আবার একবার উচ্চ হাস্যধ্বনিতে গৃহ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সে মধুর মুখের মধুর ব্যঙ্গোক্তিতে হৃদয় বাবুরও অর্দ্ধপক্ক কেশ গুম্ফ শোভিত বদনে হাস্য বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলের হাস্য থামিলে, শ্যাম বাবু বলিলেন—"সুহাসিনী বড় জবাব দিয়েছ, তোমাকে পুরস্কার দিতে হবে ; ডাক্তার, খান কয়েক গরম গরম কাটলেট আনিয়া দাও তো হে।" ডাক্তার বলিল—"কাট্‌লেট্ কি আর এখনও গরম আছে, সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।" "তুমি কোন কাজের নও" এই বলিয়া শ্যাম বাবু নিজেই গরম কাটলেটের উদ্দেশে রন্ধন শালার দিকে চলিলেন। সেখানে যাইয়া জানিলেন যে বারান্দায় পাত সাজান

হইয়াছে এবং সকল দ্রব্যাদি পাতে সাজান হইয়াছে। শ্যাম বাবু সেখানে গেলেন, এবং দেখিলেন যেখানে ব্রাহ্মণদের পাত সাজান হইয়াছে সেই খানে দুই পংক্তির মধ্যে তত্ত্বাবধারক রমানাথ বাবু জুতাপায়ে, দেখিয়া শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রমানাথ বাবুও একজন উকীল এবং জাতিতে কায়স্থ। তাঁহাকে ব্রাহ্মণদের পংক্তির মধ্যে জুতাপায়ে দেখিয়া শ্যাম বাবু একবারে চটিয়া লাল হইলেন, এবং আধা ইংরাজী ও আধা বাঙ্গালায় বলিয়া উঠিলেন—"ইউ ফুল রমানাথ, ড্যাম শূদ্র! ব্রাহ্মণদের পংক্তির মধ্যে তোমার আসিবার কি দরকার ছিল কেন ব্রাহ্মণ কি কেহ থাকে নাই? দেখ আমি এই কণ্ডিসনে নিমন্ত্রণ য়্যাক্‌সেপ্ট্‌ করেছি যে ব্রাহ্মণের পংক্তির নিকট কোন শূদ্র আসিতে পারিবে না। তুমি কেবল আমাকে ইন্‌সল্ট্‌ করিবার জন্যই এরূপ করিয়াছ।"

রমা। দেখ শ্যাম তুমি নেহাত বেহেড্‌ মাতালের মত ব্যবহার করিও না, ভদ্রলোকের মত কথা কহিতে শেখ।

"আমি মাতাল ইউ ড্যাম শূদ্র" এই বলিয়া শ্যাম বাবু লম্ফ দিয়া রমানাথের কণ্ঠ ধরিলেন। রমানাথ শ্যাম বাবুর মুখে একঘুসি মারিলেন। শ্যাম বাবু তাহার প্রতিশোধ লইয়া রমানাথের চেন ঘড়ী ছিনিয়া লইয়া দুরে নিক্ষেপ করিলেন; এখন উভয়ে বেশ জপ্‌টা জপ্‌টী আরম্ভ হইল। সুরার মহিমায় কাহারও পদে ভর থাকে নাই, তাঁহারা বারান্দায় সজ্জিত সমস্ত দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিয়া ধূলি কর্দ্দমাক্ত হইয়া বারান্দার নীচে ধরাস্ করিয়া পতিত হইলেন। ভৃত্যবর্গ প্রথমে বাবুদের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিল! কিন্তু এতদূর বাড়া বাড়ি দেখিয়া অবশেষে কোলাহল করিয়া উঠিল। চারি দিক হইতে লোক জমিয়া গেল। বাইজির গান বন্ধ হইল। হলের লোক সব বাহিরে আসিল। গ্রীণরুমের বাবুদেরও চট্‌কা ভাঙ্গিল; তাঁহারা সুহাসিনীর সহিত বাহিরে আসিলেন। শ্যাম বাবু ও রমানাথ বাবু তখন কর্দ্দমাক্ত কলেবরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উন্মত্ত

ষণ্ডের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করিতেছেন। সুহাসিনী তাঁহাদের সে মূর্ত্তি দেখিয়া ত হাসি রাখিতে পারে না, মুখে রুমাল দিয়া অবিরাম খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। হৃদয় বাবু জড়িত [illegible] অথচ গম্ভীর ভাবে বলিলেন "কিহে কি ছেলেমানুষী করিতেছ।" শ্যাম বাবু বলিলেন ফুল রমানাথ আমার চেন ঘড়ি চুরি করেচে। রমানাথ বাবু বলিলেন "শ্যামা বড় বামনাই দেখাতে চায়, তাহাকে একটু আক্কেল দিলাম!" ডাক্তার বাবু মধ্যস্থ হইয়া উভয়কে শীতল করিতে লাগিলেন। বাবু ভগবৎ সহায় যাহার উদ্যান বাটিতেই এই ব্যাপার, শ্যাম বাবুকে সম্বোধন করিয়া ধীর স্বরে বলিলেন—"শ্যাম বাবু বড় সরমকা কাম হুয়া।" শ্যাম বাবু বক্ষ স্ফীত করিয়া বলিলেন "তোমরা ছাতুর দেশের লোক, Sense of honour কাকে বলে জান না ত; Duel কি সরমের কায বাবা, যেখানে বীরত্ব, যেখানে Self respect সেই খানেই Duel।" সুহাসিনী হাসিয়া বলিল—"শ্যাম বাবু আমার জন্য পুরস্কার আনিতে আসিয়াছিলেন, আপনার বীরত্ব দেখিয়া আপনাকেই আমি পুরস্কার দিতেছি, এই ধরুন্। এই বলিয়া শ্যামবাবুর হস্তে একটী সুরাপূর্ণ গেলাস দিল। ললনার মুখে বীরত্বের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দে শ্যামবাবুর মনটা সরল হইয়া আসিল। তাহার উপর ডাক্তার বাবু চেষ্টা করায়, শীঘ্রই রমানাথ বাবু এবং শ্যামবাবু উভয়েই forget and forgive বলিয়া পুনরায় বন্ধু হইলেন। অতঃপর আহারাদি যে কিরূপ হইল তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। বিনয়কুমার নবীন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিচার।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে তামসিক চিত্র বর্ণিত হইল তাহা শনিবার রাত্রির ঘটনা। অদ্য রবিবার; বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে। গত রাত্রির অত্যাচারে ক্লান্ত বাবুরা আজ এখন আপন আপন বাড়ীতে নিদ্রায় মৃতবৎ অভিভূত। যোগেশচন্দ্র ও বিনয়কুমার কেবল তাঁহাদের বহির্বাটিতে বসিয়া কথাবার্ত্তা করিতেছেন। বিনয়কুমারের মন গত রাত্রির ঘটনায় পূর্ণ অধিকৃত হইবারই কথা, কারণ এ দৃশ্য তাঁহার পক্ষে নূতন। আর শুদ্ধ নূতন বলিয়া নহে, তিনি আপনার শিক্ষার গৌরব করিতেন এবং ভাবিতেন সে শিক্ষা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উচ্চ চরিত্রের লোক। নিজের ভ্রাতা যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টান্তে তাঁহার এ বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারই মত শিক্ষাপ্রাপ্ত শত শত লোক সংসারে প্রবেশ করিয়া কিরূপ জঘন্য জীবন যাপন করে তাহার কোন ধারণাই তাঁহার ছিল না। গত রাত্রির ঘটনায় সেই ধারণা জন্মাইল, এবং তাঁহার একটি প্রিয় পুরাতন বিশ্বাস বিচলিত হইল। তাঁহার শিক্ষা গৌরবের মূলে প্রবল কুঠারাঘাত পড়িল। বিশ্বাসে আঘাত লাগিলে যেরূপ মর্ম্ম-স্পৃক্ যাতনা হয়, সেইরূপ যাতনায় তিনি আজ সমস্ত দিন অতিশয় ম্রিয়-

মাণ আছেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কথাবার্ত্তায় সেই বিষয় লইয়াই আন্দোলন করিতেছেন। বিনয়কুমার বলিলেন—"সুশিক্ষিত পদস্থ লোকের মধ্যেও এরূপ ভ্রষ্ট চরিত্র হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই।"

যো। সুশিক্ষিত! শিক্ষা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। আছে কেবল আত্মাভিমান, আত্মসুখ, ঈর্ষা আর দ্বেষ। তা না হলে মনে কর এক একটি সহরে কতগুলি করিয়া শিক্ষিত ভদ্রলোক একত্রে প্রায় এক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাস করে; যদি ইহাদের মধ্যে একতা ও সদুদ্দেশ্য থাকে, তবে কত না কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু তার যো কি; কেবল তুমি বড় না আমি বড়, এই ঝগড়াতেই সব নষ্ট হয়; যে যাহা বোঝে তাহাই ঠিক।

এইরূপ দুই ভ্রাতায় কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে ধীরেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং বিনয়কুমারকে দেখিয়া বলিলেন,—"কি ভায়া বিনয়, কাল যে চুপি চুপি কখন চলিয়া আসিলে কিছু জানিতে পারিলাম না, খেলে কি না খেলে তা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না, কেন বল দেখি?"

বি। কেন আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? যে ব্যাপার আপনাদের দেখিলাম, আগে কিছু জানিতে পারিলে আমি আদৌ যাইতাম না।

ধী। কেন হে এত রাগ কেন; একটু আমোদ আহ্লাদ স্ফূর্ত্তি না করিলে কি ভায়া প্রাণ বাঁচে?

বি। আপনিও ত মশায় একজন শিক্ষিত লোক, আপনি কাল রাত্রির ব্যাপার কোন্ লজ্জায় অনুমোদন করেন আমি ত বুঝিতে পারি না।

ধী। ভায়া এই নূতন নূতন কালেজ ছাড়িয়াছ কিনা, এখনও সংসারের কিছুই জান না। ভায়া, কেতাবী ধর্ম্মনীতি সংসারে চলে না।

দেখ, জীবনটা নেহাত শুষ্কভাবে কাটাইলে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর মধ্যে মধ্যে একটু আমোদ আহ্লাদ চাই, মনটাকে একটু শিথিল করা চাই। তোমরা আর কিছু মান আর না মান, সাহেবী আদর্শ ত মানিবে? সাহেবেরা মধ্যে মধ্যে এই রকম আমোদ আহ্লাদ কত ভালবাসে জান? একটা "বল্" হইলে বড় বড় মহারথী পর্য্যন্ত মাতিয়া উঠে।

বি। সে যাহা হোক, আপনাদের বেশ্যা লইয়া ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এত মাখামাখী; মদের এত হুড়োহুড়ী, নিতান্তই নিন্দনীয়।

ধী। ওহে বুঝেচি, ভায়া বুঝি কুলবধূ লইয়া সাহেবদের মত "বল্" করিতে চাও?

এই বলিয়া ধীরেন্দ্র বাবু মুরব্বিয়ানা ধরণে হাসিতে হাসিতে বিনয়-কুমার বাবুর পৃষ্ঠে দুই একবার হাত বুলাইলেন। বিনয়কুমার এতটা পছন্দ করিলেন না; তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "যদি পবিত্র ভাব থাকে, সে আমোদ আপনাদের অপেক্ষা লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ।"

ধী। হাঃ হাঃ হাঃ পবিত্রভাব! ভায়া কি ব্রাহ্মভাবাপন্ন নাকি?

বিনয়কুমার মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। যোগেশ বাবু এতক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়াছিলেন। এইবার কথাবার্ত্তায় যোগ দিলেন, এবং বলিলেন "দেখ, যে প্রথায় আমোদপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতা, মত্ততা ও লজ্জাহীনতা মিশ্রিত, তাহা সভ্যতার চাকচিক্যে যতই কেন মন-মুগ্ধ-কর হউক না তাহাতে পবিত্রভাব থাকা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বাহ্য সৌন্দর্য্য ও গুণপণার গরিমা প্রকাশ করা স্ত্রী-চিত্তের একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। সে দুর্ব্বলতা চরিতার্থ করিবার সুবিধা দেওয়া, আমার বিবেচনায় কখনই প্রকৃষ্ট সামাজিক পদ্ধতির অনুমোদিত হইতে পারে না।

ধী। শুনিলে ভায়া বিনয়, এবার ত দাদার কথা, মানিতেই হইবে।

যো। তা বলিয়া আমি তোমাদের গত রাত্রের ব্যবহার অনুমোদন করি না।

ধী। দাদা তুমি দুদিকই বন্ধ করিবে, না সাহেবী "বল্"——না দেশী "নাচ"। সকল লোকে ত আর দাদা তোমার মত ফিলজফার হয়ে ঘরের মধ্যে চুপ্টি করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। পাদ্রী পুঙ্গবেরা আমাদের নাচের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, কিন্তু, "বলের" বিরুদ্ধে কখন উচ্চ বাচ্য করেন না। দাদা আমাদের দুইয়েরই বিরোধী।

যো। না, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। আমি পাদ্রীদের ন্যায় নাচ বিরোধী নহি। নাচ উঠিয়া যাইলে যদি বেশ্যাবৃত্তি উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে নাচ উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহাত নিশ্চয়ই উঠিবে না। বরং আমার বিশ্বাস সঙ্গীত-সমর্থা বারাঙ্গনাগণ শরীর-বিক্রয়—মাত্রা-বলম্বিনী নির্গুণাদের অপেক্ষা নিজেরাও অনেক সুখী এবং সমাজেরও অল্পাহিতকারিণী। তবে আমার বিবেচনায় বৃহৎ ব্যাপারেও বহু লোকের প্রীত্যর্থেই নাচ হওয়া উচিত। তোমাদের মত দুই চারি জন বন্ধু বান্ধবের প্রীতিভোজে বেশ্যা লইয়া এরূপ হুড়াহুড়ি নিতান্তই নিন্দনীয় ও অনিষ্টকর সাহেবদের বলের দৃষ্টান্ত দিয়া তোমাদের নাচের অনুমোদন করিতেছ; কিন্তু কৈ সাহেবদের একটি সদনুষ্ঠানের অনুকরণ কর দেখি। সাহেবরা যখন বহুজনে মিলিয়া একত্র আহারাদি করে, তখন প্রায়ই কোন না কোন আবশ্যকীয় সাধারণ বিষয়ের আলোচনা করে। ইহার অনুকরণ কর দেখি।

ধী। দাদার আমাদের St. Andrew's dinner মনে পড়িয়াছে। দাদার সব বড় দরের ধারণা, হাঃ হাঃ হাঃ।

যো। কেবল উপহাস করিতেই শিখিয়াছ বৈত নয়।

ধী। উপহাসের কথা হইলেই উপহাস করিতে হয়। আমরা গরীব মানুষ, গোলামের জাত, কুলির মতন খেটে খেটে সারা। কোথায় দু-দশ দিন অন্তর একটু আমোদ করিব, না এক অসম্ভব উপদেশ ঝাড়িলেন!

যো। আমোদ কর না ভাই, কথা হচ্চে আপনাকে বাঁচিয়ে কর, আমোদ যেন তোমাকে গ্রাস না করিয়া ফেলে।

ধী। দাদা, এ অধম বাঙ্গালি জাতির দ্বারা কি আর কিছু হবে? মিছে কেন তবে আর ভাবনা চিন্তা? যে কটা দিন বেঁচে থাকা, হো হা করে এক রকমে কাটিয়ে দিতে পারিলেই হইল।

যো। দেখ ঠিক এই প্রকার যুক্তির অনুসরণ করিয়া অনেক ভাল লোকেরও পতন হয়। জীবনযাত্রার কোন প্রকারে একবার উপায় হইলেই অনেকেরই আর কোন লক্ষ্য থাকে না, এবং আপনাদিগকে আর কোন লক্ষ্য সাধনের সমর্থও বিবেচনা করে না। "আমা হতে ত আর কিছু হবে না, তবে কেননা আমি একটু মজা করিয়া লই, এইরূপ কুহেলিকায় বিচার শক্তি আচ্ছন্ন হইয়াই অনেকের প্রথম পদস্খলন হয়। প্রলোভনে পড়িয়া তখন নিজের উচ্চবৃত্তি ও শক্তি থাকিলেও তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয়।"

ধী। যোগেশ দাদাকে ত আর বক্তৃতায় আঁটিবার যো নাই। আচ্ছা দাদা তুই একটা কিছু বড় কাজ কর, তবে না ঘাড় পাতিয়া বড় লোক বলিয়া মানিব, শুধু উপদেশ দিলে আর গম্ভীর হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে, কি বড় হওয়া যায়?

যোগেশ বাবু একটু লজ্জিত, একটু বিরক্তও হইয়া বলিলেন, "দেখ স্বপ্নেও ভাবিও না আমি বড় লোক বলিয়া কোন অভিমান রাখি। আমি কেবল বলিতে চাই যে, মহৎ কার্য্য সাধনে শক্তি বা সুবিধা না

থাকিলেও, মহৎ উদ্দেশ্য, উচ্চ মত, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ে পোষণ করা উচিত। যে সমাজে অধিক লোকেই এরূপ করে, সেখানকার বায়ু বিশুদ্ধ ও তেজস্কর। যে বীজ হইতে বড় লোক উৎপন্ন হয়, তাহা সে সমাজে সহজে অঙ্কুরিত হইয়া শীঘ্রই শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট সুবৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। যে সমাজের অবস্থা ইহার বিপরীত, সেখানকার বায়ু দূষিত, সুবীজও সত্বর সেখানে বিনষ্ট হইয়া যায়।"

ধী। যাহা হউক দাদা, তোমার ও উচ্চ ভাবের একটানা, সপ্তমে চড়ান মর‍্যালিটি আমাদের এ দুর্ব্বল সমাজে খাটে না। উহাতে যে প্রাণ হাঁপিয়া উঠিবে, আয়ুক্ষয় হইয়া যাইবে। আমাদের একটু শিথিলতা চাই।

যো। যেমন বোঝ ভাই। তবে এই বলি ফলাফলের দিকে একটু দৃষ্টি রাখিও।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে একটি লোক সেখানে শশব্যস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে মুক্তারাম, কি খবর এমন ব্যস্ত হইয়া?"

মু। আজ্ঞে বড় বিপদ, ডাক্তার বাবুর ভারি ব্যারাম।

যো। হঠাৎ ভারি ব্যারাম!

মু। আজ্ঞে তিনি এই ৪টার সময় নিদ্রা হইতে উঠিয়া স্নান করিয়া আহার করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। আর কথা কহিতে পারিতেছেন না, বাক্ রোধ হইয়া গিয়াছে

যো। তবে কি মূর্চ্ছা গিয়াছেন?

মু। আজ্ঞে তা ত বোধ হয় না। জ্ঞান আছে বোধ হয়, চাহিয়া আছেন, আর একটা অঙ্গ যেন অবশ বোধ হইতেছে।

যো। সর্ব্বনাশ!

মু। আপনি একবার শীঘ্র চলুন।

যো। হাঁ যাব বৈকি, এস হে বিনয়, দুই জনেই যাই। ধীরেন্দ্র তুমিও এস হে।

ধী। হাঁ চলুন আপনারা, আমি আসিতেছি একটু পরে। হয় ত কিছুই নয়। বোকা চাকরটা কি বলিতে কি বলিতেছে।
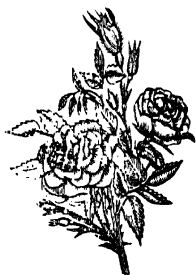
একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিণাম।

গত রাত্রির শেষভাগে ডাক্তার বাবু অচেতন অবস্থায় ভগবৎ সহায়ের উদ্যানবাড়ী হইতে স্ববাড়ীতে আনীত হন। স্ত্রীর সহিত রাগারাগী করিয়া তিনি প্রাতঃকালে বাহির হইয়া যান, আর রাত্রি শেষে এই অবস্থায় বাড়ীতে আসেন। আসিয়া অবধি জড়ের ন্যায় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। কতবার তাঁহার স্ত্রী সময়ে স্নানাহার করাইবার জন্য উঠাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হন নাই। দিবা শেষভাগে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন উঠিয়া শীতল জলে স্নান করিলেন। বিবাদ করিয়া তিনি কাল হইতে বাড়ীতে আহার করেন নাই, এই দুঃখ ও অনুতাপে তাঁহার পত্নী আজ স্বহস্তে অতি যত্নে আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া সাজাইয়া আনিতেছেন, ডাক্তার বাবু আসনে বসিবেন, এমন সময়ে হঠাৎ 'একি হলো, আমাকে ধর ধর" বলিয়া— ভূমিতে পতিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী বজ্রাহতার ন্যায় হাতের থাল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া "কি সর্ব্বনাশ হলো" বলিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া স্বামীকে ধরিলেন এবং তাঁহার মস্তক আপন অঙ্কে গ্রহণ করিলেন। স্বামীর কাতর চক্ষু দেখিয়া এবং জড়িত অস্পষ্ট স্বর শুনিয়া অসহ্য দুঃখে তিনিও শীঘ্র অচেতন হইয়া পড়িলেন। শিশুগণ ক্রন্দন করিতে করিতে চারিদিকে দাঁড়াইল; ভৃত্যগণও জমা হইল। কিয়ৎক্ষণ সকলেই কিংকর্ত্তব্য-

বিমূঢ় হইয়া রহিল। পরে একজন ভৃত্য ডাক্তার বাবুর মস্তক কোলে গ্রহণ করিল এবং এক দাসী বধূর মূর্চ্ছাপনোদন করিতে লাগিল। অপর একজন ভৃত্য কি করিতে হইবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া যোগেশ বাবুকে সংবাদ দিতে দৌড়াইল। অল্পক্ষণপরেই বধূর চেতনা হইল। তিনি পুনরায় নিজ অঙ্কে স্বামীর মস্তক গ্রহণ করিলেন, এবং কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কি কষ্ট হইতেছে? তিনি উত্তর দিতে পারিলেন না। কথা কহিবার চেষ্টায় কেবল একটী অস্ফুট শব্দ মাত্র করিলেন, এবং স্ত্রীর সেই মর্ম্মদ্রোহী কাতরতা ব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অনুতাপতপ্ত অশ্রুধারা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। কথা কহিতে না পারায় মনের সমস্ত আবেগই যেন অশ্রুধারায় পরিণত হইতে লাগিল। আহা প্রেমময়ী পত্নীর পক্ষে এদৃশ্য কি অবর্ণনীয় ক্লেশদায়ক, তাঁহার হৃদয় কি ঘোর দুঃখাবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইতেছিল! স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি ভাবিতেছেন,—"হৃদয়নিধি অভাগিনীকে নিতান্তই কি পাথারে ভাসাবে? যে আশঙ্কা মনে সর্ব্বদা জাগিত, তাহাই কি ঘটিবে? আহা কত চেষ্টা করিলাম, নাথ, কিছুতেই সুপথ ধরিলেন না; সে কেবল হতভাগিনীর অদৃষ্টের দোষ। হায় আমি কি পাপ করিয়াছি,মা ভগবতী কি আমাকে এ সঙ্কটে রক্ষা করিবেন না?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে কত কথাই উঠিতে লাগিল। কি কুক্ষণেই সে দিন স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন; বিবাদ না করিলে হয়ত স্বামী দুই দিন ধরিয়া বাহিরে থাকিতেন না; বাহিরে না থাকিলে হয়ত এরূপ ঘটিত না; কি চণ্ডাল ক্রোধই সেদিন তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল, চিরকালই কি ইহা ঘোষণা থাকিবে না কি! উঃ দুই দিন তিনি স্বামীকে আহার করিতে দেন নাই, আজ কত যত্নে আহারীয় প্রস্তুত করিলেন; এখন কাকে বিড়ালে তাহা ভক্ষণ করিতেছে; কি কষ্ট!

বুক ফাটিয়া যায় —আবার মনে পড়িল, স্বামী যখন রাগ করিয়া বাহির হইয়া যান, টিক্‌টিকি পশ্চাৎ হইতে 'কিরূপ নিষেধ সূচক টিক্ টিক্ শব্দ করিল; দাঁড়কাক কি ভীষণ অমঙ্গল সূচক কা কা ধ্বনিতে বাড়ীর উপর দিয়া উড়িয়া গেল। স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সেই আবেগে তিনি চঞ্চল হইয়া একবার মাথা তুলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইলেন। দেখিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, দ্বাদশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা বালিকা, বিপদের পূর্ণ মাত্রা অনুভব করিয়া পার্শ্বে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; তদ্‌কনিষ্ঠা সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা বিপদ সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে না পারিলেও পিতাকে কাতর এবং মাতা ও ভগ্নীকে ক্রন্দন-শীলা দেখিয়া অতি বিষণ্ণভাবে নিকটে বসিয়া আছে, এবং এক একবার কাঁদিতেছে; তদ্‌কনিষ্ঠ পঞ্চম বর্ষীয় বালক একবার বিষণ্ণ মুখে পিতার পার্শ্বে ও মাতার নিকট দাঁড়াইতেছে ও আবার কাক তাড়াইতে, বিড়াল মারিতে ছুটিতেছে। তদ্‌কনিষ্ঠ একটি অবিকল পিত্রানুকৃতি শিশু কিছুই না বুঝিয়া এক একবার পীড়িত পিতার উপর আসিয়া দৌরাত্ম্য করিতেছে এবং কোন দাস দাসী কর্ত্তৃক স্থানান্তরে নীত হইতেছে। এবং আর একটি ষষ্ঠ মাস বর্ষীয় শিশু এক দাসীর কোলে অবিরাম ক্রন্দন করিতেছে। এই সন্তানবৃন্দের মুখ দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদকম্প প্রবলতর হইল, ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময় দেখিলেন, জগৎ সংসার হঠাৎ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল, তাঁহার চেতনা-প্রদীপটি নিবিয়া গেল, আবার তিনি অজ্ঞানাভিভূতা হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

এই সময়ে যোগেশচন্দ্র ও বিনয়কুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেশচন্দ্র বধূকে মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া সত্বর দাসীদিগকে তাঁহার মুখে মাথায় জল দিয়া চেতনা করাইতে বলিলেন। অল্প চেষ্টাতেই তাঁহার চেতনা হইল। তখন তাঁহাকে বিপদে কাতর হইতে নিষেধ করিয়া বিনয়কুমারকে শীঘ্র প্রভাত কুমারীকে আনিবার জন্য পাঠাইলেন এবং

ডাক্তার বাবুকেও পীড়ার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল কপালে একবার করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তখন শীঘ্র পীড়া আরাম হইয়া যাইবে, ভয় নাই এইরূপ কথায় সাহস দিয়া তিনি ভৃত্যবর্গের সাহায্যে ডাক্তার বাবুকে শয্যায় তুলিলেন। প্রভাত কুমারী আসিয়া পঁহুছিলে বধূকে সাহস দিবার জন্য এবং বালক বালিকাদিগকে দেখিবার জন্য আদেশ করিয়া তিনি বিনয়কুমারকে সত্বর সরকারী ডাক্তারের নিকট যাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। সরকারী ডাক্তার, বাবু সত্যসাধক মিত্র, তখন সরকারী ডাক্তারখানায় ছিলেন। বিনয়কুমার তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইয়া শীঘ্র আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সত্য বাবু সকল শুনিয়া অবিচলিত ভাবে বলিলেন "আমি বোধ করি এখন যাইতে পারিতেছি না।"

বি। কত বিলম্ব হইবে?

স। আমার হাঁসপাতালের কাযেই সন্ধ্যা হইবে, তাহার পর আজ আবার আমাদের বিশেষ উপাসনা আছে, আমি বোধ করি আজ যাইতে পারিব না।

বিনয়কুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সেকি মহাশয়! একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক, আপনারই সমব্যবসায়ী, প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে, স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, একজন ডাক্তার দেখিলেও অনেক সাহস হয়, আর আপনি যাইতে পারিবেন না। আপনার ফী সম্বন্ধে কিছুই ত্রুটি হইবেনা। হাঁসপাতালের কায না হয় আসিয়াই করিবেন।"

সত্য বাবু একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কঠোর ভাবে বলিলেন "মহাশয় আমি ফী গ্রাহ্য করিনা, আর সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্তের ভেদও দেখিনা, দেখি কেবল "ডিউটি"। বাহিরের কাযের জন্য হাঁসপাতালের কায অসময়ে করিলে আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়।"

বি। এরূপ বিপদে যদি মামুলি কায একটু [illegible]তে হয়, দোষ কি!

স। কর্ত্তব্যের নিয়ম একই, এবং তাহা একটু কড়া হইয়া প্রতি-পালন করা চাই। সেইটি পারি না বলিয়াইত আমরা সাহেবদের অপেক্ষা হীন। আজ আমি সংবাদ পাইলাম, আবশ্যক হইলে, কাল প্রাতঃকালে আমি যাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারি। পূর্ব্বে সংবাদ না পাইলে আমি কোথাও যাই না।

বিনয়কুমার লোকটার নির্ম্মম অথচ ধর্ম্ম-বড়াই পূর্ণ কথা গুলো শুনিয়া তীব্র ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে চলিয়া আসিলেন এবং যোগেশ চন্দ্রকে সকল কথা বলিলেন। যোগেশ বাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সত্য বাবুর মনে একটু সহানুভূতির উদয় হইলনা, এমনেত খুব ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়, উদার মতের গৌরব করা হয়! দেখ এক বার, দলা দলিতে মানুষের হৃদয় কেমন সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়! তিনি একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম; একজন মদোমাতালে হিন্দুর ব্যারাম হইয়াছে কি না, তাই তাঁহার সহানুভূতির উদয় হইল না, ছিঃ! আচ্ছা বিনয় তুমি এইখানে থাক, আমি দেখি একবার সিভিলসার্জ্জনকে পাই কি না।" এই বলিয়া তিনি সত্বর ডাক্তার সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় জানিলেন যে তিনি ক্লব ঘরে খেলিতে গিয়াছেন।

এই ক্লবঘর জেলার প্রধান জমীদার বর্গের রাজভক্তির প্রকৃ[illegible] নিদর্শন স্বরূপ এক সুন্দর সুসজ্জিত প্রশস্ত ইন্দ্র-ভবন-তুল্য অট্টালি[illegible]; এক্ষণে রবিকরাণুকারী আলোক মালায় শোভিত এবং সুতান-বাদিত্র-নিচয়ের মধুরঝঙ্কার-পূরিত; কোন প্রকোষ্ঠে অপ্সরোপমা বিলাতী রমাগণ যুগলে যুগলে নৃত্য অভ্যাস করিতেছেন, কোন প্রকোষ্ঠে বা ইন্দ্রতুল্য পুরুষগণ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কোথাও খেলার জয় সূচক হাস্য ধ্বনি উঠিতেছে, কোথাও বা যুবক যুবতীর মৃদু সম্ভাষণ

চলিতেছে। বারান্দায় আপাদ মস্তক শ্বেত-বসন-শোভিত ভৃত্য বর্গ আপন আপন প্রভুর হুকুম-প্রতীক্ষায় কর্ণ খাড়া করিয়া আছে, পথপার্শ্বে সুন্দর-অশ্ব-যোজিত সুচিক্কণ গাড়ী সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। অট্টালিকার চারিদিকে বহুদূর যুড়িয়া গভীর নিস্তব্ধতা, কেবল যেন ইংরাজ-মাহাত্ম্য গম্‌গম্ করিতেছে। সেখানকার বায়ু যেন প্রতি নিঃশ্বাসে ইংরাজ মহিমা গাহিতেছে। তরু রাজি যেন নীরবে শঙ্কিত চিত্তে ইংরাজ প্রতাপ ধ্যান করিতেছে। এত প্রতাপ যার, এত সুখ তাহার ভিন্ন আর কাহার হইবে?

যোগেশ বাবু এই ক্লব ঘরে আসিয়া ডাক্তার সাহেবের চাপরাশির মারফত একখানি চিঠি পাঠাইলেন। চিঠি পাইয়া ডাক্তার সাহেব তৎপর বাহিরে আসিলেন, যোগেশচন্দ্রের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন, এবং তাঁহাকে নিজের গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া তখনই ডাক্তার বাবুকে দেখিতে আসিলেন। রোগী দেখিলেন, ব্যবস্থা করিলেন, এবং যাইবার কালীন বলিয়া গেলেন যে, পীড়া অতিশয় কঠিন, বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক এবং চারি পাঁচ দিনের মধ্যে যদি অবস্থা একটু ভাল হয়, তবে একটু আশা হইবে। যোগেশচন্দ্র ও বিনয়কুমার সে রাত্রি ডাক্তার বাবুর বাড়ীতেই রহিলেন। প্রভাতকুমারীও রহিলেন, এবং ডাক্তার বাবুর ছেলেদিগকে খাওয়াইলেন, মাখাইলেন, এবং তাঁহার স্ত্রীকে নানারূপ সাহস ও সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে ডাক্তার বাবুর পীড়ার সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল; তাঁহার ইয়ারবর্গ ও অন্যান্য লোক দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। এত লোক আসিতে আরম্ভ করিল, যে রোগী দেখান এক কষ্টকর এবং অনিষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিল। আবার না দেখাইলেও অনেকে অভিমান করে যে, তাহারা কি কিছু বুঝে না, না তাহারা ডাক্তার বাবুর হিতৈষী নহে? বৈঠকখানায় মজলিস্ হইতে লাগিল। পীড়ার কারণ কি, প্রকৃতি কি এবং পরিণাম

কি এ সমস্ত বিষয়ে নানা জনে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিতে লাগিল। ডাক্তার বাবুর দশা যাহাই হউক, সকলে কিন্তু আপন আপন মতের সত্যতা সাব্যস্ত করিতে বড় ব্যস্ত। কেহ কেহ নাকি বলিয়াছিলেন যে, অধিক সুরাপান এবং রাত্রি জাগরণে এই ব্যারাম হইয়াছে। তাহাতে হৃদয় বাবু বড় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন "হাঁঃ মদ খাইলে যদি পক্ষাঘাত হইত, ত এতদিন অনেক লোকেরই হইত, আর যাহারা মদ কেমন কখনও দেখে নাই এমন লোকের কখনও পক্ষাঘাত হইত না, এটা নিতান্ত মূর্খের মতন কথা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন দর্শন।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার বাবুর অবস্থা কখনও একটু ভাল কখন বা মন্দ। ক্রমে মন্দটাই ঘনীভূত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে তিনি অসহায়া পত্নীকে কাঁদাইয়া, অপ্রাপ্ত-বয়স বালক বালিকাগণকে নিরাশ্রয় করিয়া, ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনাটি বিনয়কুমারের চিত্তে বড় গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। ইহা তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষানুপ্রাণিত পবিত্র হৃদয়ের নির্ম্মল চন্দ্রালোক নির্ব্বাপিত করিয়া, অমাবস্যার অন্ধকার আনয়ন করিল; তাঁহার উৎসাহোজ্জ্বল মুখমণ্ডল মলিন হইল। ইস্‌লামাবাদে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতালাভ করিলেন, সংসারের যে নূতন চিত্র দেখিলেন, তাহা তিনি সর্ব্বদা তাঁহার পূর্ব্বের অভিজ্ঞতার সহিত, তাঁহার প্রিয় পুরাতন চিত্রের সহিত তুলনা করিতেন এবং অতিশয় দুঃখিত হইতেন।

এইভাবে তাঁহার কিছুদিন অতিবাহিত হইল একদিন রাত্রিতে তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। এক সুবিস্তীর্ণ শ্যামলশষ্পপরিপূর্ণ ক্ষেত্র; তাহার মধ্যস্থলে এক বিশাল জীবাস্থি-কঙ্কালময় শ্মশান ভূমি; তন্মধ্যে এক বৃহৎ প্রজ্জ্বলিত চিতা; চিতা পার্শ্বে এক দিব্যাভাময়ী, বিষাদক্ষীণা, রোদন-পরায়ণা রমণী দণ্ডায়মানা। চিতানল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, ঘন-তমসা-ময় শ্মশান ভূমির অন্ধকার দূর করিতেছে

এবং লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া পার্শ্বস্থা রমণীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। প্রেতভূমির পিশাচগণ মহা কোলাহলে অট্টহাস্য করিতে করিতে চিতার চারিদিকে ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করিতেছে, আনন্দে করতালি দিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে নূতন কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া চিতানল বর্দ্ধিত করিতেছে। তাহাদের কোলাহলে সেই অসহ্য-জ্বালা-সহ্য-কারিণী দিব্য-মাধুরীধারিণীর করুন রোদন শ্রুত হইতেছে না।

ক্ষেত্রের এক প্রান্তে, এই প্রেতভূমি হইতে কিছুদূরে, আর এক অভিনব দৃশ্য। কয়েকটি দেবমূর্ত্তি পুরুষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁহাদের উন্নত দেহ, বিশাল বক্ষ, প্রশান্ত বদন, প্রশস্ত ললাট সুন্দর কান্তি; তাঁহাদের ভ্রূযুগে প্রতিজ্ঞা, নয়নে প্রতিভা, অধরে প্রীতি, সমগ্র মুখমণ্ডলে শান্তি বিরাজমান; তাঁহাদের পরিধেয় কৌষিক, গলদেশে উত্তরীয়। জিতেন্দ্রিয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অনুষ্ঠেয়তৎপর ঋষির ন্যায় তাঁহারা একাগ্রচিত্তে যজ্ঞায়োজনে নিযুক্ত আছেন। এক একবার সেই চিতাপার্শ্বস্থা ললনার কাতর-কণ্ঠধ্বনি পিশাচদের আনন্দ-কোলাহল ভেদ করিয়া তাঁহাদের তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়শালী মনের গোচর হইতেছে। তখন তাঁহারা বিচলিত হইতেছন এবং উদ্‌গ্রীব হইয়া পিশাচদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; আপনাদের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ্য সংখ্যা ও পিশাচদের বহুলতা দেখিয়া চিন্তাযুক্ত হইতেছেন। চিতানলের প্রদীপ্ত শিখা দর্শন করিয়া ব্যথিত হইতেছেন। আবার ভাবিতেছেন মহাযজ্ঞে আপনাদিগকে পূর্ণাহুতি দিবেন, দেবপ্রসাদ লাভ করিবেন, এবং সেই বলে বলীয়ান হইয়া পিশাচপীড়িতা দেবললনা উদ্ধার করিবেন। এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত যজ্ঞদ্রব্য সংগ্রহে উৎসাহিত হইতেছেন।

বিনয়কুমার এইক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র একদল পিশাচ তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ

করতালী দেয়, কেহ অট্টহাস্য করে, কেহ তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানে, কেহ বা ক্রোধরঞ্জিত নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বিনয়-কুমার বড় ভীত হইলেন, দৈবসাহায্য-প্রার্থী হইয়া উপরের দিকে দৃষ্টি করিলেন; দেখিলেন—এক ধীর স্থির, দিব্য-প্রভামণ্ডিত যোগীমূর্ত্তি শূন্য-মার্গে দণ্ডায়মান; তাঁহার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে অন্তরীক্ষ বিভাসিত। বিনয় কুমার বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে, ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে, করযোড়ে সেই যোগী মূর্ত্তির দিকে চাহিলেন; যোগী মূর্ত্তি বাক্যস্ফূর্ত্তি না করিয়া, কেবল অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারা যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত পুরুষগণ যজ্ঞায়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, বিনয়কুমারকে সেই স্থান দেখাইয়া দিয়া অন্তর্ধান হইলেন। বিনয় কুমারের চক্ষু নিমীলিত হইল; তখন তিনি অন্তশ্চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন সেই পরমশোভন যোগী মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়রাজ্য আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন, আর যজ্ঞস্থানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন। অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে তাঁহার মন সিঞ্চিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই আনন্দের আবেগে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাত্রি তখন প্রভাতপ্রায়, পূর্ব্বাকাশ লোহিতচ্ছটায় উদ্ভাসিত, দিগ্দেশ বিহঙ্গ-কূজন-পূরিত, শীতল বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত। এখনও দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, চন্দ্রমা মলিন হইয়া আকাশ প্রান্তে শোভা পাইতেছে। বিনয়কুমার শয্যোপরি উপবেশন পূর্ব্বক বাতায়নপথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া স্বপ্নদৃষ্ট অদ্ভুত ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

এই স্বপ্ন দর্শনের পর বিনয়কুমারের মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই যে সকল উন্নত আশা ও আকাঙ্খা তিনি আশৈশব হৃদয়ে যত্নে পোষণ করিয়া আসিতে ছিলেন, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের যেরূপ একটি সৌন্দর্য্যময়, গৌরবময়, মাহাত্ম্যময় চিত্র কল্পনায় আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, স্বদেশের এবং স্বজাতির উন্নতিকল্পে যেরূপ সংকল্প আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন, সে সকলের সফলীকরণ, সংসারের নূতন আলোকে অতি দুরূহ, এমন কি এক একবার অসম্ভব স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। এজন্য তিনি বিষণ্ণ এবং উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া ত ছিলেনই, তাহার উপর এই স্বপ্নদর্শন, এক প্রকার নূতন চাঞ্চল্য তাঁহার মনে আনয়ন করিল। সহরের কোলাহল তাঁহাকে আর ভাল লাগিল না; তিনি নির্জ্জনে আপনার চিন্তা লইয়াই কিছুদিন কাটাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে একদিন যোগেশচন্দ্রের এক ভদ্র মক্কেল বিনয়কুমারের নিকট ইস্‌লামাবাদের নাতি দূরস্থ রোটাসগড় নামক গিরিদুর্গের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও নির্জ্জনতা প্রভৃতির বর্ণনা করে। তাহা শুনিয়া বিনয়কুমারের রোটাসগড় দর্শনার্থ অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, এবং সেই ভদ্র লোকটীর সহিত পর দিনই রোটাস দর্শনার্থ যাত্রা করি-

লেন। রোটাস বিন্ধ্যগিরির একটি তীব্রোচ্চ, দুরারোহ সুবিস্তৃত উপত্যকা, শোণ নদ ইহার দুই দিক বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। অপর দুই দিক একটি গভীর পরিখাবেষ্টিত। ইহা এককালে হিন্দুরাজগণের একটি সুরক্ষিত পুরাতন গিরিদুর্গ ছিল; এমন কি স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে, রামায়ণোক্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের নামানুকরণে ইহার নাম রোহিতাশ্ব বা রোটাসগড় হইয়াছিল। পরে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক বাদসাহ সেরসাহা ইহা অধিকার করেন। এখনও রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান; তাহারই মধ্যে বারদ্বারী নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ ইংরেজ-রাজ রোটাস দর্শনেচ্ছুকগণের সুবিধার্থ মেরামত করিয়া ডাকবাঙ্গালা স্বরূপ রাখিয়া দিয়াছেন। বিনয়কুমার সেই গৃহেই কয়েক দিন অবস্থান করেন। রোটাসে গৌরবময় হিন্দু ও মুসলমান আমলের পুরাতন কীর্ত্তির চিহ্নাবশেষ কত যে আছে, কত অট্টালিকা, কত উদ্যান, কত মন্দির মসজিদ, রাজপথ দুর্গদ্বার প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু সজীব প্রকৃতি এই প্রাণহীন শুষ্ক চিহ্নগুলি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর রাখিয়া তাহার শোকস্মৃতির উদ্রেক করিতে আর দিবে না বলিয়াই যেন ঘন নিবিড় সরস শ্যামল জঙ্গলাবরণে তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। তথাচ রোটাসের সিংহদ্বার যথার্থই নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়া, সিংহের বিক্রমে ঘন নিবিড়-দুর্ভেদ্য জঙ্গল শিরে ধারণ পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান আছে, এবং মানব হস্তের কীর্ত্তি প্রকৃতির বিনাশিনী শক্তির সহিত কত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। এখানে দাঁড়াইলে রোটাসগড়ের জীবিত কালের চিত্র এখনও সুস্পষ্ট ভাবে স্মৃতিপটে উদিত হইতে থাকে, অস্ত্রধারী উগ্রমূর্ত্তি দ্বারবানকে যেন ইতঃস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে সন্দেহার্হ পথিকের উপর পরুষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়; অগণ্য পথিক নানাকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া দুর্গের ভিতর যাতায়াত করিতেছে

যেন চক্ষের উপর দেখিতে পাওয়া যায়, অসংখ্য অশ্বারোহী পদাতি দুর্গের মধ্যে উল্লাসে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হয়।

বিনয়কুমার এই সমস্ত দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এক অতি মনোরম গুহায়, সাহবাবল নামে এক মুসলমান ফকির ভগবানের আরাধনা করিতেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ সেই গুহাতেই সমাহিত হয়। এই স্থান সাহবাবলের "দরগা" বলিয়া কথিত। এখনও হিন্দু মুসলমান অনেকেই আপন আপন ইষ্ট লাভার্থ এই সাধুর পূজা দিতে আসিয়া থাকে। বিনয়কুমার একদিন অতি প্রত্যুষেই এইস্থান দর্শনার্থ গমন করিলেন। এই গুহা পর্ব্বতের এক অত্যুচ্চ তীব্র কিনারায় স্থিত এবং অতিশয় দুর্গম; এখন সেখানে যাইবার জন্য পর্ব্বতের গায়ে একটি আলিসাওয়ালা বারান্দা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ঠিক সম্মুখে, ছোটনাগপুরের গিরিমালার পদপ্রান্ত বাহিনী খরবেগশালিনী কোইলি নদী মহাপ্রতাপশালী শোণনদের বিশালবক্ষে আসিয়া আত্মসমর্পন করিয়াছে; পার্শ্বে, অতি সন্নিকটে, এক নির্ঝরিণী দ্রবীভূত রজত ধারার ন্যায় নির্ম্মল সলিলধারা অবিরাম উদ্গীরণ করিতেছে; সেই সলিলধারা প্রাণবিমোহন কুল্ কুল্ নাদে পর্ব্বত-প্রান্ত বহিয়া প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে পতিত হইতেছে এবং শত শত হস্ত নিম্নস্থ সরস বৃক্ষ-রাজিকে নিরন্তর সেই পূত বারিতে স্নান করাইয়া দিতেছে। নিম্নে বহুদূর প্রসারী বিমল-শুভ্র শোণ সৈকতের পার্শ্বে পার্শ্বে ঘন শ্যামল উদ্ভিদ রাজির রেখা একখানি সুবিস্তীর্ণ শ্বেত বসন খণ্ডের সবুজ কিনারার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এরূপ সুন্দর গম্ভীর নির্জ্জন শান্তিময় স্থান অতি বিরল।

বিনয়কুমার অন্ধকার গুহা মধ্যস্থ ফকিরের সমাধি দর্শন করিয়া ভক্তি বিনম্র হৃদয়ে গুহার বারান্দায় উপবেশন করিলেন। নির্ঝরবারি-শীকর-সিক্ত মৃদু পবন হিল্লোল তাঁহার মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তাগুলিকে উড়াইয়া দিয়া শান্তি আনয়ন করিল। তিনি ভক্তি-নিষিক্ত শান্তচিত্তে

সেই তীব্রোচ্চ স্থান হইতে গভীর নিম্নের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। নিম্নের সকলই অতি ক্ষুদ্র, অতি অস্পষ্ট, নিতান্ত অগণ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইভাবে থাকিতে থাকিতে ক্রমে তিনি পাহাড় পর্ব্বত, নদী বন, স্থান কাল সকলই ভুলিয়া গেলেন, কেবল দেখিতে লাগিলেন এক অন্তরীক্ষ-ভেদী উচ্চতা, এক পাতাল-ভেদী গভীর নিম্নতার দিকে ভ্রুকটী করিয়া চাহিয়া আছে, এক মহাশক্তি মহাতেজে মহা গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া, ক্ষুদ্রকে, দুর্ব্বলকে তাহাদের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা অনুভব করাইয়া দিতেছে। সেই শক্তি, সেই উচ্চতার অনুভবে বিনয়কুমার ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ব্যাকুল হইয়া সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন শোণ সৈকতের শুষ্ক বালু রাশি বহুদুর ব্যাপিয়া ধূ ধূ করিতেছে। প্রাণ আরও আতঙ্কিত, আরও নৈরাশ্যময় হইয়া উঠিল; তিনি উদাসমনে, শূন্যদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সেই বালু রাশির দিকে চাহিয়া রহিলেন। থাকিতে থাকিতে দেখিতে পাইলেন শুষ্ক বালুরাশির মধ্যদিয়া শীতল সলিল-স্রোত প্রবাহিত, নির্ঝরিণীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন কঠিন পাষাণ ফুটিয়া নির্ম্মল সলিল-ধারা বাহির হইতেছে এবং প্রবল বেগে নিম্নের দিকে ছুটিতেছে। তখন যেন তিনি বুঝিলেন উচ্চে নিম্নে সম্পর্ক আছে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে যোগ আছে, নিম্নের পিপাসা নিবারণে, অপূর্ণতার অভাব মোচনে, দুর্ব্বলকে শক্তি প্রদানে, উচ্চতার, পূর্ণতার শক্তিমত্তার অবিরাম চেষ্টা আছে। তখন তিনি বুঝিলেন ভ্রুকুটীর মধ্যেও ভালবাসা আছে, শুষ্কতার মধ্যেও সরসতা আছে, কঠোরেও কোমলতা আছে, নিরাশায় আশা আছে, ভয়েও আশ্বাস আছে। তখন তাঁহার হৃদয় মধ্যে পার্শ্বস্থা নির্ঝরিণীর ন্যায় কুল্ কুল নাদে, আনন্দ প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, মুখমণ্ডল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পূর্ণ হইল। তখন তিনি পবন হিল্লোলের শীতল

সুখস্পর্শ অনুভব করিলেন, দূরস্থ বিহঙ্গকূজন শুনিতে পাইলেন, ধরণীর শ্যাম অঙ্গ দেখিতে পাইলেন। যে ভীমা ভ্রুকুটীশালিনী শক্তির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি ভয় বিহ্বল হইয়াছিলেন সেই শক্তিকেই আবার প্রেমময়ী কোমলতাময়ী, আশাময়ী, বরাভয়প্রদায়িনী জননী মূর্ত্তিতে দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। সেই আনন্দাবেগে তিনি ফকির সাহ বাবলের সমাধির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিতে পাইলেন যেন সাধু ফকির সমাধি প্রস্তর ভেদ করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক মুদিত নয়নে ধ্যান-নিমগ্ন আছেন। ভক্ত্যুচ্ছ্বাসে বিনয়-কুমারের হৃদয় মন ভরিয়া গেল। তিনি সাধু ফকিরের ন্যায় মুদিত নয়নে ধ্যাননিমগ্ন হইলেন।

যখন ধ্যানান্তে বিনয়কুমার চক্ষু উন্মীলন করিলেন, তখন দিবা অবসান প্রায়; সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, পশ্চিম দিকে মেঘখণ্ড সকল লোহিতাভা ধারণ করিয়াছে এবং শোণ সলিলে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে দুলিতেছে। বনস্থলী স্থির মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কিন্তু পক্ষিগণের কাকলিধ্বনি বৃদ্ধি পাইতেছে। বিনয়কুমার সকলই এক শান্তিময় স্বর্গীয় জ্যোতিতে পূর্ণ দেখিলেন। যে মানসিক চাঞ্চল্য ও বিষণ্ণতায় তিনি কয়েকদিন অতিবাহিত করিতেছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হইল, তিনি আত্মস্থ হইলেন, এবং সংসারের সকল আপদ বিপদের মধ্যে, সকল প্রকার বাধা বিঘ্নের মধ্যে, কখন নিরুৎসাহ না হইয়া, ভগ্নোদ্যম না হইয়া, স্বর্গীয় শান্তি বক্ষে ধরিয়া, ধীর স্থির ভাবে আপন কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিলেন।
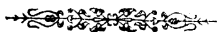
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নূতন সংবাদ।

বিনয়কুমার অতি বিলম্বে বাসায় ফিরিলেন দেখিয়া, তাঁহার ভৃত্য ও অন্যান্য রোটাস দর্শনেচ্ছুক সহচরগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এবং এরূপ হিংস্র জন্তু-ভয়াকুল স্থানে তাঁহার এত দীর্ঘকাল, একেলা নির্জ্জনে অতিবাহিত করা অতি অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে বলিয়া সকলেই মত প্রকাশ করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যাঘ্র ভল্লুকের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পও উঠিল। এরূপ গল্পের একটী সংক্রামক শক্তি আছে। সেখানে যতগুলি লোক ছিল তাহাদের কেহই বাদ যাইল না, সকলেই ব্যাঘ্র দেখার বা ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে অদ্ভুত নিষ্কৃতির এক একটী বিস্ময়কর গল্প করিল। সেই সকল গল্পের আবার অনেক শাখা প্রশাখাও বাহির হইল। অনেকে প্রলোভন সামলাইতে না পারিয়া শ্রুত গল্পও নিজ জীবনের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিল। বিনয়কুমার এ সকল গল্প শুনিলেন, হাসিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং অবশেষে আহারাদি করিবার জন্য সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

আহারান্তে বিনয়কুমার বিশ্রাম করিবার জন্য বারদ্বারীর ছাদের উপর গমন করিলেন। বারদ্বারী ত্রিতল গৃহ, ইহার ছাদ অত্যুচ্চ; এখান হইতে রোটাসের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিনয়-

কুমার ছাদের উপর ইতস্ততঃ পদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এখন কিন্তু তাঁহার মনে কোন গভীর চিন্তা বা ভাবের আলোড়ন নাই। প্রবল বাত্যা তাড়ানার পর বৃক্ষপত্র আবার যেমন মৃদুল হিল্লোলে দুলিতে থাকে, ভীষণ তরঙ্গ তুফানের পর আবার যেমন নদী বক্ষে ক্ষুদ্র বীচিমালা খেলিতে থাকে, সমস্ত দিনের গভীর চিন্তা ও ভাবোচ্ছ্বাসের পর বিনয়কুমারের মনে এখন সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা ও ভাব খেলা করিতেছে। আহারান্তে এক প্রকার যে প্রীতিপ্রদ অলসতা বোধ হয়, সে সময়ে মন স্বতঃই গভীর বা উত্তেজনকারী চিন্তা ত্যাগ করিয়া স্তিমিত-ভাবে অতীত জীবনের সামান্য সামান্য ঘটনা বা ভবিষ্যতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ কল্পনা লইয়া খেলা করিতে ভালবাসে। সেইরূপ মানসিক অবস্থায় বেড়াইতে বেড়াইতে বিনয়কুমার একবার ছাদের আলিসায় ভর দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। রোটাসের সেই সরস সতেজ ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষপত্র রাজির উপর শারদীয় শশধর বিমল জ্যোৎস্না-ধারা ঢালিয়া দিতেছে; ধরিত্রী যেন পূর্ণ যৌবনের লাবণ্য গরিমায় ঢল ঢল করিতেছে। এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশির অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিনয়কুমারের মনে কত স্মৃতির উদয় হইতে লাগিল। অতীত আসিয়া বর্ত্তমানে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। এইরূপ কৌমুদীধৌত রজনীতে তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত কত সময়ে কত রমণীয় স্থানে বেড়াইতে গিয়াছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে এই সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন এবং কিরূপ আমোদে কাল কাটাইয়াছেন, প্রভৃতি নানা কথা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। এইরূপ সুন্দর রজনীতে তাঁহার প্রিয়বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের সহিত কত বেড়াইয়াছেন, কত গল্প করিয়াছেন তাহা মনে পড়িল। শ্রীশচন্দ্রের সহিত শেষ দেখা, তাহাদের বাড়ীতে যাওয়া, শ্রীশ কৌতুক করিয়া তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া নিজ প্রিয়তমার সহিত কেমন আমোদ করিয়াছিল, সে সকল কথাও মনে

পড়িল। শ্রীশচন্দ্রের বাড়ী যাইবার কালীন পথে দুর্য্যোগ হওয়ায় রাম-নগর গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী এক রাত্রি যাপন, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ গৃহিণীর আতিথেয়তা, তাঁহার দশম বর্ষীয় বালক শরচ্চন্দ্রের সরলতা ও যৌবন সীমায় পদার্পণকারিণী বালিকা সুকুমারীর কমনীয়তা প্রভৃতি সকলই স্মরণ হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল যে সে বালিকাটি বিধবা এবং অল্পদিন হইল মাতৃহীনাও হইয়াছে। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অবনত মস্তকে অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, এবং তাহার পর আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উপরের দিকে ও চারিদিকে একবার তাকাইলেন। আকাশ হাসিতেছে, চন্দ্র নক্ষত্র হাসিতেছে, পৃথিবী হাসিতেছে, চারিদিকে অসীম সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে, বিনয়কুমার তাহা দেখিলেন। কিন্তু সেই অসীম সৌন্দর্য্য দর্শনে তিনি যেন এখন পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। কোথায় যেন কি অভাব আছে এইরূপ একটি অস্পষ্ট ভাব মনে উঠিতে লাগিল, মন যেন উদাস উদাস ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ মানসিক অবস্থায় তিনি ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারই একজন অনুচর আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। ব্যস্তভাবে টেলিগ্রামটি পাঠ করিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং ধীর স্বরে বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, এই আমি শ্রীশ ও রামনগরের বালিকার সম্বন্ধে ভাবিতেছিলাম, আর শ্রীশের নিকট হইতে সেই বালিকা সম্বন্ধেই টেলিগ্রাম আসিল। শ্রীশ জিজ্ঞাসা করিয়াছে সে বালিকা আমার নিকট আসিয়াছে কি না? কি আশ্চর্য্য! সে বালিকা আমার নিকট আসিবে কেন? ভিতরের ব্যাপারটা কি? যাহাই হউক কালই আমি বাড়ী রওয়ানা হইব।"

এইরূপ স্থির করিয়া বিনয়কুমার শয়নার্থ নীচে গেলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্ধি-স্থান।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনাথ অনাথা।

আষাঢ় মাসের একদিন বেলা শেষ হয় হয় হইয়াছে; অতি ভীষণ গ্রীষ্ম; রৌদ্র প্রখর নয়, কিন্তু গুমো গুমো গরমে লোক অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, ঘর্ম্মে শরীর আপ্লুত হইতেছে। একদিকে মেঘ গুর গুর করিয়া ডাকিতেছে, সকলেই আশা করিতেছে শীঘ্রই বৃষ্টি হইয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য এই অসহ্য কষ্ট নিবারণ হইবে।

এরূপ সময়ে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা বালা সুকুমারী তাহাদের এক গৃহের সমস্ত জানালা দরজা রুদ্ধ করিয়া তাঁহার মাতার রোগ-শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছে, এবং আস্তে আস্তে ব্যজন করিতেছে। বৃদ্ধা জীর্ণা শীর্ণা কঙ্কাল মাত্র সার হইয়াছেন; তাঁহার মুখ বিকৃত; চক্ষু গহ্বর-প্রবিষ্ট এবং মলিন; নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, সতেজ এবং সশব্দ; বাক্‌শক্তি প্রায় রহিত। এই অবস্থায় তন্দ্রাভিভূতা হইয়া বৃদ্ধা শয্যায় বিলীনা

রহিয়াছেন। সুকুমারী মায়ের সেই মলিন মুখখানির দিকে কাতর-নয়নে চাহিয়া আছেন; তাঁহার অতীব ক্লেশকর নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া দেখিয়া বালিকার বুক ফাটিয়া যাইতেছে; এক একবার মনে করিতেছেন, মার এ কষ্ট চক্ষে না দেখিয়া একটু তফাতে যাইয়া বসেন। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? না দেখিলেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মাতাকে অনেকক্ষণ স্থির-ভাবে থাকিতে দেখিলে এক একবার কাতরস্বরে মা মা করিয়া ডাকি-তেছেন, এবং প্রত্যুত্তরচ্ছলে বৃদ্ধা কেবল চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সুকুমারীর দিকে তাকাইতেছেন। আহা, সে দৃষ্টির এখনও অর্থ আছে; তখনও তাহা স্নেহাভাসপূর্ণ, তবে কিছু ভাবান্তরিত। স্বপ্নভঙ্গের পর সত্য ঘটনা দৃষ্টিতে যেরূপ ভাব হয়, বিস্মৃতিগর্ভে মগ্ন প্রায় বন্ধুর হঠাৎ দর্শনে যেরূপ ভাব হয়, অনেকটা সেইরূপ ভাবে, সেইরূপ বিস্ময়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে বৃদ্ধা সুকুমারীর দিকে তাকাইতেছেন। সুকুমারী একবার বলিলেন—"মা, দেখ তোমার শরৎ পাঠশাল হইতে আসিয়া তোমাকে ডাকিতেছে, তাহাকে খাবার দাও।" বৃদ্ধা প্রাণসম প্রিয়-পুত্র শরচ্চন্দ্রের দিকে এক-বার পূর্ব্ববৎ চকিতভাবে, বিস্ময়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষু-নিমীলন করিলেন। সহজ অবস্থায় আমাদের চিত্তে স্নেহ মমতাময় চেতনা যেরূপ প্রখর থাকে, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও যদি সেইরূপ থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যু মৃত্যুশয্যাশায়ীর পক্ষে কি ভয়ঙ্কর ক্লেশদায়ক হইত! কিন্তু তাহা বোধ হয় থাকে না। মুমূর্ষুর চিত্তবৃত্তি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি লয় পাইতে থাকে, তখন শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার ক্লেশেরই বিশেষ অনুভূতি হয় না। মায়া-বন্ধন-ছেদন আর তখন কষ্টকর হয় না। মৃত্যু সর্ব্ববিস্মরণকারিণী সুষুপ্তির ন্যায় ধীরে ধীরে দেহ মনকে অধিকার করে। সেই জন্যই আজ সুকুমারী মাতার বিস্মৃতি সাগরে মগ্নমানা চেতনা-তরিটি বারম্বার পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা ক্রমশঃ ডুবিয়াই যাইতে লাগিল। বিস্ময়চকিতের ন্যায় সে চেতনা-

প্রদীপ এক একবার উদ্দীপিত হইলেও তৎক্ষণাৎ পুনরায় নিবিয়া যাইতে লাগিল। আর তাহা প্রিয় পুত্র শরচ্চন্দ্রের ক্ষুধা তৃষ্ণা ভাবিয়া কাতর হইবে না, আর তাহা বাল-বিধবা সুকুমারীর দুঃখ স্মরণে ব্যথিত হইবে না। আর তাহাদের মাতা তাহাদিগকে স্নেহপূর্ণ বচনে ডাকিবে না। আহা! ভাই ভগিনী দুইটি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদের মর্ম্ম-দ্রোহী দুঃখ-ব্যঞ্জক মুখ দুইটি দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। বাস্তবিকই *যে মরে তাহার অপেক্ষা যে আত্মীয়গণ বাঁচিয়া থাকে, যাহারা মৃত্যু দর্শন করে,* তাহাদের কষ্ট সহস্রগুণ অধিক।

এই অবস্থায় দুইটি ভাই ভগিনী তাহাদের মুমূর্ষু মাতার পার্শ্বে বসিয়া আছে। এ বিপদে তাহাদের কি কেহ তত্ত্ব লইতেছে না? তাহা কখন সম্ভব নয়। সমাজে সহস্র দুর্বৃত্ত লোক থাকিলেও বিপদে সাহায্য করিবার লোক আছে বলিয়াই সমাজ টিকিয়া আছে। কিন্তু সে সাহা-য্যেই বা কি হয়। বিপদরাশি যখন হুঙ্কার করিয়া প্রবল সাগরোর্ম্মির ন্যায় আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসে, তখন মনুষ্য-সাহায্যে তাহার কতদূর প্রতিরোধ হয়? সুকুমারী আজ ভ্রাতা সহ বিপন্না। তাহার প্রতিবাসিনী তাহাদিগকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইয়া গিয়াছে। অন্যান্য কত প্রতিবাসিনী গ্রাম-বাসিনী আসিতেছে, বসিতেছে, যাইতেছে, তাহাদিগকে কত রকমে উৎসাহ দিতেছে, ভরসা দিতেছে, তাহাদের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া কত সান্ত্বনা-বাক্য কহিতেছে, কত নিজের দুঃখের কাহিনী কহিয়া তাহাদের মনকে প্রবোধ দিতেছে। গোপালচন্দ্র কত ডাক্তার কবিরাজের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন, ঔষধ আনিতেছেন, খাওয়া-ইতেছেন, রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। ডাক্তার কবিরাজ যথাসাধ্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর মানুষ কি করিবে? কিন্তু ইহাতেই বা কি হয়। করাল কাল আজ যে কঠোর হস্ত প্রসারণ করিয়া এই অবোধ বালক বালিকাদ্বয়ের সংসার-

মরুর একমাত্র পাদপ তাহাদের স্নেহময়ী জননীকে ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে তাহার প্রতিরোধ কে করিবে? মনুষ্য দৃষ্টির বহির্ভূত, মনুষ্য বুদ্ধির অনধিগম্য, যে বিপুল কারণরাশি কার্য্য করিতেছে, তাহার প্রতিবিধান কে করিবে?

সুকুমারী বলিলেন—"দাদা শরৎ একবার ভাই বাহির হইয়া দেখত গোপাল দাদা কবিরাজ লইয়া আসিতেছে কি না, মেঘ অন্ধকার করিয়া আসিতেছে, কি দুর্দ্দৈব। আর কামিনী পিসির যদি কায হইয়া থাকে তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" শরৎ বাহিরে গেল, এবং গোপাল, কি কবিরাজ কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া কামিনী পিসিকে ডাকিয়া আনিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি স্ত্রীলোক আসিয়া সুকুমারীদের গৃহের বারান্দায় বসিল। সকলেই সুকুমারীর মাতার অবস্থা দেখিয়া আশাহীন। কামিনী পিসির কিছু নাড়ী-জ্ঞানও ছিল। তিনি হাত দেখিয়া বলিলেন, "মা সুকো, তোমার মা পুণ্যবতী, তোমাদিগকে রাখিয়া যাইতেছেন, সেই তার পরম সুখ। তুমি বড় মেয়ে, পুত্রের স্বরূপ, তুমি এখন তোমার কাজ কর। গঙ্গা মৃত্তিকা দিয়া মায়ের কপালে, বুকে হরিনাম লিখিয়া দাও, লেখা পড়া শিখিয়াছ তাহা সার্থক কর। মায়ের কাণের কাছে ঠাকুরদের নাম কর। কবিরাজের আশায় আর থাকিও না।" সুকুমারী চোকা-ভোকা হইয়া গৃহস্থ সকলের মুখের দিকে তাকাইলেন। শরচ্চন্দ্র তাহার ভীত মুখের দিকে চাহিয়া "দিদি কি হবে গো" বলিয়া ফুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুকুমারী "দাদারে" বলিয়া শরচ্চন্দ্রকে কোলে টানিয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রমণীগণের সান্ত্বনায় উভয়েই শীঘ্র স্থির হইল। এই সময়ে গোপাল কবিরাজ সহ উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীর হাত টিপিয়া রহিল। সকলে উৎসুকভাবে চাহিয়া রহিল। সুকুমারীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, কবিরাজ ভাল বলে কি মন্দ বলে। অবশেষে কবিরাজ হাত ছাড়িয়া দিয়া, একটু মুখ বিকৃত করিয়া, চাদরের

খুঁট হইতে কিছু ঔষধ বাহির করিয়া বলিল "২টী বড়ী দিতেছি, একটী এখনই খাওয়াইয়া দাও; আর একটি ২ ঘণ্টা বাদ খাওয়াইবে। কিন্তু মা সুকো তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে বলিতেছি ঔষধে বিশেষ ফল হইবার আর কোন আশা দেখিতেছি না। তোমাদের পক্ষে এ কথা বড় কষ্টকর। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা। তোমার মা বৃদ্ধা এবং অতি সাধুচরিত্রা ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন। তাঁহার অন্তিম কালের কর্ত্তব্য যাহা করা উচিত কর। গোপাল তৎপর বৈতরণী পারের উদ্যোগ করিয়া দেও।" কামিনী পিসি বলিয়া উঠিলেন-"বেশ কথা, আমিও সেইরূপ উপদেশই দিতেছিলাম।" গোপালের তখন চমক হইল। সুকুমারীর মনেও যেন এক প্রকার দৃঢ়তা আসিল। সুকুমারী গোপালের দিকে নির্ভরতার ভাবে দৃষ্টি করিলেন। গোপাল বলিলেন— "দিদি সুকো তোমার কোন ভাবনা নাই, আমি তৎপর সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া গোপাল ও কবিরাজ বাহিরে আসিলেন এবং গোপালচন্দ্র গ্রামের অন্যান্য ভদ্রলোক ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকিয়া বৈতরণী পারের সমস্ত উদ্যোগ করিলেন। কবিরাজের বাড়ীর গুণেই হউক বা বৃদ্ধার পুণ্যবলেই হউক, বৈতরণী পারের সময় তাঁহার চেতনা অনেক বৃদ্ধি পাইল। সজ্ঞানে তাঁহার বৈতরণী পার সম্পন্ন হইল। তৎপরে বৃদ্ধা ধীরে ধীরে এক হস্তে গোপালের একটি হাত গ্রহণ করিলেন, অপর হস্তে নিজের বালক বালিকা দ্বয়ের দুইটি হস্ত ধরিয়া গোপালের হস্তের সহিত মিশাইয়া দিলেন, এবং কাতর নয়নে তাহাদের সকলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। গোপালের গণ্ড বহিয়া অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল, বালক বালিকা শোকে মুগ্ধপ্রায় হইল, উপস্থিত রমণীবৃন্দের সকলেই অশ্রু ধারা মুছিতে লাগিল, বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠের অস্ফুট শোকধ্বনিতে সে স্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল। গোপাল কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"আপনি আর কিছু ভাবিবেন

না, শরৎ সুকুমারী আমার ছোট ভাই ভগিনী। আমি থাকিতে তাহাদের কোন কষ্টই হবে না। আপনি নারায়ণ স্মরণ করুন।” বৃদ্ধা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট স্বরে কয়েকবার নারায়ণের নাম গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার পরেই নয়ন নিমীলন করিয়া, আবার পূর্ব্ববৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া অন্ধকার ঘোর হইয়া আসিল ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মূষলধারে বৃষ্টি নামিল। বালিকা সুকুমারী এবং গোপালচন্দ্র বিপদসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে দুই তিন ঘণ্টা কাটিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে থামিল; বাহ্য প্রকৃতি স্থির ভাব ধারণ করিল; আকাশ মেঘ নির্ম্মুক্ত হইল; ঝাঁকে ঝাঁকে নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। এই সময়ে, এই ঘোর নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে, এই পূর্ণ সহায়হীনতার সময়ে, সুকুমারীর কাতর কণ্ঠধ্বনি সহসা নীরব পল্লী প্রতিধ্বনিত করিয়া, নৈশ গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। কি মর্ম্মভেদি নৈরাশ্যব্যঞ্জক কণ্ঠধ্বনি! ইহা যে কিরূপ প্রাণ মন উদাসকারী, যিনি এই সময়ে এইরূপ শোকার্ত্তনাদ কখন শুনিয়াছেন তিনিই জানেন। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, সুষুপ্তির তমোময় আবরণ ভেদ করিয়া, সে ধ্বনি প্রতিবাসীগণের কর্ণে আঘাত করিল। যাহারা শুনিল, সকলেই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। অনেকের চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। দুই একজন প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া আর শয্যায় থাকিতে পারিল না, সুকুমারীদের বাড়ী আসিল। তখন গৃহপ্রাঙ্গনে, অনন্ত আকাশ তলে, তৃণ শয্যায় সুকুমারীর মাতা শয়ানা। সুকুমারীর মাতা? সুকুমারীর মাতা চলিয়া গিয়াছেন, যে অসীম স্নেহরাশি অনুক্ষণ সন্তানদ্বয়ের কল্যাণ চিন্তনে নিযুক্ত থাকিত, তাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহার ছায়া মাত্র অবশিষ্ট আছে। সুকুমারী ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া সেই প্রাণহীন মাতৃপ্রতিমার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্রন্দন

করিতেছেন। বলিতেছেন "মা আমাদিগকে [illegible] কোথায় গেলে গো।" নৈশ গগনে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে "কোথায় গেলে গো।"

কোথায় গেল? যেথা হইতে আসিয়াছিল সেথায় গিয়াছে? কোথা হইতে আসিয়াছিল কোথায় গিয়াছে? হে নিশীথ অন্ধকার! তুমি কি বলিতে পার কোথায় গিয়াছে, সুকুমারীর মাতার কায়াহীন আত্মা কি এখন তোমাতে মিশিয়া বিচরণ করিতেছে? [illegible] সঞ্চরণশীল সমীরণ! তোমার লঘু পক্ষে আরোহণ করিয়া কি সেই অবরোধ-মুক্ত স্বাধীন আত্মা স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতেছে? হে গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান তরুগণ! তোমরা কি বলিতে পার কোথায় গিয়াছে? হে অনন্ত দেবের অনন্ত চক্ষু-স্বরূপ জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্ররাজি! তোমরা কি বলিতে পার কোথায় গিয়াছে, সেই কায়াহীন মলিনতাহীন পুণ্যাত্মা কি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে? হে মেঘান্তরাল হইতে উদীয়মান চন্দ্রমা! তুমি কি বলিতে পার কোথায় গিয়াছে? তুমি কি সেই পবিত্রাত্মাকে আদর করিয়া আহ্বান করিবার জন্যই মেঘান্তরাল হইতে বাহির হইতেছ? আহা, সেই সদাচারিণী ধর্ম্ম-পরায়ণা, দয়াশীলা, কোমল প্রকৃতি পুণ্যবতীর, হে স্নিগ্ধজ্যোতি চন্দ্রমা! তুমিই যথার্থ বাসস্থান। সুকুমারী! তুমি আর ক্রন্দন করিও না। তোমার মাতা সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ দেখ, তিনি দিব্যধামে, দিব্য প্রভামণ্ডিত হইয়া ইষ্টদেবারবনায় নিযুক্ত আছেন। তুমি ভীত হইতেছ, তিনি তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন বলিয়া? ভয় কি? যে স্নেহরাশি জননী মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল কামনা করিতেন সেই স্নেহরাশি এখনও তোমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং চিরদিন থাকিবে। জননী হৃদয়ের যে স্নেহ তাহা কেবল জগজ্জননীর স্নেহের সাবয়ব প্রকাশ মাত্র। জগজ্জননীর স্নেহই মাতৃবক্ষে ক্ষীররূপে প্রকাশ পাইয়া সন্তান দেহ পরিপোষণ করে, জগজ্জননীর স্নেহই মাতৃহৃদয়ে উদিত হইয়া সর্ব্বদা সন্তানের

হিত কামনা করিতে থাকে। জগজ্জননীর স্নেহ কখন পরিত্যাগ করে না। মাকে হারাইলে বটে, সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ জগজ্জননীর স্নেহের কেন্দ্রীভূত প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তিটি হারাইলে বটে, কিন্তু সে স্নেহ তোমাকে ত্যাগ করিবে না। অপ্রত্যক্ষ ভাবে, নানা উপায়ে, নানা উপলক্ষে তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। ছোট মা হারাইলে বটে, কিন্তু বড় মা, যাঁর বলেই ছোট মার বল, তিনি রহিলেন ; তিনি যাইবার নন, তবে আর ভয় কি ! তিনি রক্ষা করিলে অকূল বিপদ সাগরে ভাসিলেও চিন্তা নাই, আর তিনি রক্ষা না করিলে স্বচ্ছন্দে মাতৃ অঙ্কে শয়ন করিয়া থাকিলেও নিস্তার নাই। সুকুমারী তুমি হৃদয়ে বল ধরিয়া এই ভ্রাতাটির মুখের দিকে তাকাও, আর ক্রন্দন করিও না।

শোকের প্রথমাবেগ সম্বৃত হইলে, কিরূপে অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া সাধিত হইবে, সে চিন্তার উদয় হইল। ইহা একটি সহজ ব্যাপার নহে। এই দুর্য্যোগ অন্ধকার রাত্রিতে কাহাকে ডাকে, কেবা আসে। হিন্দুদিগের এই একটি মহৎ দুঃসময়, একটি চির-বিখ্যাত বন্ধু-পরীক্ষার সময়। এ সময়ে যে সকলে সাহায্য করিতে শীঘ্র অগ্রসর হয় না, তাহা "শশ্মানে যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ" এই কথা হইতেই প্রমাণ হইতেছে। হিন্দুদের সহানুভূতির প্রবৃত্তি কি তবে এতই ক্ষীণ ? অনেকে দুঃখ করিয়া থাকেন খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতিরা এরূপ সময়ে অনেক অধিক সহানুভূতি দেখাইয়া থাকেন। হিন্দুদের পক্ষে ইহা বাস্তবিকই লজ্জা, ও দুঃখের বিষয়। তবে জাতি বিভাগ থাকা হিন্দুদের সাহায্যাভাবের একটি প্রধান কারণ ; এবং দাহ-প্রথা ও অন্যান্য জাতির প্রথার তুলনায় অনেক অধিক আয়াসকর কার্য্য। এরূপ অবস্থায় অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুদের অপেক্ষা অধিক সহানুভূতি প্রকাশ করিত কি না সন্দেহের স্থল। সে যাহা হউক গোপালচন্দ্রের উদ্যোগে শীঘ্রই লোকজন ও কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হইল। শবদেহ শ্মশানে নীত হইয়া চিতোপরি

স্থাপিত হইল। চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গোপালচন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য যাহারা দাহকার্য্যে নিযুক্ত ছিল সকলেই অবিকৃত অম্লান বদনে, মধ্যে মধ্যে অসময়োচিত সংলাপ করিতে করিতে সে কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। সুকুমারীর মনের ভাবের সহিত ইহাদের মনের ভাবের কি ঘোর পার্থক্য! শোক দগ্ধ ব্যক্তি প্রকৃতির অবিকৃত ভাব দেখিয়াই ব্যথিত হয়। কিন্তু দাহকালে মানবের অবিকৃত ভাব শত গুণে অধিক ব্যথা জনক। এই সকল লোক যেন বাস্তবিকই একখণ্ড কাষ্ঠ দগ্ধ করিতেছে। আর সুকুমারী কিছুক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে যে মাতার হস্তটি ধূলায় পতিত হওয়ায় অসহ্য কষ্ট বোধ করিয়া তাহা যত্নে শয্যায় তুলিয়া দিতে-ছিলেন, সেই মাতৃদেহকে জলন্ত চিতানলে সামান্য কাষ্ঠখণ্ডবৎ দাহ্য-মান দেখিতেছে! কি নিষ্ঠুর নির্ম্মম প্রথা! হিন্দু ধর্ম্মের কি কঠোর আদেশ! ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহাই কি জ্ঞানের অগ্নিতে হৃদয়কে, চিত্ত বৃত্তিকে, মায়া মমতাকে ভস্মীভূত করা? আত্মা চলিয়া গিয়াছে, দেহ পঞ্চভূত মাত্র, তাহাকে আর শোভন পরিচ্ছদে শোভিত করা, কোমল শয্যায় শয়িত রাখা, কেবল অজ্ঞানের কার্য্য, শিশুর ক্রীড়া, উন্মাদের খেলা। সেই জন্যই বুঝি জ্ঞানের কঠোর আদেশ, যাহা আত্মা, যাহা স্থায়ী তাহার সেই শ্মশানস্থলীতেই কল্যাণ কামনাকর, কিন্তু যাহা পঞ্চভূত মাত্র তাহাকে পঞ্চভূতে মিশাইয়া দেও, যাহা অস্থায়ী তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না, যাহা বস্তুতঃ কাষ্ঠখণ্ডবৎ তাহাকে কাষ্ঠখণ্ডবৎ দগ্ধ কর, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে, কাষ্ঠখণ্ড যে স্নেহ মমতা ভস্মীভূত হউক; এ দৃশ্য দর্শন করিলে দেহমায়ার হ্রাস হইবে, বৈরাগ্য অভ্যস্ত হইবে। জ্ঞানের এই উচ্চতত্ত্ব শিক্ষা করিতে যদি হৃদয়ে ব্যথা পাও, ক্ষতি কি? প্রিয়জন বিয়োগ হেতু ব্যথাত পাইয়াছই, তবে আর ধূলা লইয়া, এখন ছেলে খেলার আবশ্যক কি?

সেই শ্মশানভূমিতে সুকুমারীর মনে যে ঠিক এইরূপ চিন্তার উদয়

হইতেছিল তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃতি অনুসারে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে, চিতাভূমির এই মহৎ শিক্ষা ন্যূনাধিক সকলের হৃদয়েই অঙ্কিত হয়। যাহারা নিতান্ত অবিচলিত থাকে তাহারাও একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে। এবং সে দীর্ঘ নিশ্বাসের অর্থ এই যে "দেহটা কিছুই নয়।"

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সুকুমারীর মাতৃদেহ ভস্মীভূত হইল। সকলে গৃহে ফিরিল। যে মূর্ত্তিটী এতদিন শরৎ সুকুমারীর নয়ন-রঞ্জন প্রেম-প্রতিমা ছিল, তাহা চির-বিসর্জ্জন দিয়া সকলে ফিরিল। যে মূর্ত্তিটি এক-দিন একটী বাস্তব পদার্থ ছিল তাহা এখন কেবল আত্মীয় জনের কল্পনার বস্তু হইল। সে কল্পনার চিত্রও দিনে দিনে মলিন হইবে এবং কিছুকাল পরে ইহজগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে। শরৎ সুকুমারীর সকলই শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

অতঃপর শরৎ সুকুমারীর মাতৃশ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ হিন্দুর পক্ষে অপরিহার্য্য। কি সুন্দর স্বাভাবিক প্রথা! পিতৃ মাতৃশোকে উচ্ছ্বসিত চিত্ত সন্তানের হৃদয়াবেগ প্রকাশ ও নিবৃত্তির কি প্রকৃষ্ট, কি কল্যাণকর উপায়। হৃদয় দীনতায়, চির বিদায়প্রাপ্ত জনক জননীর স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতায় অবশ হইয়া শ্রাদ্ধের ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল ক্রিয়া কলাপ গুলিকেই কি গভীর অর্থে গ্রহণ করে। প্রাণে আত্ম বলিদানের কি প্রবল পিপাসা জাগিয়া উঠে। পাষণ্ড তাহারা,—যাহারা বিদেশীয় অনুকরণের স্রোতে পড়িয়া এ প্রথার উন্মূলন করিতে প্রয়াসী। আর তদপেক্ষা পাষণ্ড তাহারা, যাহারা এ ক্রিয়া তামসিক ভাবে সম্পন্ন করে বা করায়।

সদ্বংশ সম্ভূতা সুকুমারী যাহাতে মাতার শ্রাদ্ধটী ভালরূপে সম্পন্ন হয় সেজন্য বড় উৎসুক হইলেন। কিন্তু কিছু অর্থের আবশ্যক। গোপালকে ডাকিয়া সুকুমারী একদিন বলিলেন, "গোপাল দাদা, হাতেত আমাদের কিছুই নাই, যে কয়েক বিঘা জমি আছে, তাহার অর্দ্ধেকগুলি বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ কর। মায়ের শ্রাদ্ধে যদি ব্রাহ্মণ সজ্জন, গরীব

দুঃখীকে একদিন পরিতুষ্ট করিয়া খাওয়াইতে না পারি, তবে বৃথায় ছেলে হইয়াছিলাম। আহা মা আমার লোক জন খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন, তাঁর কার্য্যে কাহাকেও খাওয়াইতে পারিব না ?" সুকুমারীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, গদ্ গদ্ কণ্ঠে ফের বলিলেন, "গোপাল দাদা যেরূপে হউক, একার্য্য করিতেই হইবে।" গোপাল আশ্বাস দিয়া সে স্থান হইতে উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "জমিগুলি বিক্রয় করিলে অনাথারা খাবে কি ? না হয় কিছু জমি বন্ধক দিয়া কিছু কর্জ্জ করি, কোনরূপে ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া পরে কর্জ্জ পরিশোধ করিব। কিন্তু কর্জ্জই বা করি কার কাছে, গ্রামে যে রাহু আছে তাহার কবলে একবার পড়িলে ত কোন মতেই নিস্তার নাই।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গোপালের মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কোন কারণে মনে অতিশয় উদ্বেগ হইলে অনেক সময়ে তন্নিবৃত্তির এক অচিন্তিত পূর্ব্ব উপায়ও হঠাৎ মনে উদিত হইয়া থাকে। গোপালচন্দ্রের হঠাৎ বিনয়কুমারকে মনে পড়িল, সেই প্রসন্নবদন নিরহঙ্কার যুবক ধনবানের পুত্র হইয়াও গরিবের কুটীরে কিরূপ অমায়িক ভাবে প্রফুল্লচিত্তে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাইবার সময় বালক শরতের হাতে অযাচিত হইয়াও পাঠশালার বেতন ও পুস্তকের মূল্য বলিয়া ১০টি টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও মনে পড়িল। অনেক সময়ে কোন লোকের আকৃতি দেখিয়া, অথবা তাহার সামান্য কার্য্য দেখিয়া, আমাদের এরূপ অনুরোধ করিতে সাহস হয় যাহা অন্য লোকের নিকট করিলে নিতান্ত পাগলের কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। চিন্তার কিরূপ সূত্রে বিনয়কুমারকে গোপালের তখন স্মরণ হইল তাহা ঠিক বলা যায় না। হয়ত তিনি মনে মনে কোন দয়ালু লোকেরই অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ হইবামাত্র গোপালের মনে হইল যদি ইঁহার নিকট কিছু টাকা বিনা সুদে

হাওলাত প্রার্থনা করা যায়, তাহা হইলে তিনি স্বীকৃত হইতে পারেন। তাঁহার মন একবারে স্থির হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি বিনয়কুমারের গ্রামে চলিয়া গেলেন। বিনয়কুমার কিন্তু বাড়ীতে থাকেন নাই। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় গোপালচন্দ্র বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। তত্রাপি তিনি বিনয়কুমারের ঠিকানা অবগত হইয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে একখানি পত্র লিখিবেন, এবং অগত্যা গ্রামে আসিয়া গ্রামস্থ রাহুরূপী মহাজনের নিকটেই কর্জ্জ লওয়া স্থির করিলেন। দুই তিন দিন অতিবাহিত হইল, ১০০৲ এক শত টাকা কর্জ্জ লওয়া স্থির হইয়াছে, মহাজন আসর জমকাইতেছে, সুদের দর চড়াইতেছে, এবং বন্ধকী সম্পত্তির জন্য ভাল ভাল জমীর অনুসন্ধান লইতেছে। এমন সময় গোপালচন্দ্র একখানি রেজেষ্টারী করা পত্র পাইলেন ও উৎসুক চিত্তে তাহা খুলিলেন। খুলিবামাত্র তাহার মধ্যে একখানি ১০০৲ টাকার নোট পাইলেন। বিনয়কুমার এই নোট ইস্‌লামাবাদ হইতে পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, শরৎসুকুমারীর মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি এই অর্থ দান করিলেন। তবে তাহাদের যদি এই দান গ্রহণে কোন আপত্তি থাকে, তবে ইহা হাওলাত স্বরূপ গ্রহণ করিতে, এবং সুবিধামত পরিশোধ করিতে পারে। গোপাল হাতে স্বর্গ পাইলেন; সুকুমারীর মাতা বাস্তবিকই অতি পুণ্যবতী ছিলেন, এই কথা বারংবার মুখে বলিতে বলিতে সুকুমারীর নিকট আসিলেন। সুকুমারী এই সম্বাদে বড়ই বিস্মিত হইলেন, ভগবান্‌কে সহস্র ধন্যবাদ দিলেন, সেই রাত্রৈক মাত্র-পরিচিত যুবক বিনয়কুমারকে সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। যে রাত্রিতে বিনয়কুমার সুকুমারীদের বাড়ী আসিয়াছিলেন তাহার পর সুকুমারী বিনয়কুমারকে আর কখন ভাবিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু আজ তাঁহার এই মহৎ হৃদয়ের নিদর্শন পাইয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার সেই রাত্রিদৃষ্ট অস্পষ্ট মুখচ্ছবি কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া দেবদ্যুতি-

সম্পন্ন বোধ হইতে লাগিল। সুকুমারী গভীর কৃতজ্ঞতাভরে মনে মনে তাঁহার নিকট শত শত বার মস্তক অবনত করিলেন।

এই অর্থের সাহায্যে এবং গৃহে যাহা কিছু ধান চাউলের সঞ্চয় ছিল তাহাতে, শরৎ সুকুমারীর মাতৃশ্রাদ্ধ সুন্দররূপে ও সুশৃঙ্খলার সহিত সমাধা হইল। গ্রামের গরীব দুঃখীকে পর্য্যন্ত একদিন পরিপাটী করিয়া খাওয়ান হইল। এরূপ অবস্থায় এরূপ শৃঙ্খলার সহিত কখন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সকলেই ইহা সুকুমারীর মাতার পুণ্যবল বলিয়া স্বীকার করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হতভাগিনী।

রামনগর গ্রামের প্রান্তভাগে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। দীর্ঘিকার চারিদিকে নিবিড় আম্র কানন। এক দিকে একটি প্রশস্ত বাঁধান ঘাট। গ্রামের মধ্যে এই এক মাত্র পুষ্করিণী, যাহার সলিল পানীয়ার্থ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এই দীর্ঘিকার ঘাটে প্রত্যহ সকালে বিকালে গ্রামাঙ্গনাগণের বহুল সমাগম হয়।

ভাদ্র মাসের শেষ ভাগ, বেলা প্রায় ৩টা হইয়াছে। রামনগর গ্রামের যোগেন্দ্র বিশ্বাস এই দীর্ঘিকার প্রান্তে, ঘাট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, স্থিরভাবে বসিয়া ভাসমান তরঙ্গের উপর একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। যোগেন্দ্র বিশ্বাস লোকটি একহারা, মধ্যমাকৃতি, বর্ণ মাঝামাঝি, বয়স ত্রিশের ন্যূন, দেখিতে পল্লীগ্রামের রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপই, তবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা আছে। তাহার চক্ষু দুইটি বড় বড় ও চঞ্চল; ভ্রূযুগল বিশেষ সতর্কতাবঞ্জাক এবং নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র। তাহার আর একটি বিশেষ গুণ আছে; মুখমণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার ভাবের অভিব্যক্তি করিতে যোগেন্দ্র বড়ই দক্ষ। মানুষকে দেখিয়া বা তাহার সহিত কোন বিষয়ে কথাবার্ত্তা করিয়া আমরা সচরাচর তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির একটি ধারণা করিয়া থাকি, লোকটি উগ্র কি শীতল, সরল কি চতুর, কোমল কি নিষ্ঠুর এ সকল বিষয়ে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। এ সিদ্ধান্ত অনেক স্থলেই প্রায় ঠিক হয়। কিন্তু সকল স্থলেই যে এরূপ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা যায় না, বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া আভ্যন্তরিক প্রকৃতির অনুমান

অনেক সময়েই যে ভ্রমসঙ্কুল এবং বিপদ জনক, রামনগরের যোগেন্দ্র বিশ্বাস তাহার একটি সুন্দর প্রমাণস্থল। যোগেন্দ্র যখন তোমার প্রতি ভালবাসা দেখাইবে, তোমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইবে যোগেন্দ্র তোমা ভিন্ন আর কিছু জানে না। যোগেন্দ্র যখন তোমায় ঘৃণা করিবে, তখন যোগেন্দ্রর মুখের দিকে তাকাইলে বোধ হইবে যোগেন্দ্র স্বর্গ, তুমি নরক। যোগেন্দ্র যখন কোপ দেখাইবে, তখন মনে হইবে যোগেন্দ্র শাস্তা, তুমি অপরাধী। আবার যখন সে দীনতা দেখাইবে, তখন মনে হইবে সে দাস তুমি প্রভু। যখন আত্মাপরাধ স্বীকার করিবে তখন মনে হইবে তাহার মতন সরল প্রকৃতির লোক আর নাই। অপরের মনে আপনার ইচ্ছানুমত ভাব উৎপাদন করিবার তাহার অদ্ভুত শক্তি ছিল।

যোগেন্দ্রের প্রকৃত চরিত্র কি তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। এক্ষণে এই মাত্র পরিচয় পাইলেই যথেষ্ট। এই যোগেন্দ্রনাথ দীর্ঘিকা-প্রান্তে এক আম্রবৃক্ষচ্ছায়ায় একক বসিয়া মৎস্য ধরিতেছে।

যোগেন্দ্র মৎস্য শীকারে বড় অনুরক্ত। ইহা যে শুদ্ধ মৎস্যের জন্য তাহা নহে। এইরূপ একক মৎস্য ধরিবার সময় তাহার মস্তিষ্কের কার্য্যকরী শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাইত, বুদ্ধি বড় খেলিত, মনে নানাপ্রকার নূতন নূতন ভাঁজ, নূতন নূতন মতলব উঠিত, এবং সে সমস্ত কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় সকল এইরূপ সময়ে শীঘ্র শীঘ্র উদ্ভাসিত হইত। সুতরাং মৎস্য ধরিতে অনেক সময়ে কৃতকার্য্য না হইলেও, এ কার্য্যে তাহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। এই সময়ে যোগেন্দ্রকে একবার দেখিলে তাহার প্রকৃত চরিত্রের অনেকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। যোগেন্দ্রের ভ্রূ কুঞ্চিত, যে বস্তুর দিকে চক্ষু নিক্ষিপ্ত, দৃষ্টি যেন সে বস্তু অতিক্রম করিয়া শূন্যের দিকে আরও অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, যেন শূন্যস্থিত অপরের অদৃশ্য কোন বস্তু মনোযোগের সহিত দেখিতেছে, মনে মনে যেন সে একটি মতলব আঁটিতেছে।

এই সময়ে একটি যুবতী রমণী দীর্ঘিকা-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবতী শ্বেতবসনা, নিরাভরণা, দেখিলেই বুঝা যায় পতি-হীনা। তাহার মুখভাব উদাস উদাস। শরতের ছিন্ন ভিন্ন মেঘখণ্ডগুলি যেমন ইতস্ততঃ উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে তাহার মনও সেইরূপ উড়িয়া বেড়াইতেছে। এক এক খণ্ড মেঘ যেমন সহসা সূর্য্য ঢাকিয়া প্রকৃতির মুখচ্ছবি মলিন করিতেছে, এক একটি মনের ভাবও সেইরূপ রমণীর মুখচ্ছবি বিষাদময় করিতেছে। আবার সে ভাব সূর্য্যাবরণকারী মেঘ-খণ্ডের ন্যায় শীঘ্র অপসৃত হইতেছে, আবার রমণীর মুখচ্ছবি হাসিয়া উঠিতেছে। রমণী আসিয়া ঘাটের চত্বরের পার্শ্বস্থিত এক সুবর্ণ-কোরক মঞ্জরিত চম্পক বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইল। নিকটে এক ঘন পত্র বিশিষ্ট আম্রবৃক্ষের শাখায় একটি ঘুঘু একলা বসিয়া অবিরাম ডাকিতেছে। ঘুঘুর রব এক এক সময়ে বড়ই চিত্তাকর্ষণকারী। রমণীর দৃষ্টি সেই পক্ষীর দিকে পড়িল। অনেকক্ষণ সে সেই দিকে উদাসভাবে চাহিয়া, মনে মনে পাখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "পাখি, প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া এত ডাকিতেছ কেন, এক একটি ডাকে মনে হইতেছে তুমি তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু বাহির করিয়া ফেলি-তেছ। কেন ডাকিতেছ? তুমি কি জগতে আমার মত একাকী? সেই জন্যই কি প্রবল ভাবরাশি তোমার হৃদয়কে উচ্ছলিত করিতেছে, তাহা নিরোধ করিতে না পারিয়া তুমি অবিরাম ডাকিতেছ? পাখী, তুমি ডাকিয়া আরাম পাইতেছ? কৈ, তা ত বোধ হয় না। তুমি ত একবার ডাকিলে, দুই বার ডাকিলে, দশ বার ডাকিলে, শত বার ডাকিলে, তবু ত তোমার ক্লেশের শেষ নাই, ডাকের বিরাম নাই। ক্রমশঃ তোমার স্বর তীব্রতর হইতেছে, যেন তোমার যাতনা বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে আর ডাকিয়া লাভ কি পাখি! তুমি কি ভাব তোমার স্বরে জগতের কাহারও কিছু উপকার হইতেছে? না পাখি! তোমার এই স্বর কেবল আমার মত

কত হতাশ হৃদয়ে নির্ব্বাপিত অগ্নি জ্বালাইয়া দিতেছে। তবে আর এ ডাকে লাভ কি? নিরাশার উচ্চ ক্রন্দনে জগৎ ভাসাইয়া লাভ কি? এ ক্রন্দনে কেবল ক্রন্দনের রোলই বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু তাহাতে জগৎ দ্রবীভূত হয় না, দুঃখ ঘোচে না। পাখি তুমি চুপ কর। আমিও চুপ করিয়া থাকি, প্রাণের ব্যথা প্রাণে চাপিয়া রাখিয়া চুপ করিয়া থাকি।"

এইরূপ ভাবিয়া অঞ্চলে নয়ন মুছিতে মুছিতে, রমণী অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে ঘাটের সোপানাবলী অবতরণ করিতে লাগিল। কয়েকটি সোপান নামিয়াই তাহার দৃষ্টি যোগেন্দ্রের উপর পতিত হইল। যোগেন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই রমণীর দিকে চাহিয়াছিল। নয়নে নয়নে মিলন হইল। কি সর্ব্বনাশ! যাহাকে ভয় তাহাই উপস্থিত। রমণীর মুখ ভিন্ন ভাব ধারণ করিল, গণ্ডস্থল আরক্তিম হইল, নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল; বক্ষস্থল তরঙ্গতাড়িত তটিনীবক্ষবৎ স্ফীত হইতে লাগিল। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, সে যে একটি অসম্পূর্ণ বাঁধ হৃদয়-মরুভূমে বাঁধিয়াছিল এক প্রবল বন্যাস্রোত আসিয়া তাহাতে সজোরে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল, মুহূর্ত্ত মাত্র পূর্ব্বে যে আত্মসংযমের সংকল্প করিয়াছিল, প্রলোভনের তুফান উঠিয়া তাহা কোথায় ভাসাইয়া দিল। কারাগার হইতে পলায়মান বন্দী যখন কারাগার-প্রাচীরে দণ্ডায়মান, তখন যেমন পলায়নজন্য ভীতি এবং স্বাধীনভাবে বিচরণেচ্ছা এই দুইটি প্রবল ভাবের দ্বন্দ্বে তাহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে থাকে, যোগেন্দ্রকে দর্শন মাত্র আজ এই ঘাটস্থিত রমণীর হৃদয়ও আত্মসংযম রূপ দৃঢ় ব্রতের সীমাতিক্রমণ জন্য ভয় এবং স্বেচ্ছাচারিতার উল্লাসময়, সম্ভোগময় জীবনের স্পৃহা, এই দুইটি প্রবল ভাবের সংঘর্ষণে বিক্ষোভিত হইতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইল। কিন্তু বন্দী যেমন মুহূর্ত্ত মাত্রে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, একবার সেই ভীষণ বহুকষ্টময় কারাগারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার, কঠোর নির্য্যা-

তন স্মরণ করিয়া, সবেগে বাহিরের দিকে লম্ফ প্রদান করে, আজ এই রমণীও সেইরূপ আত্ম-সংযম-ময় কঠোর জীবনের সীমান্তে দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্ত মাত্র ইহার বহুল আয়াস ও আত্মনিপীড়ন স্মরণ করিয়া, ইহাকে একটি অতি ভীষণ স্বাধীনতা নাশক নির্জন কারাগার স্বরূপ ভাবিয়া ইহার বাহিরের স্বেচ্ছাচারিতাময় জীবনে ঝাঁপিয়া পড়িবার সিদ্ধান্ত করিল।

কিছুক্ষণ পরেই রমণীর মুখচ্ছবি ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। এখন ইহার অধরে মৃদু মৃদু হাসি খেলিতেছে, আঁখি চঞ্চল হইয়াছে, এবং ঘন ঘন যোগেন্দ্রের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতেছে। রমণী এখন জলে নামিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছে,এক অঙ্গ এক বার মাজিয়া, আবার দশ বার মাজিতেছে, এক বস্ত্র এক বার কাচিয়া আবার দশ বার কাচিতেছে। যোগেন্দ্র প্রেম-পূর্ণ নয়নে এই হাবভাবশীলা, নানাপ্রকারে ক্রীড়মানা, পূর্ণাবয়বা সুন্দরীর প্রতি চাহিয়া আছে। ভাবিতেছে রমণী যেন ঘাট আলোকিত করিয়া আছে। দুই জনের মধ্যে ব্যবধান প্রেমিকযুগলের কথা বার্ত্তা কহিবার পক্ষে অসুবিধাজনক। সেই জন্য তাহাদের মধ্যে কোন কথা বার্ত্তা হইতেছিল না। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিলে, রমণী দেখিতে পাইল ঘাটের নিকট গ্রামের অনেকগুলি অবগুণ্ঠনবতী বধূ আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারা দূর হইতে যোগেন্দ্রকে দেখিয়া রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তখন সে যোগেন্দ্রের সহিত কথা কহিবার একটি ছল পাইল এবং বলিল "যোগেন বাবু, আর কেন, আজ যে মাছ ধরিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে ; এখন উঠুন বউয়েরা ঘাটে নামিতে পারে নাই।" যোগেন্দ্র তখন সিপ সুতা গুড়াইয়া উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল। রমণীও বারিসিক্ত, শ্বেতবসনাবৃত, সর্ব্বসৌষ্ঠবসম্পন্ন দেহ-যষ্টি খানি সলিল হইতে উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র সেই সর্ব্বাঙ্গপরিলক্ষ্যমাণ সৌষ্ঠবরাশি দর্শন করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিল ; দেখিতে পাইল পথপার্শ্বে বাস্তবিকই

অনেকগুলি অবগুণ্ঠনবতী নব বধূ সুকুমারীর নেতৃত্বাধীনে এক স্থানে দণ্ডায়মানা। তাহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠনহীনা সুকুমারী মুকুলিতা কুমুদিনী-দল মধ্যে প্রস্ফুটিতা কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। যোগেন্দ্রের সে দিকে দৃষ্টি পড়িল। লজ্জাবতী লতা যেমন স্পর্শন মাত্রেই সঙ্কুচিত হয়, যোগেন্দ্রের দৃষ্টি মাত্রেই সুকুমারী এবং বধূগুলি তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইয়া অবনতমস্তকে স্বল্পতর স্থানে সরিয়া দাঁড়াইল। যোগেন্দ্র সুকুমারীর দিকে তীব্র কটাক্ষ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সুকুমারী বধূগুলিকে লইয়া ঘাটে নামিল। বধূগুলি সকলেই বালিকা, দুই এক জন সুকুমারীর সমবয়স্কা, অনেকে তাহা অপেক্ষাও কিছু ছোট। গুরুজনভয়ে সমস্ত দিন গৃহে গম্ভীর ভাবে গৃহিণীপনা করার পর এখন আর ইহাদের স্ফূর্ত্তি রাখিতে স্থান নাই। বালিকাসুলভ চঞ্চলতা কোথায় যাইবে? আনন্দ-চঞ্চল, ক্রীড়মান মৎস্যপুঞ্জের ন্যায় তাহারা দীর্ঘিকা-সলিলে ক্রীড়া আরম্ভ করিল। কেহ এ দিকে যাইতেছে কেহ ও দিকে যাইতেছে, কেহ কাহারও গাত্রে জল সিঞ্চন করিয়া দিতেছে, কেহ কাহাকেও অধিক জলে ঠেলিয়া দিতেছে, কেহ কাহারও বস্ত্র টানিতেছে, কেহ বা আপনার সন্তরণপটুতা দেখাইবার জন্য, অধিক জলে যাইতেছে। দীর্ঘি-কার স্বচ্ছ সলিলে ভাসমান বালিকাদের ফুল্ল মুখগুলি নদীবক্ষনিক্ষিপ্ত তরঙ্গবিক্ষিপ্ত সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহাদের হাসি ও গল্পের কলরবে ঘাট পূর্ণ হইল। সুকুমারী কেবল গম্ভীর ভাবে, অথচ বালিকাদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতির সহিত তাহাদের উপর মধ্যে মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। কেহ অধিক হাসিলে বা জোরে কথা কহিলে তাহাকে নিবারণ করিতেছে, সন্তরণ করিয়া কেহ অধিক দূরে যাইলে তাহাকে শাসন করিতেছে, কাহারও পৃষ্ঠদেশ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছে, কাহারও মাথার বেণী খুলিয়া দিতেছে, কাহার বা কাণের মাকড়িটি পাছে খুলিয়া জলে পড়িয়া যায় সেই জন্য ভাল করিয়া

পরাইয়া দিতেছে। সুকুমারী যেন সকলেরই জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বধূগুলি সকলেই তাহাকে সেইরূপ সম্মান ও ভালবাসা দেখাইতেছে এবং বধূগুলির আত্মীয়জনও সেইরূপ ভাবিয়াই তাহাদিগকে সুকুমারীর সঙ্গে পাঠাইয়াছে। পাঁচটা গল্প হইতে হইতে একটি প্রায় সুকুমারীর সমবয়স্কা বধূ একটু মুচকী হাসিয়া বলিল "দিদি, দেখলে ব্যাপার ?"

সু। কি ব্যাপার লো ?

বধূ। আহা, দিদি আমার উদোর গো, কিছু যেন বুঝতে পারেন না। এই বিনি ছুঁড়ীর ব্যাপারটা। যোগেন্দ্র বিশ্বাস মাছ ধরিতে আসিয়াছে, আর উনি ঘরে থাকিতে পারেন নাই, ভর্ত্তি রৌদ্রটার সময় দীঘির ঘাটে গা ধুতে আসিয়াছেন। মরণ আর কি, তা নইলে কি আর লোকে এত কথা বলে।

সু। আর নে বৌ, আপনার কায সেরে নে, তোর তো খেয়ে দেয়ে আর কোন চিন্তা নাই, কেবল ঐ সব কথা নিয়ে গোলযোগ করবি। কায কি ভাই পরের কথায়।

এই সময়ে আরও অনেকগুলি বধূ "দিদি কি হইয়াছে—কি হইয়াছে" বলিয়া সুকুমারীকে ঘেরিয়া ধরিল।

সু। হয়েচে তোমাদের মাথা, শীঘ্র শীঘ্র গা ধুইয়া লও, না হলে বকুনি খেয়ে আজ সারা হবে। কখন সব এসেচ তা মনে আছে ?

এই বলিয়া সুকুমারী কাহারও চিবুকটি ধরিয়া মুখটি ঘুরাইয়া দিল, কাহার প্রতি একটু কৃত্রিম ক্রোধের ভাব দেখাইল। বধূগুলির বকুনির কথাটা স্মরণ হওয়ায় মুখ শুকাইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ সে স্ফূর্ত্তি, সে চঞ্চলতা বিলুপ্ত হইল। কাহারও বা শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর ক্রোধরঞ্জিত ভ্রূকুটীকুটিল মুখখানি মনে পড়িল, কেহবা গরবিণী ননদিনীর মর্ম্মচ্ছেদী ব্যঙ্গোক্তি কল্পনায় শুনিতে পাইল। সকলেই তৎপর আপনার আপনার কায সারিয়া শীঘ্র উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এ দিকে যোগেন্দ্র বিশ্বাস বিনোদিনীর অনুসরণ করিতে লাগিল। দীর্ঘিকা ঘাটে যে রমণীকে আমরা দেখিয়াছি তাহার নাম যে বিনি বা বিনোদিনী তাহা সুকুমারী এবং বধূর কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিয়াছি। বিনোদিনী যে পথে যাইতেছে যোগেন্দ্রও সেই পথে যাইতেছে। যদি কোন গ্রামের লোক ইহা দেখে তাহা হইলে বিশেষ দোষের ভাবিবার কোন কারণ নাই, কারণ যোগেন্দ্র ও বিনোদিনীর বাড়ী প্রায় এক স্থানেই, এবং এক পথেই যাইতে হয়। কিন্তু কোন গ্রামের লোক দেখিল না। ম্যালেরিয়া প্রভাবে আজ কাল বাঙ্গালা দেশের অনেক পল্লীরই এরূপ অবস্থা যে গ্রামের মধ্য দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইলেও পথে একজনা মনুষ্যের সহিতও সাক্ষাৎ হয় না। এই নির্জ্জন তরুলতাচ্ছন্ন পল্লী-পথে যোগেন্দ্র বিনোদিনীর অনুসরণ করিতেছে। যোগেন্দ্রের পরিধানে একখানি মিহি চওড়া কালাপেড়ে সাড়ী (নিজের বস্ত্র ময়লা হওয়ায় গৃহিণীর নিকট সে দিন সেখানি ধার লইয়াছিল); অঙ্গে এক প্লেটদার কফদার কামিজ, স্কন্ধদেশে একখানি টর্কিশ তোয়ালে, পায়ে এক জোড়া বার্ণিস করা জুতা, টেরিটি আলবার্ট ফ্যাসনে কাটা। এক হস্তে সিপ্‌গাছটি ও একটি হুঁকা লইয়া, অপর হস্তে শোভন গুম্ফ বিন্যাস করিতে করিতে, যোগেন্দ্র নিস্তব্ধভাবে বিনোদিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। বিনোদিনী একবার পিছনের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল "যোগিন বাবুর মুখে কথা নাই যে, এত ভাবিতেছেন কি?"

যো। দেখ, মক্ষিকা যখন পুষ্পের উপর উড়িয়া বেড়ায় তখনই গুন্‌ গুন্‌ করে, আর যখন একমনে পুষ্পমধু পানে রত হয় তখন কি আর ইহার কোন শব্দ করিতে সামর্থ্য থাকে? আমার মন মক্ষিকাও তোমার রূপ-পুষ্পে লিপ্ত হইয়া ইহার অতুল সৌন্দর্য্য-মধু পান করিতেছে। এখন কি আমার কথা কহিবার শক্তি আছে?

বিনোদিনীর পদতল হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত যেন তাড়িৎ প্রবাহ

ছুটিতে লাগিল। বিনোদিনীর মনে হঠাৎ কি যেন একটুকু সন্দেহ হইয়াছিল, একটু ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল, সেটা যে অমূলক তাহা যেন এখন বুঝিতে পারিয়া কিছু অপ্রতিভভাবে বলিল, "আমি ভাবিতেছিলাম তুমি চুপ করিয়া যেন কি তুলনা করিতেছিলে।"

যো। তুলনা? কিসের তুলনা?

বি। এমন কিছু নয়।

যো। তবু শুনি না।

বি। তুলনা এই হাতের ফুলটিতে আর গাছের ফুলটিতে।

যোগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে যখন সে সুকুমারীর দিকে কটাক্ষ করে, বিনোদিনী তাহা লক্ষ্য করিয়াছে, এবং সেই জন্যই এই কথা বলিতেছে। উত্তর করিল "দেখ যে বুদ্ধিমান সে গাছ হইতে ফুল পাড়িবার আগেই তুলনা করিয়া দেখিয়া শুনিয়া যেটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেইটিই হস্তগত করে। আমিও তাহাই করিয়াছি, এখন আর আমার তুলনার কি আবশ্যক?"

রূপগর্ব্বিতা রমণী রূপ প্রশংসায় যেমন সন্তুষ্ট হয় তেমন আর কিছুতেই নয়। বিনোদিনী এই প্রশংসা টুকু পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল এবং কণ্ঠস্বর কিছু সূক্ষ্ম ও মিষ্ট করিয়া বলিল "তবু ভাল, তবে কি জান, যোগীন বাবু, দূর হইতে যাহা ভাল লাগে, কাছে পাইলেই আবার তাহা মন্দ বোধ হয়। অনেক পুরুষেই ভাল বলিয়া যাহা গ্রহণ করে সেই হাতের ফুল পায়ে ঠেলিয়া আবার গাছের দিকে তাকাইয়া থাকে। পুরুষের মন পাওয়া ভার।

যো। দেখ বিনোদ, আমাকে তেমন পুরুষ ভাবিও না। আমি যাহাকে মন প্রাণ সঁপিয়াছি তাহাকে চিরদিনের তরে সঁপিয়াছি। আমি যাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি তাহাকে চিরদিনের জন্য হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী করিয়াছি। প্রণয়োপহারে চিরদিন তাহার পূজা করিব। বিনু তোমার যোগীনকে নিতান্ত যে সে পুরুষের মত ভাবিও না।

এই শেষ কথাবার্ত্তা রাস্তার যে স্থান হইতে দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইবে সেই স্থানে হইতেছিল। বিনোদিনী অধোবদনে দাঁড়াইয়া পদাঙ্গুলি দ্বারা মৃত্তিকায় চিত্রাঙ্কন করিতে করিতে যোগীনের প্রেম ও আশ্বাস-পূর্ণ কথাগুলি শুনিতেছিল, ভ্রমর-কৃষ্ণ আলুলায়িত কেশদাম তাহার পৃষ্ঠদেশ ও মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। যোগেন্দ্রের শেষ কথাগুলি শুনিয়া বিনোদিনী মুখপার্শ্বস্থ কুন্তলরাজি হস্তদ্বারা সরাইয়া একবার যোগেন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিল। দেখিল যোগেন্দ্রের মুখ প্রভাসিত, উজ্জ্বল নয়ন উজ্জ্বলতর, যেন তাহা হইতে প্রেম ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বিনোদিনী ভাবিল "আহা কি সরল হৃদয়প্লাবনী প্রেম। যোগীন বাস্তবিকই আমার, আমি যোগীনের।"

যোগেন্দ্রও বিনোদিনীর সেই আরক্তিম, আয়ত, ছল্ ছল্ লোচনদ্বয় দেখিয়া ভাবিল "একটা চীজ্ বটে"।

অতঃপর দুইজনে পৃথক্ পথে চলিয়া গেল। যাইবার সময় যোগেন্দ্র বলিল "বিনোদ, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তোমার সহিত আর একবার দেখা করিতে হইবে, একটা বিশেষ কথা আছে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রাম্য সমাজ—পাপিষ্ঠে পাপিষ্ঠে।

বিনোদিনী উৎফুল্লমনে গৃহাভিমুখে চলিল। "তোমার যোগিন" বীণাঝঙ্কারনিন্দিত এই মধুর ধ্বনি যেন তাহার কর্ণকুহরে অবিরাম বাজিতে লাগিল। হৃদয় হইতে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল "আমার যোগিন"।

যোগেন্দ্র স্বগৃহে ফিরিল। যোগেন্দ্রের ঘর বাড়ীর অবস্থা মন্দ নয়, দেখিলেই বোধ হয় উন্নতির বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। এবং ইহাও বোধ হয় যে পূর্ব্বে আরও কয়েকবার উন্নতির সুরু হইয়া তাহা কোন কারণে হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোথাও এক নূতন গৃহের পত্তন হইয়া তাহা অনেক দিন বন্ধ ছিল, আবার তাহা নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কোথাও এক অর্দ্ধনির্ম্মিত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, আবার তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে, কোথাও একটি বহুল-লতাপুষ্প-খোদিত কবাট অর্দ্ধ-সম্পন্ন অবস্থায় পার্শ্বে স্থাপিত রহিয়াছে। "বিশ্বাস বাড়ীর পুরুষদের পাতাচাপা কপাল" একথা বড় প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের আজ দুঃখ, কাল সুখ। আবার হয় ত সুখের উল্লাস শেষ না হইতে হইতেই দুঃখের স্রোত আসিয়া পড়ে, প্রারব্ধ গৃহ সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই অর্থাভাব উপস্থিত হয়, স্ত্রীলোকদের অনেক সাধের গহনা অঙ্গে না উঠিতে উঠিতেই বন্ধক পড়ে।

কিন্তু আজ কাল যে উন্নতির বাতাস বহিয়াছে, তাহা বিলক্ষণ প্রবল, উন্নতির ঝড় বলিলেও হয়। যোগেন্দ্র এক প্রকাণ্ড বৈঠকখানা

বাড়ীর পত্তন করিয়াছে, বহুলোক তাহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে বৈঠকখানা সাজাইবার নানাপ্রকার আসবাব আসিতেছে। যোগেন্দ্রের স্ত্রীরও অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি ভাল ভাল দামী গহনা প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রামের লোকে এখন বলাবলি করে যে তাহাদের পুরাতন জমিদার রামকমল দত্তের মৃত্যু হওয়ায় দত্তবাড়ীর লক্ষ্মী বুঝি বা বিশ্বাসবাড়ী প্রবেশ করে। কারণ তাঁহার পুত্র খোকা বাবু বিষয় কায কিছুই বুঝেন না। যোগেন্দ্র বিশ্বাস তাঁহার বন্ধু ও কর্ম্মচারী এবং যোগেন্দ্রের উপর তিনি সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। খোকা বাবু এখন গ্রামের নবীন জমীদার। তাঁহার প্রকৃত নাম কি তাহা জানি না। অনেকেই বোধ হয় জানিত না, বিংশাধিক বৎসর বয়স হইলেও তিনি খোকা বাবু বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এ ত অল্প বয়স, অনেকের এমন সৌভাগ্যও দেখা যায় যে পলিতকেশ ও স্খলিতদন্তেও তাঁহারা মাসি পিসি ঠাকুরুণদিদির নিকট "আমাদের খোকা বাবু"ই থাকিয়া যান।

খোকা বাবু রামকমল দত্তের বৃদ্ধ বয়সের এক মাত্র সন্তান, সুতরাং বলা বাহুল্য যে বিলক্ষণ আদুরে। রামকমল দত্ত দুই তিন বৎসর হইল পরলোকগত। তিনি এক জন বড় জমীদার না হইলেও বেশ সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। তাঁহার সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি এখন খোকা বাবুর হস্তগত। তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। যে খোকা বাবু এত দিন সাত আদরে খাইয়া পরিয়া নাদুস নুদুস আদুরে গোপাল হইয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেন, তিনি এখন কর্ত্তা। যোগেন্দ্র খোকা বাবু অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড় হইবে। পূর্ব্ব হইতেই দুই জনে বন্ধুত্ব ছিল, এক সঙ্গে খেলাইত, বেড়াইত। এখন সময় বুঝিয়া যোগেন্দ্র সেই বন্ধুত্ব রস এরূপ গাঢ় করিয়া ফেলিয়াছে যে তাহা হইতে খোকা বাবুর নিষ্কাষণ একবারে অসম্ভব।

যোগেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া সিপ্ সূতা রাখিল। কিছুমাত্র মৎস্য ধরিতে না পারায় পরিজনবর্গ অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিল, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া দর্পণ লইয়া মোহন বেশটি একটু চানকাইয়া লইল, টেরিটি যেখানে যেখানে খারাপ হইয়াছিল—মেরামত করিয়া লইল, তোয়ালে দিয়া ঘসিতে ঘসিতে মুখটি লাল করিয়া তুলিল। তাহার পর পান চিবাইতে চিবাইতে পরম বন্ধু খোকা বাবুর সদনে গমন করিল। খোকা বাবু এখন বাগানে বসিয়া আরাম করিতেছেন। খোকা বাবুর দেহটি ক্ষীর-সর-নবনী খাইয়া বিশেষ স্থূলতা প্রাপ্ত, গণ্ডস্থল এরূপ মাংসল, যে আঁখিদ্বয় বিশেষ ক্ষুদ্র না হইলেও অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়; ওষ্ঠাধরও গণ্ডস্থলের অনুরূপ স্থূল; বক্ষঃস্থলে উপরস্থ মাংসের ভাগ এতই অধিক যে তৎস্থানমাত্রনিবদ্ধ-দৃষ্টি হইলে খোকা বাবুকে রমণী জাতির অন্তর্গত বলিয়া হঠাৎ ভ্রম হইতে পারে। খোকা বাবুর চেহারাটি দেখিলেই বুঝা যায় তাঁহার বুদ্ধিটিও চেহারার অনুরূপ। খোকা বাবু বাগানে এক বেত্রাসনে বসিয়া আলবোলায় তামুক সেবন করিতেছেন, পার্শ্বে শৃগালদৃষ্টি খানসামা রামা নাপিত দাঁড়াইয়া আছে, ও বাবুর সঙ্গে আস্তে আস্তে কি কথা বার্ত্তা করিতেছে। আর কোন লোক বাগানে নাই। এক এক বার খোকা বাবুর আওয়াজ কিছু চড়িয়া উঠিতেছে। খোকা বাবুর আওয়াজটী বেশ গম্ভীর; যেরূপ স্থূলকায় তাহাতে আওয়াজ ত গম্ভীর হইবেই, তাহাতে আবার খোকা বাবু কর্ত্তা হইয়াছে।

এই সময়ে যোগেন্দ্র বাগানে উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্রকে দেখিবা মাত্র খোকা বাবু অধীরভাবে অথচ কর্ত্তৃত্বাভিমানব্যঞ্জক গম্ভীর এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "যোগে, তোর রকম কি বল্ দেখি? তুই আমার সঙ্গে ভণ্ডামি আরম্ভ করেচিস্ বটে, কা'ল কি ব'লে গেলি আর আজ একবারে দেখাই নাই।"

খোকা বাবুর মত লোকে বন্ধুর সঙ্গে এইরূপ ভাবেই কথাবার্ত্তা করিয়া থাকে। তাহাতে আবার বিসদৃশ বন্ধুত্ব, খোকা বাবু উচ্চাবস্থ, যোগেন্দ্র অধীন। যাহারা আত্মসম্মানশূন্য নীচাশয় অথবা যাহারা স্বার্থান্বেষী তাহারা ভিন্ন কেহ আপন অপেক্ষা উচ্চাবস্থাসম্পন্ন লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছুক হয় না, এবং করিলেও বড় সুখী হয় না। যোগেন্দ্র এই সাদর সম্ভাষণ পাইয়াও অবিকৃতভাবে খোকা বাবুর সম্মুখে গিয়া এক বেঞ্চের উপর গম্ভীরভাবে উপবেশন করিল এবং মাথায় হাত দিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। খোকা বাবু যোগেন্দ্রের অঙ্গে পা তুলিয়া দিয়া একটু ঠেলিয়া বলিল, "ভাবিস্ কিরে যোগে, মুখে যে কথা নাই"।

যো। আমি যা ভাবি তা কাযের কথাই ভাবি; আমি যে সমস্ত দিন আসি নাই, তা কি নাকে তেল দিয়া ঘুমাচ্ছিলাম। আমি যে কোন্ ফিকিরে আছি তাহা তুমি কি জানিবে বল। দেখ খোকা বাবু (খোকা বাবুর মুখের দিকে সম্পূর্ণ ভাবে তাকাইয়া) আমি তোমার ছেলে বেলার বন্ধু, তাহাতে আবার এখন তোমার দুপয়সা খাইতেছি, আমি তোমার অনুরোধ অবহেলা করিব? তোমার কাছে যে কথা দিয়াছি তাহা অসম্পূর্ণ রাখিব? খোকা বাবু, ২।৩ বৎসর হইল কর্ত্তা মহাশয়ের কাল হইয়াছে, তুমি বিষয় কার্য্যের কি জানিতে বল দেখি? আর এখনই বা কি জান বল দেখি? আমি যদি তোমার পশ্চাতে না দাঁড়াইতাম তাহা হইলে কত যে লোকসান হইত তাহা কি বুঝিতে পার? ছেলে বেলার বন্ধুত্ব বড় জিনিষ। তুমি আমা চেয়ে কিছু ছোট ছিলে, তোমার সব কথা মনে না পড়িতেও পারে, অনেক কথা মনে পড়িবে; ছেলে বেলায় খেলা ধূলা করিতে করিতে যখনই তুমি কোন বিপদে পড়িতে, আমার কি একটা তোমার প্রতি তখন হইতে টান ছিল, আমি দৌড়িয়া যাইয়া তোমার সাহায্য করিতাম, পড়িয়া গেলে উঠাইয়া দিতাম,

কাঁটায় কাপড় লাগিলে তাহা খুলিয়া দিতাম, পায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহা বাহির করিয়া দিতাম। এখনও, তোমার পয়সা খাই আর নাই খাই, তোমার প্রতি আমার টান সেইরূপই আছে। তোমার দুপয়সা লোকসান হইলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। যাহাতে তোমার উন্নতি হয় সে জন্য আমার অবিরাম চেষ্টা। তুমি যাহাতে সুখী হও তাহা সাধন করার জন্য আমি সর্ব্বদা চিন্তিত, খোকা বাবু, আমি ভণ্ডামি করিব তোমার সঙ্গে ?

খোকা বাবু ভাবিল, "আহা এমন অকৃত্রিম বন্ধু কি মেলে।" একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "যোগিন, তাকি আর আমি জানি না ; দেখিতেছ ত আমি কি আর তোমার সঙ্গে তুই তুই করি. আমি সমস্ত ভারই তোমার উপর দিয়াছি। আমি বিষয় কার্য্যের কিছু বুঝিও না, বুঝিতে চাইও না। তুমি সব দেখিও শুনিও, আমার কেবল যা টাকার দরকার সেইটি পাইলেই হইল।"

যো। সে কথা আর আমাকে বলিতে হইবে না। কর্ত্তা মহাশয় যেরূপ চালাইয়া গিয়াছেন, আমি দেখিবে তাহা অপেক্ষা ভাল চালাইব। কর্ত্তামহাশয় ত সেকালের লোক ছিলেন, আইনের ঘোঁজ ঘাঁজ বুঝিতেন না, আমার ত আর সে সব বুঝিতে বাকি নাই ; আমি ৫।৬ বৎসর উকিল মোক্তারের সঙ্গে ঘুরিয়াছি। এই দেখনা লক্ষ্মীপুর ইজারা মহালের খাজানা কয় বৎসর প্রজাদের কাছে মায় বাজে আদায় কেমন সতেজে উশুল করিয়া লইতেছি, অথচ উপরিস্থ মালেকান্ বেটাদিগকে একটী পয়সাও দিই নাই। কেন সে বেটাকে দিতে যাব ? সে বেটাকে দিলে আর আমাদের কতই থাকে, আমরা যে এত কষ্টে খাজানা আদায় করি, তার কি লাভ হয় ? আর দেখ এই লক্ষ্মীপুরের টাকাটা পাইয়া তুমি কেমন হাত দরাজ করিয়া খরচ করিতেছ, তোমার এরই মধ্যে বড় জমিদার বলিয়া দেশে বিদেশে নাম বাহির হইয়াছে।

খো। আচ্ছা যখন জমিদার নালিশ করিবে!

যো। (ঈষৎ হাসিয়া) তাইত বলি, এসব ঘোর ফের কি কেহ শীঘ্র বুঝিতে পারে? নালিশ ক'রে সে বেটা করবে কি, বিষয় বিক্রী করিয়া লইবে? একটা নূতন স্বত্ব সৃষ্টি করিয়া বেনামী করিয়া রাখিলেই ফুরিয়া গেল। তোমার বিষয় বিক্রয় করিতে আসিবে, আমি গিয়ে দাবি করিব "আমার বিষয়" এবং তাহা দলিল দস্তাবেজ দ্বারা সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিয়া দিব। তা হইলেই বেটা ফাঁপড়ে পড়িল। নালিশ করিয়া টাকা আদায় করা, জান খোকাবাবু, আজ কাল বড় সহজ কথা নয়। অনেক কাঠ খড় পোড়াইতে হয়।

রামা খানসামা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন বলিল "বিশ্বাস মহাশয়ের কথা সব পাকা কথা। সে কথা মত চলিলে সব দিকে সুবিধা।" যোগেন্দ্র তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছিল যে কিছু সম্পত্তি তাহার নামেও থাকিবে।

বিশ্বাসী ভৃত্য যদি সময় বুঝিয়া কথা বলিতে পারে তাহাতে অনেক সময় বড় দৃঢ় বিশ্বাস হয়। যাহাদের আবার নিজের বিচারশক্তি তীক্ষ্ণ নয় তাহাদের এইরূপ কথার জন্য ভৃত্যের উপর বিশ্বাস অধিক প্রবল হয় এবং অনেক স্থলে চতুর ভৃত্য প্রভুরও প্রভু হইয়া পড়ে। খোকাবাবু একেইত যোগেন্দ্রের কথা বেদবাক্য বলিয়া জানিত, তাহাতে আবার তাহার প্রিয় ভৃত্য ইহার সমর্থন করায় যোগেন্দ্রের যুক্তি ও পরামর্শ যে অতি সুন্দর ও সুফলময় এবিষয়ে আর তাঁহার কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি প্রফুল্লমুখে বলিলেন "রাম তা না হ'লে আর আমি যোগিনের উপর সমস্ত ভাঁর দিয়া নিশ্চিন্ত হই। হাজার হউক বাপের বেটা, আমি লোক চিনিতে পারি। কত লোকে যে নায়েবীর জন্য উমেদারী করিয়াছিল আমি কিন্তু কোন বেটাকে বিশ্বাস করি নাই। যোগিনকে ভার দেওয়ায় এখন কত বেটা কত কথা বলে, কে তাহাদের কথা গ্রাহ্য

করে”? এই কথাগুলি খোকাবাবু একটু গর্ব্বের সহিত গম্ভীরভাবে বলিলেন। এই সময়ে তাঁহার মুখের ভাব দেখিতে বড়ই চমৎকার হইয়াছিল। বর্ব্বর যখন আপনাকে বুদ্ধিমান ভাবিয়া গর্ব্বের সহিত আত্ম-প্রশংসার কথা বলে তখন তাহার মুখের দৃশ্য বড়ই কৌতুকাবহ হয়। যোগেন্দ্র খোকাবাবুর মনের অবস্থা বুঝিয়া আর একটী সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। অথবা এতক্ষণ যে কথা বলিতেছিল তাহারই মূলনীতি ব্যাখা করিল। বলিল “দেখ খোকাবাবু, সংসারে চলিতে গেলে আজ কাল একটি কথা সর্ব্বদা মানিয়া চলিতে হয়। পাওনাদারের কাছে কখন সহজে নতশির হইবে না, পাওনাদার যেই তোমাকে নরম দেখিবে অমনি যেন একবারে পাইয়া বসিবে। আমার কাছে সাফ জবাব। বেশ বাবা আমার কাছে তোমার কিছু প্রাপ্য থাকে, যাও আইন আদালত কর, সম্মুখ যুদ্ধে জয় করিতে পার, লইয়া যাও, নচেৎ ফিরিয়া যাও। আমি আগেই যাইয়া তোমার ঘরে বহিয়া প্রাপ্য টাকা দিয়া আসিব? সে রকম কাপুরুষের ব্যবস্থা আমার কাছে নাই।”

খো। ঠিক কথা বলিয়াছ।

যো। এই দেখনা আমি ফন্দি করিতেছি যে যে কয়টা বড় বড় মহল আছে সব কয়টাই বেনামী করিয়া রাখিব। প্রজার খাজানা সমস্ত ঘরে ঢুকাইয়া কোন বেটার কাছে একবারে উপুড় হস্ত করিব না। মালিক-কেও ফাঁকি দিব। তাহা হইলে একবারে টাকার রাশি হইয়া যাইবে, যত ইচ্ছা খরচ করনা কেন।

খোকাবাবু এই সুখময় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠি-লেন, প্রাণ যেন সুখের তরঙ্গে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চাহিল। টাকার রাশি! কি ভাবনা! কাহাকে ভয়! যত ইচ্ছা মজা কর, যাহা ইচ্ছা কর, কাহাকে ভয়! কাহাকেও কিছু দিতে হবে না!—এই চিন্তায় খোকাবাবুর মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল, তিনি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দাঁড়া-

ইয়া উঠিলেন, আবেগভরে যোগেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "প্রিয় যোগিন, পরম বন্ধু, বিষয় কার্য্যের কথা ঢের হইয়াছে, এখন ও কথা ছাড়, ও সকল বিষয়ে তোমার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস, এখন আসল কথা বল, কাল যে পরামর্শ করিলে, তাহার কি হইল ?

যো। আমি কি আসল কথা ভুলি, সব বলিব একটু অপেক্ষা কর, আমি সেই কার্য্যের উদ্ধারের চেষ্টাতেই আজ সমস্ত দিন কাটাইয়াছি।

খো। আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। তুমি কত দূর কি করিয়া উঠিলে আমাকে বল, শীঘ্র বল। ওরে রামা তুই একটু তফাতে যা ত।

রামা তামাকুর কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে টিপি টিপি হাসিতে হাসিতে একটু সরিয়া যাইয়া এক বৃক্ষান্তরাল হইতে সকল কথা শুনিতে লাগিল।

যো। দেখ, কাল যে পরামর্শ করা গিয়াছিল তাহার চেয়ে আরও উচুদরের একটা মতলব আঁটিয়াছি।

খো। আর নে, তোর মতলবে মতলবেই দিন কাটিয়ে গেল, কবে যে কায সফল হবে তাত বুঝিতে পারি না, বলি, তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়াছিস্ কি না ?

যো। তা আবার বলিতে এত দিন বাকী রাখিয়াছি ? এই আজই দীঘির ঘাট হইতে আসিতে আসিতে কত কথা বলিলাম, তোমার রূপ গুণের কত প্রশংসা করিলাম। তুমি তাহাকে কতদূর সুখী করিবে তাহাও বলিলাম। তবে কি জান, স্ত্রীলোকে শীঘ্র একটা মত প্রকাশ করে না। কিন্তু আমি সব মনের কথা বুঝিতে পারি। সে যে তোমাকে পাইলে হাতে স্বর্গ পাইল ভাবিবে তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে ? তবে এতদূর তাহার আশা উঠিতেছে না, তাই কিছু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছে না। সে যাই হউক, সে কিছু বলুক আর নাই বলুক, আমি তাহা অপেক্ষাও একটা ভাল জিনিষ যোগাড় করেছি।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র খোকা বাবুর কাণের কাছে মুখ লইয়া, হাসিতে হাসিতে কি বলিল। খোকা বাবু উত্তর করিল—"আরে দূর মুর্খ তাও কি হয়, সে ব্রাহ্মণের মেয়ে, অতি ভাল, গ্রামশুদ্ধ লোকে তাহার প্রশংসা করে, কখনও কাহারও মুখে ঘুণাক্ষরেও তাহার কোন অপবাদ শুনি নাই।

যো। ভায়া এখনও ছেলে মানুষ, স্ত্রীচরিত্রের কিছুই জাননাত। এ শর্ম্মার জালে পড়িয়া ভাল কয় দিন থাকিতে পারে? বিনোদিনীরও একদিন সুখ্যাতি লোকের মুখে ধরিত না। এখন ত সে হাতের মুটোর ভিতর।

খো। এতই যদি তোমার বশ তা হলে এতদিন চেষ্টা ক'রে তাকে আমার হস্তগত করিতে পারিলে না। তবে বুঝি বিনোদিনীকে আমায় দিতে তোমার ইচ্ছা নাই।

যো। না হে খোকা চন্দ্র (আদরের ভাবে খোকা বাবুর গলা ধরিয়া) তা নয়, তুমি যেমন একটি নবীন নধর পুরুষ, ঠিক তেমনি তোমার একটি যোগ্য নবীনা খুঁজিতেছি। বিনোদিনীর বয়স কিছু বেশী আর বর্ণও তত ভাল নয়, সুকুমারীর রূপ, যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম। তুমি কি তাহাকে কখন ভাল করিয়া দেখ নাই? আমি ত অমন মেয়ে কখন দেখি নাই।

খো। দেখেচি বৈ কি। কিন্তু সে মেয়েটা এত ধীর ও লজ্জাবতী যে তাহার দিকে তাকাইতেও লজ্জা করে; আর পথে ঘাটে কদাচিৎ তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাকে যে শীঘ্র হাত করিতে পারিবে এমন ত মনে হয় না।

যো। সে ভাবনায় তোমার কাজ কি হে, সে ভার আমার। যদি তাহাকে আমি ১৫ দিনের মধ্যে তোমার হস্তগত করিতে পারি, তাতে রাজি আছ কি না?

খো। তা আবার নেই, একশ বার।

যো। বস্, দেখ আমি কি করিতে পারি। অরক্ষিতা যুবতী তেমন কৌশলীর হাতে পড়িলে কয় দিন ভাল থাকিতে পারে? তবে ভাই এখন হইতে বলিয়া রাখি কিছু লোকনিন্দা সহিতে হইবে। তাত কথাই আছে পদ্ম তুলিতে হইলে কণ্টকের আ[illegible] লাগে।

খো। কুচ্‌পরওয়া নাই, আমি কোন্ বেটাকে ভয় খাই? গ্রামে এমন কোন্ বেটা আছে যাহাকে ভয় করিয়া আমাকে চলিতে হইবে?

যো। তাত বটেই। তবে বাড়ীর ভিতরেও গোলযোগ হইতে পারে। বৌ ঠাকরুণ না ঝাঁটা ধরিলে হয়।

খো। ওরে যোগে, আমাকে এমনই কাপুরুষ পেয়েচিস্ কি না? বাড়ীর ভিতর গিয়ে হুঙ্কার ছাড়িলে সব থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। কে কোথায় পালাবে পথ পায় না। আমরা বেটা ছেলে, বাহিরে কি করি না করি তাহা লইয়া মেয়ে মানুষে কথা কহিবে? এত বড় মেয়ে মানুষের আস্পর্দ্ধা? এমন বেআদব মেয়ে মানুষকে আমি এক মুষ্ঠ্যাঘাতেই ঠিক করিয়া দিই।

এই কথাগুলি বলিবার কালে খোকা বাবুর মূর্ত্তিটি বড় সুন্দর হইয়-ছিল। তিনি ঋজু ভাবে ঈষৎ সম্মুখের দিকে আনত হইয়া উপবিষ্ট, নয়নদ্বয় লোহিত বর্ণ, ভ্রূ কুঞ্চিত, গ্রীবা বঙ্কিমভাবে স্থাপিত, অধর দন্ত-নিষ্পেষিত, বক্ষ প্রসারিত, বাম হস্ত কটি-দেশন্যস্ত এবং দক্ষিণ হস্ত প্রসা-রিত ও দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ। যথার্থই যেন বীরাসনে বীর মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। স্ত্রীলো-কের উপর ক্রোধ হইলে, বিশেষতঃ তাঁহারই ভাগ্যভোগিনী মন্দভাগিনীর উপর অতি সামান্য কারণেও ক্রোধ হইলে খোকা বাবুর হৃদয়ে এইরূপ বীর রসের আবির্ভাব হইতে প্রায়ই দেখা যাইত। অনেক সময়ই সেই ক্ষীণা অসহায়া অবলার পৃষ্ঠদেশে এই বীর রসের পূর্ণ প্রকটন হইত। যোগেন্দ্র সুবিধা বুঝিয়া বলিল "তা বৈকি এমন নহিলে কি ব্যাটা ছেলে।

পুরুষে আমোদ আহ্লাদ করিবে তাতে মেয়ে মানুষে খ্যাচ্ খ্যাচ্ করিলে কি সহ্য করা যায়? যার টাকা আছে সে পাঁচটা আমোদ করিবে না ত দিন রাত ঘরের কোণে বউএর আঁচলটি ধরিয়া বসিয়া থাকিবে? ধন ঐশ্বর্য্য সুখের জন্যই। এই তোমার বাগান বাড়ী দিন কয়েকের মধ্যে নন্দনকানন করিয়া তুলিব দেখ না! চারিদিকে অপ্সরা নৃত্য করিয়া বেড়াইবে।”

খো। তুই একটা অপ্সরাই প্রথম যোগাড় কর্ রে ভাই!

যো। আঃ সেত হয়েই আছে, কাল হইতেই দেখনা খাজানার তাগাদা আরম্ভ করিব। শ্রীরাম মুখুর্য্যের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে বাকী খাজানা টানিব, আর সেই তাগাদাতেই দেখিবে সুকুমারীকে হাতে আনিব। সুকুমারী ছেলে মানুষ, সে আর খাজানার হিসাব কি বুঝিবে। এক আছে গোপলা বামুন। সেই শ্রীরাম মুখুর্য্যের মৃত্যুর পর হইতে ওদের খাজানা পত্র দিতেছে। তা সেটা নেহাত আহাম্মক বামুন, চাল কলা বাঁধিতেই জানে। সে জমিদারী কাগজ পত্রের কি বুঝিবে। যা বলিব তাতেই ঘাড় পাতিতে হইবে।

যোগেন্দ্র যে বাস্তবিক একটা উপায় স্থির করিয়াছে ইহা দেখিয়া খোকা বাবুর বড় আনন্দ হইল। তিনি কল্পনায় যেন অভীষ্ট সিদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

যোগেন্দ্র আরও অনেক কথা পাড়িল, কিরূপে কাহার ন্যায্য প্রাপ্য উড়াইয়া দিতে হইবে, কিরূপে প্রজার নিকট অন্যায়রূপে আদায় করিতে হইবে প্রভৃতি নানা কথা আরম্ভ করিল। খোকা বাবুর আর তত কথা শুনিতে ধৈর্য্য রহিল না। অধীর হইয়া বলিলেন, আমাকে আর ও সব কথা বলিবার আবশ্যক নাই, তুমি যাহা যাহা করিবে আমার কোন আপত্তি নাই। এখন আমি যাহা চাই তাহার বন্দোবস্ত শীঘ্র কর। যোগেন্দ্র বলিল,—“আর পাঁচটি দিন অপেক্ষা কর তোমার মনস্কামনা পুর্ণ হইবে।”

এই সময়ে একটি লোক বস্ত্র মধ্যে গুপ্তভাবে কি যেন লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া খোকা বাবু ও যোগেন্দ্র উভয়েই প্রফুল্ল হইল। খোকা বাবু কিছু গম্ভীর ভাবে বলিল "ব্যাটাকে পাঠিয়েছি কখন, ব্যাটা যেন সব মাটি মাড়িয়ে চলে, বার কর কি এনেচিস্ দেখি।"

লোকটি কয়েকটি বোতল বাহির করিল। বলা বাহুল্য গ্রামের অনতিদূরস্থ খোলাভাটি হইতে ধান্যেশ্বরী দেবীর আগমন হইল। তখন খোকা বাবু বলিলেন "চল্ যোগে আমাদের পুরাতন নন্দনকাননেই যাই চল্।" অনিশ্চিত নূতনের আশায় পুরাতনের অনাদর ভাল নয়। জানিস্ ত শ্লোক আছে।

"ধ্রুবানি যঃ পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিসেবতে
ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবানি নষ্টমেবহি।

তুই আর এ সব কি করেই বা জান্‌বি, হায়ার ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়্‌তিস্ ত জান্‌তিস্।

খোকা বাবু এক ইংরাজি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, অনেকগুলি প্রাইভেট টিউটার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে আর উন্নতি হইল না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঋজু পাঠ অধ্যয়ন কালে খোকা বাবুর উপরি উক্ত শ্লোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। বোতলবাহিনীর এমনি অদ্ভুত মহিমা, অধ্যয়ন কালে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রবল মুষ্ট্যাঘাতেও যে শ্লোকের আবৃত্তি করা খোকা বাবুর পক্ষে একবারে অসম্ভব ছিল, আজ তাহা বোতল স্পর্শ মাত্রেই আপনা আপনি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। যোগেন্দ্রও ইংরাজি স্কুলে পড়িয়াছিল, কিন্তু খোকা বাবুর ন্যায় এরূপ উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিবার তাহার অবকাশ হয় নাই। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিয়াই গোপনে পাঠ্য পুস্তক বিক্রয় করিয়া সেই পয়সায় পানওয়ালীর দোকানে পান খাইতে শিখিয়াছিল। গুরুজন পীড়া পীড়ি করায় দুই

একবার নিরুদ্দেশও হইয়াছিল। অতঃপর পড়াশুনা বন্ধ হইল। যোগেন্দ্র এখন অনেকগুলি ইংরাজি শব্দ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উচ্চারণ করিতে পারে; এবং গ্রামে ইংরাজি শিক্ষা সম্বন্ধে খোকা বাবুর নীচেই তাহার স্থান। গ্রামে এজন্য কিছু সম্মানও আছে।

দুই বন্ধু এখন আপনাদের আড্ডায় চলিল। আমাদের আর সেখানে যাইবার আবশ্যক নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

হতভাগিনীর পতন।

গ্রামান্তভাগে তরুলতাবেষ্টিত এক ক্ষুদ্র নির্জ্জন গৃহ। গৃহের সম্মুখে ক্ষুদ্র একটি উঠান। উঠানের চারি দিকে মাটির প্রাচীর, কিন্তু আচ্ছাদনা-ভাবে তাহা অনেক স্থানে ভগ্ন ও গলিত। বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন হইয়াছে। এই নির্জ্জন গৃহের বারান্দায় এক পরমাসুন্দরী যুবতী, বারান্দা ও গৃহ-প্রাঙ্গন যেন আলোকিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে; ষোলকলায় পূর্ণ শশধরের ন্যায় তাহার লাবণ্যরাশি ঢল ঢল করিতেছে। যুবতী পরি-স্নাতা নিলাভ-পট্টবসন মণ্ডিতা; নিবিড় কৃষ্ণ কেশদাম পৃষ্ঠোপরি লম্বিত; সম্মুখে একখানি দর্পণ। কে এ যুবতী? বিনোদিনী নয়? বিনোদিনী কি করিতেছে? কেশবিন্যাস করিতেছে? না; আহ্নিক করিতে বসিয়াছে। ঐ দেখ বিনোদিনী একটি লালবর্ণের থলি হইতে একটু তিলক মৃত্তিকা বাহির করিয়া হস্তে ঘর্ষণ করিল এবং দর্পণটি ঠিক সম্মুখে রাখিয়া একটু মস্তক অবনত করতঃ একটি তিলক করিল। পরে দর্পণ খানি হস্তে লইয়া মুখ-দর্শন করিতে লাগিল। আহা কি মুখের শোভা! অম্লান, অনিন্দ্য নব-বারিসিক্ত সদ্যবিকশিত পদ্মিনীর ন্যায়; আকর্ণায়ত রক্তিমাভ লোচনদ্বয় পদ্মিনীপলাশবৎ ঢল্ ঢল্ ছল্ ছল্ করিতেছে; ভাস্করখোদিতবৎ নাসিকা; তাহার উপর আবার তিলক। অক্ষরের উপর মাত্রা দিলে, কিংবা শশধরের কোলে শুকতারা থাকিলে, তাহাদের যেরূপ শোভা বৃদ্ধি হয়, সুষমাময়কুসুমদলস্থ শ্বেত চিহ্নের ন্যায় এই তিলক বিনোদিনীর মুখের সৌন্দর্য্য সেইরূপ বৃদ্ধি করিল। এই

নির্জ্জন গৃহে এই অতুলনীয় যৌবন-তরঙ্গোচ্ছলিত সৌন্দর্য্য রাশি দেখে কে? যে দেখিত সেই মোহিত হইত। বিনোদিনী আপনিই দর্পণে ইহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অনেকক্ষণ একদৃষ্টে দর্পণের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাচ্ছিল্যের ভাবে দর্পণ মাটিতে নিক্ষেপ করিল। কি ভাবিয়া এরূপ করিল?—"হায় আমার এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য, কি হইবে? এ নব যৌবন বৃথায় যাইবে? আমি কি করিতেছি? আহ্নিক? আহ্নিক করিয়া কি হইবে———ধর্ম্ম? ধর্ম্ম আবার কি, ধর্ম্ম কি আছে নাকি? ধর্ম্ম যদি থাকিত, ঈশ্বর যদি থাকিত, আমার এত দুঃখ কেন, আমার এ রূপ-যৌবন বৃথা কেন? আমি কি করিয়াছি? বিবাহ হইয়াছিল ভাল ঘরে, কিন্তু সুখ কেন হইল না? অন্য সুখ দূরে থাক্ স্বামী যে কেমন বস্তু তাহা দেখিলাম না; কি পাপ করিয়াছি যে আমর এ দুঃখ? ধর্ম্ম ঈশ্বর সব মিথ্যা, পূজা আহ্নিক সব মিথ্যা; তা না হইলে এত লোক সুখী, আর আমিই দুঃখী, তাদের অপেক্ষা আমি কিসে হীন? (আবার দর্পণখানি হস্তে লইয়া) এইত আমি একখানি পাটের সামান্য কাপড় পরিয়াছি, তবু কেমন মানিয়েছে, আর মিত্রিদের বড় বৌ সেদিন একশ টাকার বেনারসী সাড়ী পরিয়াছিল তবু যেন তাহাকে কাটকুড়ানীর মত লাগিতে ছিল; কিন্তু তাহার কত সুখ, স্বামী কত ভালবাসে। ঘোষেদের ছোট বৌ, লোকে তাকে সুন্দরী বলে বটে, কিন্তু সেকি আমার কাছে দাঁড়াইতে পারে? তাহারও কত সুখ। আমার ছোট বেলার সঙ্গী গোলাপী, মনোরমা আমার তুলনায়ত কাল কুচ্ছিৎ, তবু তাদের কত সুখ, সোয়ামী পুত লইয়া সুখে ঘর কন্না করিতেছে। আর আমি এক হতভাগিনী (আবার দর্পণ লইয়া মুখ দর্শন) আহা এমন রূপ, এমন চুল, এমন নাক, এমন চোক; দুর ছাই কি করিতে এ সব! (গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস) সুখ কি

হয় না ? হয়, কিসে হয় ? যাকে ভাল বাসি তাকে পাইলেই হয়। তাকে কি পাওয়া যায় না ? যায় ; তবে আমার সুখের ব্যাঘাত কি ? লোক নিন্দার ভয় ; লোকের মুখে ঝাঁটা। লোকেরা নিজে সুখে থাকিবেন, আমার বেলায় নিন্দা, এমন স্বার্থপর লোকের মুখে ঝাঁটা। ধর্ম্মই যদি না থাকিল, লোকের নিন্দায় আমার ভয় কি ? সুখ না হইলে জীবনই বৃথা। কেন পোড়া লোকের ভয়ে এসুখ হারাইব, এরূপ-যৌবন বৃথায় নষ্ট করিব ? যাহাকে ভালবাসি তাহাকে চাইই। কিন্তু এক কথা, সেকি আমাকে চায় ? চায় বৈকি, সেত বলিয়াছে "তোমার যোগিন"। আহা কি মিষ্টস্বর, কি দিব্য মূর্ত্তি।" বিনোদিনী কল্পনার চক্ষে দেখিতে লাগিল যোগেন্দ্র মূর্ত্তি; শুনিতে লাগিল যোগেন্দ্রের স্বর। "তোমার যোগিন" এই কথা তাহার কাণের কাছে অবিরাম বাজিতে লাগিল।

জগতে যত নাস্তিক আছে, তাহাদের অনেকেই বিনোদিনীর মত মানসিক অবস্থায় নাস্তিক হইয়াছে। ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া যাহারা নাস্তিক হয় তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, এবং দার্শনিক শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু সহস্র সহস্র লোক জগতে সুখ দুঃখের বিষম তারতম্য দেখিয়া, প্রবল সুখ পিপাসায় তাড়িত হইয়া ও অহাতে বঞ্চিত হইয়া, এবং অপর এক জনের নিকট তাহা অনায়াসে লব্ধ দেখিয়া, একজন সাত পুত্র লইয়া সুখে সংসার করিতেছে অথচ আর এক জনের সাধের একমাত্র সন্তান অকালে বিনিষ্ট হইল ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই, নাস্তিক হয়, জগৎকে অরাজক অবিচারপূর্ণ ভাবিয়া থাকে, ভয় ও ভক্তি তাহাদের হৃদয়ে শুকাইয়া যায় এবং আত্মসংযম নিরর্থক ভাবিয়া তখন তাহারা যথেচ্ছ প্রবৃত্তিসাগরে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়, কিম্বা শুষ্ক নৈরাশ্যে জীবনকে জড়তাময় করিয়া ফেলে। এই হৃদয়জাত নাস্তিকতা মস্তিষ্ক-জাত নাস্তিকতা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক ব্যাপক এবং অনিষ্টকর।

ঘটনাশৃঙ্খলের এমনই নিবন্ধন, যে সময়ে বিনোদিনী প্রেমাবেগপূর্ণ চিত্তে সেই নির্জ্জন গৃহে যোগেন্দ্রের মূর্ত্তি ও কথা ধ্যান করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই যোগেন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত। এইরূপ অবস্থা সম্মিলনেই না মনুষ্যের পতন হয়। যোগেন্দ্রকে দেখিবা মাত্র বিনোদিনী শশব্যস্ত হইয়া নিজে যে আসনোপরি উপবিষ্ট ছিল, তাহা উত্তোলন করিয়া আগ্রহের সহিত যোগেন্দ্রকে বসিতে দিল। যোগিনকে দেখিয়া বিনোদিনীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। নবীন অশ্বত্থপত্রে স্নিগ্ধ চন্দ্রভাতির ন্যায় মধুর হাসি তাহার মুখমণ্ডলে খেলা করিয়া উঠিল। যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "বিনোদিনী কি করিতেছিলে, আহ্নিক?

বি। হাঁ আহ্নিকই করিতেছিলাম।

যো। আমি আসিয়া কি তবে ব্যাঘাত করিলাম?

বি। না ব্যাঘাত কেন করিবে বরং সহায় হইলে।

যো। সহায় কি রকম?

বি। এ আর বুঝিলে না?

যো। না, বুঝিলাম না।

বি। যাহাকে কল্পনায় ভাবনা করিতে হয় তাহাকে যদি সম্মুখে সশরীরে পাওয়া যায় তাহা হইলে কি ধ্যানের সাহায্য হয় না? বরং ধ্যান যেজন্য তাহাই তখন সিদ্ধ হয়।

যো। আমি ত আর তোমার গুরু নই যে আহ্নিকের সময় আমাকে ভাবিবে।

বি। গুরু হইয়াছ।

যো। কবে হতে?

বি। তাকি তুমি জান না?

যো। কই দীক্ষা ত হয় নাই।

বি। সে তোমার ইচ্ছা।

যো। তুমি কি তবে তোমার পূর্ব্ব গুরু একেবারে ত্যাগ করিলে?

বি। একেবারে ত্যাগ করিলাম।

যো। কেন?

বি। আমার ইচ্ছা। সে গুরুর মন্ত্র জপ করিয়া, তাহার কাষ্ঠের মালা গ্রহণ করিয়া, সুখ পাইলাম না। তোমার প্রেমার্পিত ভুজমালা কণ্ঠে ধরিবার আমার সাধ।

যো। গুরু ত্যাগ করিলে যে পাপ হয়!

যোগেন্দ্রের হস্তে হস্তার্পণ করতঃ প্রজ্বলিত ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া বিনোদিনী বলিল "পাপ! যোগিন, পাপপুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম মান, অপমান, লজ্জা ভয়, আমি সব জলাঞ্জলি দিয়াছি। আগুন চাপিয়া কত দিন রাখা যায় বল? আর রাখিতে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই পুড়িয়া মরিতে হয়। কেন এমন করিয়া পুড়িয়া মরিব? কি দায়? এমন শীতল জল নিকটে থাকিতে কেন না সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিব?

এই কথা বলিতে বলিতে বিনোদিনীর হস্ত অজ্ঞাতসারে যোগেন্দ্রের হস্তকে দৃঢ় পেষণ করিল। যোগেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরবে, স্পন্দরহিত হইয়া প্রবল-বাসনা-বিক্ষোভিতচিত্তা বিনোদিনীর আবেগপূর্ণ মুখমণ্ডলের প্রতি, তাহার বিস্ফারিত লালসা-লোল-নয়নদ্বয়ের প্রতি তাকাইয়া রহিল; থাকিতে থাকিতে মুগ্ধ হইল; দুই কর বিনোদিনীর কণ্ঠে অর্পণ করিয়া তাহাকে একটি চুম্বন করিল। বিনোদিনী পুলকপূর্ণ কলেবরে নয়ন নিমীলন করিল।

যো। বিনোদিনি, এইত দীক্ষা হইল।

বি। হইল, আমি তোমার প্রিয় শিষ্যা হইলাম।

যো। এখন আমার গুরুদক্ষিণা?

বিনোদিনী স্নানের সময় একটি কমল তুলিয়াছিল। সেইটি হাসিতে হাসিতে আনিয়া যোগেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিল।

যো। অপর গুরুর বেলায় সোণা রূপা, টাকা পয়সা, আর আমাকে বুঝি একটি কেবল জলের ফুল দিয়াই বিদায়!

গৃহের দেওয়ালে একটি বহুমূল্য স্বর্ণহার লম্বমান ছিল। বিনোদিনীর অনেকগুলি গহনা ছিল, কিন্তু অভাব বশতঃ একে একে সমস্তগুলিই বন্ধক পড়িয়াছে বা বিক্রীত হইয়াছে। এই হারগাছটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। বিনোদিনী তৎপর তাহা আনিয়া যোগেন্দ্রের কণ্ঠদেশে অর্পণ করিল। যোগেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল—"বিনোদিনী তুমি যথার্থই অকপট প্রেমিক। তোমার নিকটই আমাকে প্রেম শিক্ষা করিতে হইবে, তুমিই আমার প্রেমগুরু"। এই বলিয়া হারগাছটি যোগেন্দ্র বিনোদিনীর কণ্ঠে অর্পণ করিল। বিনোদিনী তৎপর তাহা খুলিয়া যোগেন্দ্রের কণ্ঠে পুনরর্পণ করিল।

যো। বিনোদ, তোমার সরল প্রেমই আমার যথার্থ গুরুদক্ষিণা, তবে তুমি যখন আমাকে একটি নিদর্শন দিলে আমিও একটি নিদর্শন দিতেছি—এই বলিয়া যোগেন্দ্র নিজের অঙ্গুলি হইতে একটি স্বল্পমূল্য অঙ্গুরীয় বিনোদিনীর হস্তে পরাইয়া দিল এবং বলিল আর অধিকক্ষণ একত্র থাকা উচিত হয় না, তোমার মা কোথায়?

বি। দিদির বাড়ী গিয়াছেন। এখন ১০।১৫ দিন সেখানে থাকিবেন।

যো। তোমার দিদির একটি ছেলে তোমার কাছে যে থাকিত?

বি। সে পাঠশালা গিয়াছে, সন্ধ্যার সময় আসিবে। আর একটু বস না, কে আর এখন আসিবে।

যো। না বেলা হইয়াছে, সময়ান্তরে আসিব এখন যাই।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র বিনোদিনীর হৃদয়কুঞ্জ অন্ধকার করিয়া তাহার

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাহিরে আসিয়া ভাবিল "আঃ মেয়েটা একবারে মজিয়া গেছে। যা হৌক আমি একটা বাহাদুর লোক নিশ্চয়, এমন দুই দিকে লাভ করিতে কোন্ বেটা পারে? হারগাছটার দাম কম না ৫০০৲ শত টাকা হইবে। আজ আমার খুব সুপ্রভাত হইয়াছিল বটে"। হারগাছটি পকেটে ফেলিয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্র গৃহাভিমুখে চলিল এবং মনে মনে স্থির করিল যত দিন মেয়েটার হাতে কিছু থাকে, তত দিন উহাকে কোনমতে হাতছাড়া করা হইবে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপিষ্ঠের অত্যাচার।

সুকুমারীদের বাড়ীর নিকট দিয়া একটি রাস্তা আছে; সেই রাস্তার পার্শ্বে একটি ছোট পুষ্করিণী; সুকুমারী ও তাহার প্রতিবেশিনিগণ সেই পুষ্করিণীর ঘাট সরে। এক দিন প্রাতঃকালে সুকুমারী উচ্ছিষ্ট বাসন-গুচ্ছ হস্তে লইয়া, সেই ঘাটে আসিতেছে, এমন সময়ে যোগেন্দ্র সম্মুখে পড়িল। যোগেন্দ্র সুকুমারীকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "ওগো সুকুমারি, তোমাদের খাজানাপত্র ঢের বাকী পড়িয়াছে, আরত না দিলে চলে না। তুমি মেয়েমানুষ, তাতে আবার আপদ বিপদ অনেক গেল, তাই এতদিন কিছু বলি নাই"।

সুকুমারী যোগেন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাহার এই কথা শুনিয়া হস্তধৃত বাসনগুচ্ছ সহিত, অবনত মস্তকে, কিয়ৎক্ষণ খোদিত-প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ নীরবে নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; পরে ধীরেধীরে বলিল "খাজানা বাকী আছে? সে কি, কৈ গোপাল দাদা ত কিস্তিতে কিস্তিতে খাজানা দেন, বাকীর কথা ত কখন বলেন নাই।"

যো। কে বলিল কিস্তিতে কিস্তিতে খাজানা দেয়, তা হলে আর বাকী পড়বে কেন?

সু। কত বাকী আছে?

যো। তা ঢের, মায় সুদ শদাবধি টাকার কাছাকাছি।

সু। সেকি এত বাকী কেমন করে হবে? যা হউক গোপাল দাদা

বাড়ীতে নাই, আজই আসিবেন; তিনি আসিলেই আমি তাঁহাকে বলিব। আমিত আর কিছু জানি না।

যো। তাকে বলিলে আর কি হবে। সেত সকলই বুঝে। তোমরা মেয়েমানুষ বলিয়া আমি ভাল করিয়া হিসাব দেখিয়াছি, কোন ভুলচুক নাই। আজ নাগাদ সন্ধ্যা টাকার আয়োজন কর, না হয় কি ব্যবস্থা করিবে ভাবিয়া স্থির কর, তা না হইলে তোমার ভাল হইবে না, আমি আশ্বিনের কিস্তিতে আর কোন টাকা বাকী রাখিব না।

শেষ কথাগুলি যোগেন্দ্র বড় কর্কশ স্বরে বলিল। সেই কর্কশ স্বর ও ভয় প্রদর্শন সুকুমারীর প্রাণে বড় ব্যথা দিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল আসিল, কোন কথা বলিতে পারিল না। যোগেন্দ্র তাহা দেখিয়া পূর্ব্ববৎ কর্কশ স্বরে বলিল "কাঁদিলে আর কি হবে, তোমাদের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এক গোপাল দাদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর। সেটা মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়, কোথায় থাকে কি করে কিছুই স্থিরতা নাই, আর তাকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস, ইহার ফল আর কি হবে। যা হউক টাকার উপায় কর"। গোপালের উপর শ্লেষোক্তিগুলি সুকুমারীর প্রাণে অধিকতর ব্যথা দিল। সুকুমারী ঘাটে যাইয়া বাসন মাজিতে মাজিতে পুষ্করিণীর জলের সহিত নিজের অশ্রুজল নীরবে মিশাইতে লাগিল।

সেই দিনই দুই প্রহরের সময় যখন সুকুমারী পাক করিতেছিল, একজন পিয়াদা আসিয়া সুকুমারীর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া খাজানা তাগাদা করিয়া যায়। চিন্তা ও দুঃখে সুকুমারীর আর সেদিন খাওয়াই হয় নাই। আবার যখন সুকুমারী বিকালে পানীয় জল আনিতে যায়, রাস্তায় অপর একজন পিয়াদা কর্কশ ভাবে তাহার নিকট খাজানা চায়। জল লইয়া ফিরিয়া আসিলে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, যোগেন্দ্র স্বয়ং পুনরায় নরম গরম ভাবে তাগাদা করিয়া যায় এবং কহিয়া যায় পরদিন প্রাতে টাকা না দিলে নিশ্চয় অপমানিত হইবে। সুকুমারীর আজ সমস্ত দিন

কাঁদিয়াই কাটিয়াছিল। কারণ এরূপ ব্যবহার সে পূর্ব্বে কখন পায় নাই। গোপাল পূর্ব্বদিন গ্রামান্তরে গিয়াছিল, সমস্ত দিনের মধ্যে ফিরিলেন না, এজন্য সুকুমারী আরও চিন্তিত হইয়াছিল। যাহা হউক সন্ধ্যার পর গোপাল গ্রামে ফিরিলেন। সুকুমারী সকল কথা তাহাকে বলিল। গোপাল শুনিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন এবং স্থির করিলেন পরদিন প্রাতেই এ কথার মীমাংসা করিবেন।

পরদিন প্রত্যুষেই গোপাল খোকা বাবুর জমিদারী কাছারীতে উপস্থিত। আশ্বিন মাসের কিস্তির সময়, সুতরাং প্রত্যুষেই গোমস্তা দপ্তর লইয়া বসিয়াছে। তখন কাছারীতে গোমস্তা ভিন্ন আর কেহই নাই। গোপাল যাইয়াই গোমস্তাকে অনুরোধ করিলেন "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীরাম মুখুর্য্যের দরুন হিসাবটা একবার দেখুন ত, আমি বরাবর কিস্তি কিস্তি খাজানা আদায় করিয়া আসিতেছি, অথচ শুনিলাম অনেক বাকি পড়িয়াছে ইহার অর্থ ত কিছু বুঝি না"।

"আচ্ছা, বস, হিসাব দেখা যাবে" এই বলিয়া গোমস্তা মহাশয় এক ফর্দ্দ কাগজ লইয়া অর্দ্ধখণ্ড বংশের ন্যায় এক কলম গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীদুর্গা নাম লিখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া গোপাল আরও একবার বলিল "গোমস্তা মশায় হিসাবটা একবার দেখুন না"। অতি বিরক্ত ভাবে গোমস্তা বলিল "আরে বাপু অপেক্ষা কর, তুমি যে দেখিতেছি ঘোড়ায় জিন দিয়া আসিয়াছ। হিসাব আর কি দেখিব, হিসাব ঠিকই আছে। টাকার যোগাড় করগে। খাজানা দেবার সময় সব মেঞাই বলে কিস্তি কিস্তি খাজনা দিয়া থাকি, তবে কেন বাকি পড়িল"। গোপাল অগত্যা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল, ইতি মধ্যে ক্রমে ক্রমে লোক জমিতে লাগিল, কেহ খাজানা দিতে আসিল, কেহ খাজানার মামলা করিতে আসিল, কেহ হিসাব জানিতে আসিল, পাইক বরকন্দাজ কাহাকেও বা ধরিয়া আনিল। কাছারীর ঘর যুবা, বৃদ্ধ বালক বেওয়া প্রভৃতি

সকল প্রকার লোকে পূর্ণ হইল। বৃদ্ধ গোমস্তা প্যারিলাল চক্রবর্ত্তী তখনও ভক্তিভাবে শ্রীদুর্গা নাম লিখিতেছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাতঃকালে একশত আটবার দুর্গানাম লিখিয়া তাহার পর যেমন কার্য্যই করুক না কিছুতেই দোষ স্পর্শে না। ক্রমে কাছারী ঘরে জমিদারী সেরেস্তার সর্ব্বোপরিস্থ কর্ম্মচারী নায়েব যোগেন্দ্র বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্রের দৃষ্টি প্রথমেই গোপালের উপর পড়িল। গোপাল বলিল, "নায়েব মশায় শ্রীরাম মুখুয্যের দরুন খাজানা আমি কিস্তি কিস্তি আদায় করিয়া আসিতেছি, তবু শুনিলাম অনেক বাকী পড়িয়াছে। কিরূপে তাত বুঝিলাম না, একবার হিসাবটা দেখাতে আজ্ঞা করুন।"

যোগেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল "চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাম মুখুয্যের হিসাবের ফর্দ্দটা দাওনা, বিলম্ব কর কেন, আজই না টাকা দেবার কথা আছে"। গোমস্তা প্যারীলাল একখানা কাগজ গোপালের সম্মুখে খুলিয়া মোট বাকী ৯৫।৶৭॥ দেখাইয়া দিল। তাহা দেখিয়া গোপালের শরীর শিহরিয়া উঠিল। ফর্দ্দটি উপর হইতে পড়িবার চেষ্টা করিল,—পারিল না; গোপাল হস্তাক্ষর পঠনে নিপুণ থাকে নাই, তাহাতে আবার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হস্তাক্ষর, শর্ম্মা খোদ ভিন্ন আর কম লোকেই পড়িতে পারিত। গোমস্তা নিজেই তাহা পড়িয়া শুনাইল। গোপাল শুনিয়া চিন্তিত হইয়া বলিলেন"—সেকি, এসব খাজানা আমি নিজে দিয়া গিয়াছি আমার বেশ মনে আছে, এ ত বড়ই আশ্চর্য্য কথা; গোমস্তা মশায় ফর্দ্দ দেখে একবার আসল হিসাবের খাতাপত্র দেখুন, নিশ্চয়ই এ হিসাবে ভুল আছে"।

গো। আঃ বড়ই তোমার হিসাব বোধ হে, খাতাপত্রের ত সবই বুঝবে, সাধ যায় দেখ না" এই বলিয়া গোমস্তা খসরা খতিয়ান বাকীজায় প্রভৃতি নানা নামের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাগজ পত্র গোপালের সম্মুখে ধরিল। গোপাল বলিল "শুধু কাগজ পত্র আমায় দিলে আর কি হবে, কোথায় কি আছে আমায় দেখাইয়া বুঝাইয়া দাও।"

গ। তুমি ত সোজা লোক নও দেখিতেছি, তোমায় বুঝাইবার জন্য এই ফর্দ্দ তৈয়ার হইয়াছে, তাহা তোমার বিশ্বাস হয় না। আচ্ছা না বিশ্বাস হয়, তুমি কাগজ বুঝিয়া লও। আমাকে আবার কাগজ বুঝাইতে হবে! ভারি গরজ আমার, তোমার বেতনভোগী চাকর কি না?

যো। আরে চক্রবর্ত্তী তুমিওত কম আহাম্মক নও, চাল-কলা-বাঁধা বামুন তার সন্মুখে জমিদারী সেরেস্তার কাগজ ধরিয়া তকরার করিতেছ! ওসব কাগজের মর্ম্ম ও কি বুঝিবে,কাগজ তুলিয়া রাখ"—(গোপালের প্রতি তাকাইয়া) আরে ঠাকুর তুমি খাজানা দিয়া থাক, তোমার ত রসিদ আছে; রসিদ আননা, সব গোল চুকিয়া যায়, মিছামিছি এত হাঙ্গামা কর কেন?

গো: মশায়, সব সময় কি রসিদ দিয়াছ, না দিয়ে থাক? তাহলে আর ভাবনা কি।

যো। (চক্ষু রাঙ্গাইয়া) ঠাকুর আমাদের সেরেস্তার সেরূপ কাজই নয়। পাকা দাখিলা না কাটিয়া কখনও খাজানা লওয়া হয় না। ঘরে গিয়ে দেখ দাখিলা আছে কি না, না থাকে টাকা দাও, না দাও, অপমান হবে। মিথ্যা বকাবকী কর কেন?

গোপাল বিষণ্নবদনে বলিলেন কতক কতক রসিদ যাহা পাইয়াছি, থাকিতে পারে, আচ্ছা দেখি গে।

এই বলিয়া তিনি সুকুমারীর বাড়ী অভিমুখে চলিলেন, সুকুমারীকে যাইয়া বলিলেন "হাঁগা সুকো খাজানার দাখিলা গুলো কি সব রাখিয়াছ?"

স। রাখিয়াত দিতাম, কিন্তু এমন ব্যবস্থা করিয়াত কখন রাখি নাই, আচ্ছা খুজিয়া দেখি।

অনেক অনুসন্ধানের পর বিছানার নীচে হইতে, চালের বাতা হইতে, সুকুমারীর ভ্রাতা শরতের পাঠশালার দপ্তর হইতে, দুই চারি খানা বা

সুকুমারীর বাক্স হইতে, এইরূপে নানা স্থান হইতে কয়েকখানি দাখিল বাহির হইল।

সেগুলি কিন্তু ঠিক পরের পর কিস্তি মত নয়, মাঝে মাঝে অনেক কিস্তি বাদ গিয়াছে। সবগুলি ছাপান দাখিলাও নয়। কতকগুলি আবার অনেক বৎসরের পূর্ব্বের। তবে শেষ চৈত্রের কিস্তির একখানি দাখিলা ছিল, সেইটি দেখিয়া গোপালের কিছু সাহস হইল। সেটি কিন্তু আবার ছাপান দাখিলা নয়। যাহাই হউক, এইগুলি লইয়া গোপাল তৎক্ষণাৎ পুনরায় কাছারিতে গেল। যাইয়া সেগুলি সমস্ত যোগেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল "এই দেখ মশায় কতক দাখিলা আছে, সব পরের পর কিস্তিমত নাই কিন্তু শেষ দাখিলা খানা আছে, তাহাতেইত ঠিক দেখা যাইতেছে আমি শেষ পর্য্যন্ত খাজনা বেবাক করিয়া দিয়াছি। আর আমার জাজ্জ্বল্যমান স্মরণ রহিয়াছে আমি হর্ কিস্তী খাজনা দিয়াছি, এমনি একটা বাকী খাড়া করিলেই কি হইল, যা নয় তাই।" যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া গম্ভীর ভাবে দাখিলাগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, দাখিলা দেখাচ্ছলে অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরবে কি ভাবিল, পরে বিষের ন্যায় তীব্র জ্বালাময় একটু হাসিয়া বলিল "ঠাকুর, তুমি আর আমার কাছে কত চতুরতা করিয়া যাইবে।" গোপাল বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, বিস্মিত ভাবে বলিল "চতুরতাটি কি?"

যো। (মুখ বাঁকাইয়া ব্যঙ্গ স্বরে) চতুরতাটা কি? ঠাকুর উদোর আর কি, কিছু বুঝেন না! চতুরতা এই অনাথা স্ত্রীলোকের কাছে টাকা গুলো আদায় করিয়া এই সব জাল রসিদ তৈয়ার করিয়াছ। আমাদের কাছারী হইতে কি কখন সাদা রসিদ দেওয়া হয়? কি শেষ কীস্তির দাখিলা আনিয়াছে গো! এটাত আঁয়া জাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। একি! বামুন হয়ে এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন?

গোপাল কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল, তাহার আপাদ মস্তক বাত্যান্দোলিত অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কপালের শিরা সকল উন্নত হইল। তখন ক্রোধপ্রকম্পিত কণ্ঠে বলিল "বেটা জুয়োচ্চোর, আমি দাখিলা জাল করিয়াছি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই এমন কথা বলিস্, উচ্ছন্ন যাবি, নিপাত যাবি, স্ববংশে নিধন হবি, জানিস্ না"। গোপালের রকম দেখিয়া যোগেন্দ্র একটু নরম হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে খোকাবাবু কাছারি ঘরে আসিয়া পৌঁছিল এবং গোপালের বিক্রম দেখিয়া একবারে চটিয়া লাল হইল, বৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল "আরে এ ব্যেটা টিকি নাড়া বামুনের ত বড় আস্পর্দ্ধা দেখি। কাছারীতে দাঁড়াইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করে, কোন হ্যায় রে। রাম সিং, বামুনের পিঠে দুই চাবুক লাগাইয়া গলাধাক্কা দিয়া ফটকের বাহির করিয়া দেও"। হুকুম পাইবামাত্র দুই জন পশ্চিমা বরকন্দাজ বাঘের মত গোপালকে ধরিয়া ঘুসি ও লাঠীর গুঁতা মারিতে মারিতে তাহাকে ফটকের দিকে লইয়া চলিল। গোপাল একবার যোগেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "আমার দাখিলা সব ফিরাইয়া দাও।"

যো। ইঃ ভারি চালাক, এত অপমানেও চালাকি যায় না, জাল দাখিলা তোমায় আবার ফিরিয়া দিব, তোমাকে পুলিশে দিব, ফৌজদারি সোপর্দ্দ করিব, তা জান না। সেই ভয়েই বুঝি দাখিলা ফিরিয়া চাও?

গোপাল হতবুদ্ধি হইল। "আরে ফের খাড়া হোতা কাহে" এই বলিয়া বরকন্দাজ এক জন সজোরে এক ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ফটকের বাহির করিয়া দিল। খোকা বাবুর খাস খানসামা রামা নাপিতের এতক্ষণ মুখ সুর সুর করিতেছিল, গোপালের তীব্র মনকষ্টের উপর নুনের ছিটা দিবার জন্যই যেন এই সময়ে বরকন্দাজকে বলিল "আরে জোরে ধাক্কা দিওনা, যেমন হউক গ্রামের লোক, ব্রাহ্মণের ছেলে।" গোপালের

দিকে চাহিয়া বলিল "ঠাকুর তোমার কি কোন আক্কেল নাই, তুমি কি চাষাভূষা যজমানের বাড়ী পাইয়াছ, যে টিকি নাড়িয়া চোটপাট করিবে? জায়গা বুঝিয়া চোট পাট করিতে হয়, তা হইলেত আর এমন অপমানটা হতে না।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আর এক হতভাগিনী।

গোপাল আর কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু তাঁহার এরূপ মনকষ্ট হইয়াছিল যে গ্রামের ভিতরে তখন যাইতে পারিলেন না, মাঠের দিকে যাইয়া একটি নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিলেন। ক্রোধে এক একবার তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু অশক্তের ক্রোধ কোন ফলদায়ক হয় না। আবার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল—"প্রবল শত্রু, আমি দুর্ব্বল, নিঃসহায়, সুকুমারী অনাথা, এ অবস্থায় এরূপ শত্রুর সহিত মকর্দ্দমা করিলে কি ফল হইবে। গ্রামের লোক সকলেই উহার বাধ্য। আমি কি করিতে পারি। আমার একমাত্র বল ছিল রসিদ কয়েকখানি, তাহাত ছলে বলে কৌশলে কাড়িয়া লইল। আবার আমাকে বলে আমি জাল করিয়াছি, আমি সুকুমারীকে প্রতারিত করিয়াছি, হায় রে অদৃষ্ট, (কাঁদিতে কাঁদিতে আকাশের দিকে চাহিয়া) হা ভগবান, এর বিচার তুমি করিবে, হা দর্পহারী মধুসূদন, এ অত্যাচারের প্রতিবিধান তুমি করিবে। উঃ যোগেন্দ্র কি পাপিষ্ঠ! আহা অবোধ শিশু শরৎ, অনাথা বিধবা সুকুমারী, তাহাদের জীবন উপায় কয়েক বিঘা জমি আছে, পাপিষ্ঠ যোগেন্দ্রের তাহাতে লোভ হইয়াছে, সেই জন্যই এত ছল বল। আমি আর কি করিব, কোনত উপায় দেখিনা, একমাত্র উপায় ভগবান। তিনি হতভাগা হতভাগিনীর অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে। (ক্ষণেক স্থির ভাবে অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া) সুকুমারীকে কি একথা বলিব? একথা বলিলে তাহার বড় মনকষ্ট হইবে, না বলিয়াই বা ফল কি! গ্রামের সকল লোকেই একথা শুনিবে, কাহারও শুনিতে বাকী থাকিবে না।

তবে যাই এখন সুকুমারীকে যাইয়া বলি, সেই বা কি বলে দেখি"। এই রূপ ভাবিয়া গোপালচন্দ্র সে স্থান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

সুকুমারী এসমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অবিরাম অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কি সাধ্য।

ইহার পর দুই দিন অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিনে যোগেন্দ্রের সহিত সুকুমারীর পুনরায় পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট সাক্ষাৎ হইল। যোগেন্দ্র বলিল "সুকুমারী এখনও টাকার যোগাড় কর, সাত দিন তোমাকে সময় দিতেছি। আর গোপালকে বিশ্বাস করিও না। সে তোমাদের নিকট টাকা লইয়া খাজানা না দিয়া জাল রসিদ লিখিয়া, তোমাদিগকে দিয়াছে। আহা অনাথা তোমরা, তোমাদের টাকা লইয়াও পাপিষ্ঠ হজম করিয়াছে। এ কার্য্যের প্রতিফল সে সেদিন বেশ পাইয়াছে। এখনও পাবে সে চেষ্টায় আছি, তুমি আর তাহার সহিত সংস্রব রাখিও না। নিজে যেরূপে পার টাকার যোগাড় কর। আমি বরং বাবুকে বলিয়া কিছু পরিমাণ রফা করিয়া দিব"। সুকুমারী হাঁ কি না কিছু উত্তর না দিয়া নীরবে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। গ্রামে এবিষয়ে পুরুষ মহলে, মেয়ে মহলে, ছেলে মহলে সর্ব্বত্রই আন্দোলন চলিতে লাগিল। নানা জনে সুকুমারীকে নানা প্রকার সৎ পরামর্শ দিতে লাগিল। অধিকাংশ লোকেই একমত হইল যে জমিদারের সঙ্গে কোন মতে বিরোধ করা সুকুমারীর পক্ষে উচিত নয়, কতক টাকা অন্ততঃ দিয়া যাহাতে মিটিয়া যায়, নালিশ মোকদ্দমা না হয়, তাহা করা উচিত। অনেকে সুকুমারীর কাণের কাছে মুখ লইয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল "জমিদারেরই দোষ কেমন করিয়া বলি, এত অসম্ভব নয় গোপাল টাকাটা নিজে খাইয়া একটা মিথ্যে রসিদ লিখিয়া দিয়াছে, তা না হলে কি আর জমিদার এতটা করে। কাল কলি দিদি, কার মনে কি আছে, কেহ কি বলিতে পারে। সেই জন্যই বলি জমিদারের সহিত ঝগড়াটা মিটাইয়া লও"।

সুকুমারীর মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও গোপালের প্রতি ঘৃণাক্ষরেও সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু কিছু টাকা দিয়া জমিদারের সহিত বিবাদটা মিটাইয়া ফেলা যে কর্ত্তব্য এবং তদ্ভিন্ন যে আর অন্য উপায় নাই তাহা বুঝিয়াছিলেন। গোপালচন্দ্রও অবশেষে সেইরূপ পরামর্শ দিলেন। এখন টাকা পায় কোথা। সুকুমারীর দুই একখানি স্বর্ণাভরণ ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিল। গোপালও দেখিল তাহাই যুক্তিসঙ্গত। সুকুমারীর প্রতিবেশিনী কামিনী পিসি আসিয়া বলিল "দেখ সুকুমারি, যদি গহনা বিক্রয় করাই স্থির করিয়া থাক ত এক কাজ কর, যে গহনা বিক্রয় করিবে মনে করিয়াছ তাহা লইয়া বাবুদেরই বাটীতে যাও। খোকাবাবুর বউ তোমার কথা শুনিয়া আমার কাছে সেদিন কত দুঃখ করিল। আহা! মেয়েটি বড়ই ভাল। সে আমাকে বলিল যে তোমার যত টাকা আবশ্যক হইবে সে দিবে। যদি সে টাকা শোধ করিতে পার, তাহা হইলে গহনাও ফিরিয়া পাইতে পারিবে। আর বউকে একটু কাঁদিয়া কাটিয়া ধরিলে টাকাও অনেকটা কমিতে পারে"। কামিনী পিসি যখন একথা বলে, গোপাল ও অন্যান্য কএকটি স্ত্রীলোকও সেখানে উপস্থিত ছিল। স্ত্রীলোকগণ সকলেই একথার সমর্থন করিল, গোপাল বুঝিলেন কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু নিজে খোকা বাবুর কাছে যেরূপ অপমানিত হইয়াছিল তাহাতে আবার সুকুমারী যে তাহাদের বাড়ীতে যায় এবিষয় শীঘ্র তাঁহার মন সায় দিল না, কিন্তু পরে রমণীদের নির্ব্বন্ধাতিশয় জন্য সম্মত হইলেন।

এই সমস্ত কথা বার্ত্তা মধ্যাহ্ন কালে হইল। সেই দিনই বিকালে সুকুমারীর অলঙ্কার লইয়া খোকাবাবুদের বাড়ী যাওয়া স্থির হইল। সুকুমারীর অলঙ্কারের মধ্যে দুই গাছি বালা ও একছড়া কণ্ঠমালা ছিল। অভাগিনীর অঙ্গে তাহা অল্প দিনই উঠিয়াছিল। সুকুমারী এই অলঙ্কার দুই খানি অতি যত্নে একটি কৌটার মধ্যে রাখিয়াছিলেন।

এমনি মানুষের মন, এক সুখ ভাঙ্গিয়া গেলে, অমনি তাহার স্থানে আর এক সুখের আশা অঙ্কুরিত হইতে থাকে। সুকুমারী নিজে অলঙ্কার পরার সাধে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভাবিয়াছিলেন সহোদর শরতের বিবাহকালে ভ্রাতৃজায়াকে এই কৌটা শুদ্ধ অলঙ্কার দুই খানি উপহার দিবেন, শরতের বৌকে এই অলঙ্কার পরাইয়া নিজের অতৃপ্ত সাধ মিটাইবেন। সেই জন্যই আজ কৌটা খুলিয়াই সুকুমারীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, হতভাগিনীর কোন সাধই পূর্ণ হয় না ভাবিয়া আপনার অদৃষ্টকে শতধিক্কার দিলেন। অবশেষে, "শরৎ খাইয়া মাখিয়া বাঁচিয়া থাকুক বউএর গহনা অনেক জুটিবে" এইরূপ ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়া অলঙ্কার দুই খানি অঞ্চলে বাঁধিয়া বাবুদের বাড়ীর দিকে চলিলেন, এবং খিড়কীর দ্বার দিয়া খোকাবাবুদের বাড়ী প্রবেশ করিলেন।

খোকাবাবুদের বাড়ীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে তাঁহার মাতা পত্নী ও একটী দাসী, আর কেহ নাই। ব্রাহ্মণ কন্যা ব্রাহ্মণেতর জাতির গৃহে পদার্পণ করিলে এখনও বহুল সম্মান পায়। পুরুষদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভক্তি আজ-কাল যতই কম ও কৃত্রিম হউক না, পল্লীগ্রামের পুরাণ স্ত্রীলোকদের হৃদয়ে ইহা এখনও প্রবল ও অকৃত্রিমভাবে বিদ্যমান। খোকাবাবুদের বাড়ী প্রবেশ করিবা মাত্র সুকুমারী খোকাবাবুর মাতার সম্মুখে পড়িলেন। খোকাবাবুর মাতা "এস, মা এস, মা এস, বউ মা শীঘ্র বসিতে আসন দাও গো" বলিয়া সুকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি-লেন এবং তাঁহার চরণ ধুলি গ্রহণ করিলেন। খোঁকাবাবু যে সুকুমারীর উপর উৎপীড়ন করিতেছে সেজন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। খোঁকা ব্রাহ্মণ গোপালের অপমান করিয়াছে শুনিয়া অবধি তাঁহার মাতার হৃদয়ে পুত্রের ভবিষ্যদমঙ্গলাশঙ্কাপূর্ণ এক প্রবল ভয়ের উদয় হইয়াছে। তিনি সুকুমারীকে পাইয়া সন্তানের সেই অন্যায় কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনার একটি সুবিধা পাইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে

সুকুমারীকে বলিলেন "মা তুমি কিছু মনে করিও না, আমি কি করিব বলমা, আমার কথাকি ও নির্ব্বোধ একদিনের জন্যও শুনে! তাহলে আর এমন কাজ করে, আর সেই কি নিজের বুদ্ধিতে করিয়াছে, পোড়া কপাল যোগে যেন তাহাকে ভূতে পাওয়া করিয়াছে, সেই সর্ব্বনেশে যাহা বলিবে আহাম্মক তাহাই করিবে, আমি কত বলি তাহাকি শুনে, আবার সব সময়ে বলিতে সাহস করি না, অমোকেই তা হলে মারিতে আসে। আমি মা হতবুদ্ধি হইয়া কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছি। আমার মা, একটী লইয়া ঘরকরা, কত দেবতা ব্রাহ্মণের পায়ে মাথা কুঁড়িয়া ঐ এক রত্তি পাইয়া ছিলাম।
কি করেই যে ওর মঙ্গল হবে, কি করেই যে ওর ভাল দেখিয়া যাইতে পারিব জানি না। আহা তিনিত বেশ গিয়াছেন। আমি আর এত চিন্তা, এত দুর্ভাবনা সহিতে পারি না"। এই শেষ কথাগুলি বলিতে বলিতে খোকাবাবুর মাতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, অঞ্চলে চক্ষু চাপিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। সুকুমারী গম্ভীর ও বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। খোকাবাবুর পত্নী তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল।

খোকাবাবুর পত্নী একটি গৌরাঙ্গিণী ক্ষীণা, সরলা, সুকুমারীরই প্রায় সমবয়স্কা বলিকা; সে সুকুমারীর হাত ধরিয়া বলিল "এস বামুন ঠাকুরঝি আমরা ঘরের ভিতর বসিগে, মা আর কাঁদিওনা কাঁদিয়া আর কি হবে।" এই বলিয়া বধূটি সুকুমারীকে একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া গেল ও একখানি ভাল আসনে বসিতে দিল এবং নানা প্রকার গ্রামীয় সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সুকুমারীর বুকের ভিতর পাষাণ সমান বিষাদ রাশি চাপিয়াছিল, তাঁহার আর প্রফুল্লতা কোথা হইতে আসিবে। তবে বধূর যত্ন ও সজ্জনতা দেখিয়া তাহার খাতিরে দুই একবার হাসিলেন। খোকা বাবুর কর্ত্তা হইবার পূর্ব্বে সুকুমারী একবার তাহাদের

বাড়ী আসিয়াছিলেন, তখন গৃহের সাজ সজ্জা এত থাকে নাই। এখন গৃহ অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত। পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে নূতন, সুন্দর সুন্দর নানা প্রকারের কাচ, কাষ্ঠ, প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যাদিতে গৃহ পূর্ণ। সুকুমারী অন্যমনস্ক ভাবে সেইগুলি দেখিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের নাম ও ব্যবহার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বধূ আনন্দসহকারে তাহা বলিতে লাগিল, কখন বা নিজের বাক্স সিন্ধুক খুলিয়া কত সুন্দর সুন্দর ছোট বড় কৌতূহলের জিনিষ দেখাইতে লাগিল। কিন্তু সুকুমারী বধূটীর এই আনন্দের মধ্যেও একটি যেন বিষাদের ছায়া দেখিতে পাইলেন। বধূটীও তাহা অনেকক্ষণ ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না, এটি সেটি দেখাইতে দেখাইতে বলিল "ঠাকুরঝি, জিনিষ অনেক আছে, বাপের বাড়ী হইতে, শ্বশুর বাড়ী হইতে অনেক জিনিষ পাইয়াছি। খেলনা বল, সখের জিনিষ বল, ব্যবহারের জিনিষ বল, পেড়া বাক্স বল, কাপড় চোপড় বল, গহনা পত্র বল, কিছু-রই অভাব নাই। কিন্তু, এসবে কি সুখ আছে দিদি, মনের সুখ না থাকিলে, এসকল কিছুই নয়। এসব দেখিয়া হয়ত তুমি ভাবিবে আমি কত সুখী। কিন্তু আমার মত দুঃখিনী বোধ হয় জগতে নাই, আমার এক এক দিনের দুঃখের কাহিনী শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়।" এই কথা বলিতে বলিতে বধূটী আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না কাঁদিয়া ফেলিল।

সু। ছিঃ কাঁদিতে আছে, কেঁদনা ভাই কেঁদনা। সংসারে সর্ব্ব রকমে সুখী কে বল, এক রকম না এক রকম দুঃখ সকলেরই আছে। তবে যার দুঃখ ঘুচিবার আশা আছে সেই সুখী। তোমার দুঃখ ভাই, দুই দিন বইত নয়, আবার সুখ হবে, কেঁদনা"।

এই বলিয়া সুকুমারী নিজের অঞ্চলে করিয়া সস্নেহে বধূটীর নয়নাশ্রু মুছিয়া দিলেন। বৃন্তচ্যুত কুসুম কোরকের ন্যায়, উৎপাটিতা লতিকার

ন্যায়, বধূটির কাতর শীর্ণ মুখখানি দেখিয়া সুকুমারী নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। বধূটির দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। স্নেহের স্পর্শের এমনি গুণ, সুকুমারী যখন বধূর অশ্রু মোচন করিয়া দিতে লাগিলেন, বধূটি আশ্রয় জন্য যেন সুকুমারীর কোলে হেলিয়া পড়িল।

সুকুমারী ছল ছল নয়নে, তাহার ললাটের চূর্ণ কুন্তলগুলি সরাইয়া দিতে লাগিলেন। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে রহিল, পরে বধূ বলিল "ঠাকুরঝি বলচ বটে পরে সুখী হবে, কিন্তু আশাত হয় না। এত যে প্রাণপণে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করি, এত যে সাবধানে, মন বুঝিয়া চলি, কিছুতে কিছু ফল হয় না। জেলখানার বন্দীরাও বোধ হয় আমাপেক্ষা অনেক সুখে থাকে, আমার মত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় না। বিনা কারণে কত যে কটু কথা শুনিতে হয়, কটু কথা দূরে থাকুক কত যে গুরুতর আঘাত সইতে হয়, তা আর দিদি কি বলিব। রাত্রিতে যখন বাড়ীতে আসে, তখন রাত নিশুতি, আমি একলাটি তখন পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকি, তাহার পর আসিয়াই সামান্য এক ছল ধরিয়া গাল মন্দ, মারপিট করিতে থাকে। সে দিন দিদি একলাটি বসিয়া বসিয়া রাত্রি দুটো বাজিল তবু বাড়ীতে আসিল না। ঘুম না আসে সেজন্য কত চেষ্টা করিলাম কিন্তু ঘুম রাখিতে পারিলাম না। শেষে ভয় হইল যদি ঘুমাইয়া যাই আর দরজাটা খোলা থাকে, ঘরে এত জিনিষ পত্র আছে, চোর আসিলে সর্ব্বনাশ হইবে। তাই ভাবিয়া দোয়ারে খিল দিয়া বিছানায় বসিয়া রহিলাম। থাকিতে থাকিতে অজান্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। তাহার পর কখন বাড়ীতে আসিয়াছে, ডাকিয়া সাড়া পায় নাই। তখন এমন জোরে চীৎকার করিয়া দরজায় লাথী মারিয়াছিল, যে পাড়ার লোকে ভাবিয়াছিল ডাকাত পড়িয়াছে। মা উঠিয়া দু এক কথা বলাতে তাঁহাকেই মারিতে চায়, তখনত আর কাণ্ডজ্ঞান কিছু থাকে না। তিনিত ঘরে ঢুকিলেন। তাহার পর আমাকে চুল ধরিয়া মাটিতে

ফেলিয়া চোরের মার মারিল। আমি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঠিক এইখানটাতে পড়িয়া রহিলাম। তখন ঐ যে খাঁড়াটি দেখিতেছ ঐটি লইয়া আমার ঘাড়ের উপর ধরিয়া বলিল, "দেখ্, এমন করে কাঁদিবি কি এখনই কেটে ফেলিব"। আমারত রক্ত শুকাইয়া গেল। মনে মান ভাবিলাম "মা বাপ তোমারই হাতে সুঁপে দিয়াছে, তুমি এখন কাটিতেও পার রাখিতেও পার, আমার অদৃষ্টে যদি এইরূপ মৃত্যু থাকে তাহা হইলে কাটিবে"। এইরূপ ভাবিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া এই মেজেতে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া রহিলাম। যে ঘুম এতক্ষণ জ্বালাইতেছিল, তাহা আর আসিল না। সকাল বেলায় দেখিলাম সমস্ত অঙ্গে কালশিরা পড়িয়াছে ও পাকা ফোড়ার মত বেদনা বোধ হইতেছে। জ্বর আসিল। সেই জ্বর আজ সকালে মাত্র ছাড়িয়াছে। গ্রামের লোকে দিদি আমাকে হয়ত কতই সুখী ভাবে। দেখ দিদি, আমার কিরূপ সুখ। এক একবার মনে হয় আত্মঘাতী হইয়া মরি।

যখন এই কথা শেষ হইল তখন সুকুমারী ও বধূ উভয়েরই চক্ষু হইতে দর বিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। সুকুমারী কোন কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু তাঁহার মুখ কান্তিতে ও অশ্রুধারায় যে সরল ও গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা দেখিয়া বধূটি যেন অনেক সান্ত্বনা পাইল। ভা[illegible]ন সহস্র বাক্যেও এরূপ সান্ত্বনা হয় না। তখন বধূ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "ভাই তুমি নিজে দুঃখে পড়িয়া আমার কাছে আসিলে, আমি তোমার দুঃখের কথা শুনিব না আমার দুঃখের কথা শুনাইয়া তোমাকে কাঁদাইতে বসিলাম। কি করি ভাই, না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, সব কথা মনে মনে চাপিয়া রাখিয়া প্রাণ যেন হাঁপাইতেছিল। যাহা হউক, আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে, দিদি তোমার দুঃখের কথা শুনে

অবধি আমারও প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। যা অবস্থা শুন্‌লে তাহাতে আমি যে তোমার হয়ে বাবুকে দুকথা বলিব সে ভরসা আমার হয় না, আর বলিলেও যে কোন কল ফলিবে তার আশা নাই। আর কি তোমার উপকার করিতে পারি, শুনেছি তোমার কিছু টাকার আবশ্যক, তুমি নাকি সেজন্য গয়না বিক্রী করিবে। তা অন্য জায়গায় বিক্রী না করিয়া, তুমি আমার কাছে যাহা আবশ্যক লও। গহনা না দিলেও হবে। আর যদি গহনা দাওত যখন তোমাদের অবস্থা ভাল হইবে তুমি তাহা ফিরিয়া পাইবে। আমি তোমাকে গয়না না লইয়া টাকা দিতে পারিতাম। আমার ইচ্ছাও তাই। কিন্তু কি জানি ভাই কথাটা যদি প্রকাশ পায়, হয়ত আমারও মাথা যাবে তোমারও উপকার হবে না।

সু। না তাকি হয়, আমি গয়না আজই সঙ্গে আনিয়াছি; কামিনী পিসিকে তুমি বুঝি বলিয়াছিলে। এই বলিয়া সুকুমারী অলঙ্কারগুলি বাহির করিলেন।

বধূ। এ গয়না যে বেশ ভারি ভারি দেখিতেছি, দাম অনেক হবে। এই বলিয়া বধূ একটি বাক্স খুলিয়া ১৫০৲ টাকা লইয়া সুকুমারীর কৌটার ভিতর দিল এবং বলিল “আমি ভাই ১৫০৲ টাকা দিলাম, আর একখানি গয়না রাখিলাম অন্য গহনা খানি তুমি ফিরিয়া লইয়া যাও। আর এতেই বোধ হয় তোমার প্রয়োজন মিটিবে”।

ইহা সুকুমারীর আশার অতীত হইল। সুকুমারী কৃতজ্ঞতা ভাবাবশ-চিত্তে বাষ্পপূর্ণ নয়নে বধূর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া গদ্ গদ্ স্বরে বলিলেন “তুমি ভাই এ কালের মেয়ে নও। তুমি যে আমাকে কিরূপ ঋণী করিলে, তাহা বলিতে পারি না, বাবুর উপর আমার যে রাগ হইয়াছিল, তোমার গুণে তাহা অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। আহা এমন স্বর্গের দেবীও এমন হাতে পড়ে”। এই বলিয়া সুকুমারী বধূকে কোলের দিকে

টানিয়া তাহার কপোলে একটি চুম্বন করিলেন এবং পুনরায় বলিলেন "তুমি ভেবো না, তোমার পুণ্য বলে, সব ভাল হবে, এ দুর্দ্দিন কাটিয়া যাবে, আবার সুখ হবে। এখন সন্ধ্যা হয়ে এল, আমি যাই, আবার দেখা করিব"।

বধূ। এস দিদি মধ্যে মধ্যে আমার কাছে. আমি একলাটি কয়েদীর মত থাকি, মধ্যে মধ্যে তোমাদিগকে দেখিলে বড় আহ্লাদ হয়। তোমার প্রশংসার কথা সকলের মুখে শুনে তোমাকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়"। এই বলিয়া বধূ প্রণাম করিতে উদ্যত হইল।

সু। আর প্রণাম করিতে হবে না। বিনা প্রণামেই তোমাকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি যেন শীঘ্রই সুখী হও। স্বামীর সোহাগিনী হও।

বধূ একটু যেন লজ্জিতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সুকুমারী খিরকী দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহা পাপিষ্ঠা।

খোকা বাবুদের বাড়ীতে যে দাসী ছিল তাহার নাম পার্ব্বতী। পার্ব্বতীও জাতিতে নাপিত, বাবুর খাস খানসামা রামা নাপিতেরই মাসি। পার্ব্বতীর বয়স চল্লিশের উপর, ঈষৎ খর্ব্বাকার, বর্ণ পাকা আমটির মত চক্ষু এখনও ভাসা ভাসা এবং সফরীবৎ চঞ্চল, নাসিকাটি টিকল, এবং তাহার উপর তিলক সর্ব্বদা বিদ্যমান। বয়স কালে *পার্ব্বতীর পসার প্রতিপত্তি বেশই ছিল এবং এখনও বড় কম নয়।* বিবাহ বাসরে বা নূতন জামাতা সমাগমে তাহার বড় আদর, কারণ নাচিতে গাইতে, ছড়ার আবৃত্তিতে, কথার ছাঁদুনীতে, রসিকতার তরঙ্গ তুলিতে, পার্ব্বতী অতুলনীয়া। এখনও তাহার কণ্ঠস্বর যুবতীকণ্ঠবৎ মিষ্ট, এবং আমোদপ্রিয়তা যুবতীর অপেক্ষাও অধিক। পার্ব্বতী বাবুদের বাড়ীর পুরাতন দাসী, কিন্তু কি কুলগ্নে তাহার খোকা বাবুদের বউএর সঙ্গে দেখা যে একদিনের জন্যও তাহাদের বনিবনাও হয় নাই। বউ তাহাকে প্রথম হইতেই দেখিতে পারিত না, সেও বউকে দেখিয়া ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া যাইত, কেমন এক প্রকার গুপ্ত বিষময় দৃষ্টিতে বউএর দিকে তাকাইত। ইহার কারণ কি ঠিক বুঝা যায় না। শুনা যায় গ্রামের সমস্ত যুবতীকেই পার্ব্বতী এইরূপ জ্বালাময় দৃষ্টিতে দেখিত। আর কিরূপে খোকা বাবুর স্ত্রীকে অপদস্থা ও অপমানিতা করিবে এই চিন্তা ত উহার সর্ব্বদা থাকিত। খোকা বাবুর হস্তে বউএর অনেক দিনের লাঞ্ছনার মূল কারণই এই পার্ব্বতী। পার্ব্বতী বাবুর কাণে ফুস্ করিয়া কি বলিয়া দিত, আর তিনি বউএর উপর চটিয়া লাল হইতেন।

খোকা বাবুর মা নিতান্তই সে কেলে মানুষ ছিলেন, হাবা গোবা, কি জন্য কি হয় অত সাত পাঁচ বুঝিতেন না। কাজেই পার্ব্বতীর প্রতাপ বেশী ছিল। বাড়ীর গিন্নী পাকা ও একটু কড়া না হইলে এইরূপই হইয়া থাকে।

যখন বধূ ও সুকুমারী গৃহের মধ্যে কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন, পার্ব্বতী ছিম্ ছিম্ করিয়া অনেকবার সেখান দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, অনেকবার রুদ্ধ জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কর্ণ খাড়া করিয়া কি কথাবার্ত্তা হইতে-ছিল তাহা শুনিয়া গিয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় খোকাবাবুর নিকট সংবাদ দিয়াছে। টাকা দেওয়ার কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাইয়া পার্ব্বতী খোকাবাবুকে বলিল "ও খোকাবাবু এমন অলক্ষ্মীও তুমি ঘরে আনিয়াছ, তোমার যে শত্রু, বউএর সে মিত্র। তুমি চাও সুকুমারীর নিকট টাকা আদায় করিতে, আর বউ এদিকে তাহার আঁচলে রাশি রাশি টাকা ঢালিতেছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ এমন লক্ষ্মী-ছাড়া মেয়েও আমাদের বাবুর কপালে জুটিয়াছে। আবার সুকুমারীর কাছে দুঃখের কাঁদুনিইবা কত, বাবু আমাকে মারে ধরে, খেতে দেয় না, মাতলামি করে, মাকে মারিতে যায় প্রভৃতি কত কথাই যে তার কাছে বলা হ'ল। ছিঃ ছিঃ এমন নচ্ছার মেয়ে! তিলকে তাল ক'রে ঘরের কথা পরের কাছে বলা, এমনত দেখি নাই। আমরি, কি সুহৃদই এসেছে যে তার কাছে এত কথা"।

খো। কি বলে সে, আমি মাতলামি করি? আচ্ছা আজ রাত্রে এখন তাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেওয়া হ'বে।

পা। সে উঠেছে, যাব যাব কচ্চে, বিলম্ব নাই। আর থাকবে কেন আঁচলে টাকা বেঁধেছে, বামুন জাত, একবার পুঁটুলি বাঁধলে, আর বাড়ীতে তিষ্ঠায় না।

খো। আচ্ছা তুই নজর রাখিস্। আমি একবার যোগের সঙ্গে পরা-

মর্ম্মটা করি, তুই আবার এখনই আসিস্, তোর সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে। এই বলিয়া খোকাবাবু বাহিরে যাইয়া যোগেন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিল, "ওরে যোগে একটা মজা হয়েচে, সুকুমারী আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে, আর শুনিতেছি বউ নাকি তাকে কত টাকা দিয়েছে"।

যো। সত্য না কি! তবেত এইবার ঔষধ ধরিয়াছে। হাঃ হাঃ বাবা! যোগেন্দ্র বিশ্বাসের জাল এড়াইয়া যাইতে পারে এমন কোন্ বাছা আছে। তুমি এক কাজ কর, খিড়কীর পুকুরের বাগানে যাইয়া বেড়াইতে থাক, যা'তে সুকুমারী ফিরিয়া যাইবার সময় তোমার সম্মুখে পড়ে। সম্মুখে পড়িলে, একটু মিঠে স্বরে হাসিতে হাসিতে বলিবে যে, বউ তোমার কথামতই যেন তাহাকে টাকা দিয়াছে। আর খুব প্রলোভন দেখাইবে, যাও শীঘ্র যাও, সে তোমার আগেই যেন বাহির হইয়া না যায়।

খোকাবাবু সত্বর খিড়কীর উদ্যানে যাইয়া বৃক্ষান্তরালস্থ এক বেঞ্চের উপর উপবেশন করিলেন। পকেট হইতে একখানি সুবাসিত রুমাল বাহির করিয়া মুখটি ভাল করিয়া পুঁছিলেন ও হস্তদ্বারা কেশবিন্যাস করিতে লাগিলেন, ইচ্ছা হইতে লাগিল যদি একখানা দর্পণ থাকিত একবার দেখিতেন চেহারাখানা কিরূপ খুলিয়াছে। খিড়কীর বাগান দিয়া স্ত্রীলোকদের যাতায়াতের একটি পথ আছে। এই পথ দিয়া সুকুমারী শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র খোকাবাবু যোগেন্দ্রের উপদেশমত একটু হাসিয়া বলিলেন, "কি সুকুমারী টাকা পাইলেত, তোমাকে টাকা দিবার জন্য আমিই বউকে বলিয়াছিলাম। সুকুমারী, আমার হাতেই তোমার সুখ দুঃখ। আমি মনে করিলে তোমার সব দুঃখ ঘুচাইয়া, তোমাকে অট্টালিকায় বসাইতে পারি। এ সামান্য টাকা কোন ছার, কিন্তু"——

আর খোকাবাবুর কথা সরিল না। এই কথাগুলি পূর্ব্ব হইতে

ভাবিয়া রাখিয়াছিল, ইহার পর আর যোগাইল না, কি এক প্রকার ভাব আসিয়া তাঁহার জিহ্বা চাপিয়া ধরিল, মুখ লাল হইয়া উঠিল। পান্থ পথিমধ্যে বিষধর সর্প দেখিলে যেমন চমকিত হইয়া দাঁড়ায়, শিশু রাত্রিকালে অন্ধকার ছায়া দেখিলে ভূত ভাবিয়া যেমন ভীত হইয়া দাঁড়ায়, খোকাবাবুকে এইস্থানে দেখিয়া সুকুমারী সেইরূপ চমকিতা ও ভীতা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার কথা শুনিয়া সুকুমারীর মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল, পর্য্যুসিত শতদল পত্রের ন্যায় তাঁহার বদনকান্তি ম্লান হইল এবং নিস্পন্দভাবে নিম্নদৃষ্টি হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অবশেষে "আচ্ছা এখন যাও, কথাটা ভাবিয়া দেখিও" এই বলিয়া খোকাবাবু সেখান হইতে উঠিয়া বৈঠকখানায় যোগেন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। সুকুমারী দ্রুত পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। যোগেন্দ্র তৎপর খোকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, খবর কি"।

খো। খবর আর কি, কিছু বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যো। কোন কথাই বলিল না?

খো। না কেবল ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যো। সত্য নাকি, তবেত কিস্তি মাৎ। মৌনং সম্মতি লক্ষণং। চল তোমাদের মাঝের বাড়ীতে যাইয়া পরামর্শ করি। বড় সুলক্ষণ, আজকের মধ্যেই কাজ শেষ করিব। পার্ব্বতীকে ডাকাইতে হবে।

দুই বন্ধুতে আনন্দে খোকাবাবুর মাঝের বাড়ীর এক নির্জ্জন গৃহে যাইয়া বসিয়া পার্ব্বতীকে ডাকাইল। তাহাকে চুপে চুপে দুই জনে অনেক কথা বলিল। পার্ব্বতী সাহস দিয়া বলিল, "আঃ এ আর কি ভারি কাজ, এতদিন আমাকে বলিলে কোন্‌দিন সফল হইত।

সুকুমারী এদিকে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার এখন পর্য্যন্ত বাক্যস্ফুরণের শক্তি হয় নাই, মনে এক বিষম অস্পষ্ট ভয়ের উদয় হইয়াছে,

হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিতেছে, অন্তরের ভিতর কি যেন উপর দিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে, যেন প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি বার বার মনে মনে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "একি ব্যাপার, অর্থ কি, বউ আমাকে যে ভাবে টাকা দিল, তাহাতে বোধ হইল বাবু তাহার কিছুই জানে না। কিন্তু বাবু বলিল তাহারই কথামত টাকা দিয়াছে। আবার বাবু বলিল সে ইচ্ছা করিলে আমাকে অট্টালিকায় বাস করাইতে পারে, ইহার অর্থ কি! তবে কি কোন অভিসন্ধি আছে নাকি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় বেগে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইয়া বেশ মুখ-আঁধারি হইয়া আসিল। তখনও সুকুমারী বিমর্ষভাবে তাঁহার গৃহের বারান্দায় একাকিনী বসিয়া উক্তরূপ চিন্তায় মগ্ন। এক একবার সন্দেহে মন ডুবিয়া যাইতেছে, এক একবার ক্রোধ উদ্দীপিত হইতেছে, এক একবার বিষাদে হৃদয় পূর্ণ হইয়া চক্ষু দিয়া বেগে তপ্ত বারিধারা ঝরিতেছে। ভাইটি খেলাইতে গিয়াছে, এখনও গৃহে ফেরে নাই। এমন সময়ে পার্ব্বতী আসিয়া উপস্থিত হইল। সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা"?

পা। আমি গো চিন্‌তে পারবে না! এই বলিয়া পার্ব্বতী সুকুমারীর কাছ ঘেঁষিয়া বসিল ও তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া "হাসিতে হাসিতে বলিল, "বলি এখন চিন্তে পার কি?"

সু। কে গো পার্ব্বতী, কেন গো, কি খবর?

পার্ব্বতীকে দেখিয়াই সুকুমারীর প্রাণটা যেন চমকিয়া উঠিল, তাঁহার হৃদয়ে যে এক প্রকার অস্পষ্ট ভয়ের উদয় হইয়াছিল, তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। পার্ব্বতী উত্তর করিল, "খবর খুব ভালই, তোমার আজ কি সুদিন, কার মুখ দেখেই আজ উঠেছিলে, আমারও আজ খুব সুদিন, এমন সুখবর এনেচি কতইনা পুরস্কার পাব"।

সু। পার্ব্বতী তোর কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অত ঘোর ফের ছাড়িয়া স্পষ্ট করিয়া বল্ দেখি কি হয়েছে।

পা। বল্‌ব কি দিদি তোমার সব দুঃখ ঘুচিল, এত যে খাজানার দায়ে ঠেকেছিলে, সে সব দায় মিটে গেছে, তোমাকে আর কিছুই দিতে হবে না, বরং তোমার যা ইচ্ছা, বাবু তোমাকে তাই দিতে রাজি আছেন।

শত বৃশ্চিক দংশনবৎ তীব্র যাতনায় বিদ্ধ হইয়া,তত্রাচ মনের আবেগ চাপিয়া, সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন পার্ব্বতী কেন হঠাৎ আমার এমন অদৃষ্ট ফিরিল বল দেখি ?

পার্ব্বতী হাসিতে হাসিতে সুকুমারীর কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "বলবো কি দিদি ঠাকরুণ, তুমি খোকাবাবুর নয়নে লাগিয়াছ, তিনি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র দলিতফণা ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, শেলবিদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় সুকুমারী গর্জ্জন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"হারাম জাদী সুখবর এনেচ পুরস্কার পাবার জন্য এই লও পুরস্কার"। এই বলিয়া সুকুমারী একটি সম্মার্জ্জনী উঠাইয়া শরীরের সমস্ত তেজে পার্ব্বতীকে আষ্টে পৃষ্ঠে প্রহার আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী প্রহারের যাতনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বাহিরের দিকে ছুটিল। সুকুমারী সেইরূপ প্রবল বেগে প্রহার করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইলেন। পার্ব্বতী যেমন দ্রুতবেগে বাড়ীর বাহির দরজা পার হইবে, অমনি চৌকাটে হোঁচট লাগিয়া প্রবল বেগে পতিত হইল ও তাহার সম্মুখের দুইটি মিশিরঞ্জিত দন্ত ভগ্ন হইল।

যোগেন্দ্র পার্ব্বতীর অভিগমনের ফল জানিবার প্রতীক্ষায় সুকুমারীদের বাড়ীর সন্নিকটেই উপস্থিত ছিল, গোলযোগ শুনিয়া "কি হইল কি হইল" বলিয়া ছুটিয়া আসিল ; বাহির দরজার নিকটে আসিয়া দেখিল

পার্ব্বতী পতিতা ধূলিধূসরিতা। যোগেন্দ্রকে দেখিয়া পার্ব্বতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দেখ সুকুমারী আমার কি দুর্দ্দশা করেছে, ঝাঁটায় আমার হাড় পিষিয়া দিয়াছে, দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে"। যোগেন্দ্র মহাক্রোধে আস্ফালন করিতে করিতে সুকুমারীর বাড়ী প্রবেশ করিল এবং সুকুমারীর সম্মুখে যাইয়া বলিল "কি সুকুমারী তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা! তুমি বাবুর বাড়ীর চাকরাণীকে এত অপমান কর।" সুকুমারী তখনও সেই সম্মার্জ্জনী হস্তে গৃহের দাওয়ার কিনারায় একটি খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতেছিলেন, যোগেন্দ্রের কথা শুনিবা মাত্র, দ্বিগুণতর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,"আমার এত বড় আস্পর্দ্ধা না তোর এত আস্পর্দ্ধা রে নরাধম" এবং নিমেষের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে যোগেন্দ্রের শিরে পাঁচ ঘা ঝাঁটা মারিয়া ফেলিলেন। যোগেন্দ্র চমকিত হইয়া ও মাথার যাতনায় অস্থির হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সুকুমারী আবার বলিলেন "এই মুহূর্ত্তে আমার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যা, না হলে এই ঝাঁটায় তোর পাপ মুখে রক্ত উঠাইয়া ছাড়িব"। এই বলিয়া সুকুমারী আলুলায়িত কেশে বিক্ষিপ্তবেশে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে যোগেন্দ্রের দিকে আবার ধাবিতা হইলেন। সিংহিনীর সম্মুখে শৃগাল কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? যোগেন্দ্র উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইল। ক্রমে পাড়া পড়শী পাঁচ জন আসিয়া জুটিল এবং কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সুকুমারী কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না এবং সে সময়ে বলিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। গোপাল আসিলে কেবল সুকুমারী তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিলেন। গোপাল সকল কথা শুনিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমি সেই সময়েই বলিয়াছিলাম ও পাপিষ্ঠদের সংস্পর্শে যাইবার দরকার নাই, সকলই অদৃষ্টের ফল"।

সে রাত্রে গোপাল সুকুমারী ও যোগেন্দ্র কেহই নিদ্রা যায় নাই। গোপাল সমস্ত রাত্রি বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছিলেন যে এই বার

খোকাবাবু ও যোগেন্দ্র তাহাকে ও স্নুকুমারীকে বিনষ্ট করিবে। স্নুকুমারী পদদলিতা ফণিণীর ন্যায় অপমান জন্য অভিমানে সমস্ত রাত্রি কেবল তপ্তশ্বাস ফেলিয়াছিলেন ; ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গল ভাবিবার ক্ষমতা সে দিন তাঁহার থাকে নাই। যোগেন্দ্র সমস্ত রাত্রি কেবল প্রতিহিংসার উপায় চিন্তা করিয়াছিল, এবং শেষ রাত্রে মনে মনে বলিয়াছিল "স্নুকুমারী তুমি যোগেন্দ্র বিশ্বাসের মাথায় ঝাঁটা মারিলে, আচ্ছা দেখা যাবে, তোমাকে বেজেতের হাতে বেচিয়া না আসি ত আমার নাম বদলাইয়া রাখিবে"।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুলিস তদন্ত।

পর দিন গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; গৃহে গৃহে, পথে ঘাটে, সভায় মজলিসে, কেবল এই একই কথাবার্ত্তা। গ্রামে সে দিন মজলিসের সংখ্যাই বা কত। আবার পুরুষ মজলিস্ অপেক্ষা স্ত্রী মজলিসেই আন্দোলনের তরঙ্গ প্রখরতর। কোন মহিলা সম্মার্জ্জনী হস্তে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতে করিতে বলিতেছে "বেশ হয়েছে, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর"। কোন মহিলা বা এই ঘটনার সমালোচনা করিতে করিতে দগ্ধ চাটুকড়াই মার্জ্জনার কষ্টকারিতা ভুলিয়া গিয়া, গালে হাত দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া জীব্ কাটিয়া বলিতেছে "বাপ, মেয়ে মানুষের কি বুকের পাটা যা হউক, যার মাটিতে বাস তারই লোককে এত অপমান করে, একবার ভাব্‌লে না পরে কি হবে? আজ এখন কি হয় বল দেখি, সকাল না হইতে হইতেই যমদূতের মত দুইজন সর্দ্দার যাইয়া সদর খিড়কী বন্ধ করিয়া বসিয়াছে, আর বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপায় নাই"। এইরূপ দুই প্রকার মতের সংঘর্ষণ চলিতেছে, একপ্রকার সুকুমারীর অনুকূল, এক প্রকার তাহার প্রতিকূল। ইহাই সংসারের নিয়ম। কি সামান্য পল্লি গ্রামে, কি প্রকাণ্ড নগরীতে, লোকের দৈনিক কথা বার্ত্তায়, ভাব চিন্তায়, কায কর্ম্মে. অনেক সময়ে যে সজীবতা দেখা যায় দুই মতের সংঘর্ষণই তাহার মূল। দুই মত না থাকিলে অনেকের অনেক দিনের জীবন নিতান্ত শীতলতাময় ও ভারস্বরূপ হইত। আর যিনি যতই সদাশয় ও পবিত্র চরিত্রের হউন না কেন, সংসারে প্রতিকূল সমালোচনার হাত এড়াইতে কখনই পারিবেন না।

ক্রমে দিবা যত অগ্রসর হইতে লাগিল রবিতাপের সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারীর কার্য্যের সমালোচনা তীব্রতর হইতে লাগিল। প্রথমতঃ লোকে পূর্ব্বদিনের ঘটনাটি মাত্র শুনিয়াছিল, তাহার কারণ কি তাহা অবগত হয় নাই। ক্রমে সেই কারণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত গ্রামে প্রচার হইয়া গেল যে গতকল্য সুকুমারী বাবুদের বাড়ী বেড়াইতে যায়, বাবুদের বউ তাহাকে বাকস্ খুলিয়া জিনিষ পত্র দেখাইতে থাকে, সেই সময়ে সুকুমারী এক থলি টাকা ও কয়েক খানা সোণার অলঙ্কার চুরি করিয়া লইয়া যায়। পার্ব্বতী গোপনে এই বলিবার জন্য এবং কোন গোল মাল না করিয়া চুরির মাল ফিরিয়া লইবার জন্য সুকুমারীর নিকট যায়; সুকুমারী ইহাতে রাগান্বিত হইয়া তাহাকে ও পরে যোগেন্দ্রকে প্রহার করে। বাস্তবিকই যোগেন্দ্র এইরূপ সংবাদ রটাইয়া, খোকাবাবুর ভৃত্য রামানাপিতের দ্বারা পুলিসে ইত্তেলা পাঠাইয়াছে, এবং চোরাই মাল অন্যত্র নীত না হইতে পারে, সেই জন্য সুকুমারীদের সদর খিড়কী বন্ধ করিয়াছে। ভাল অপেক্ষা মন্দ কথা শীঘ্র প্রচার হয় এবং সাধারণতঃ লোকে মন্দ কথাটাতেই অগ্রে বিশ্বাস করে। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সুকুমারীর চোর অপবাদ গ্রাম মধ্যে বিলক্ষণ প্রচার হইয়া গেল। কি কারণে সুকুমারী পার্ব্বতীকে ঝাঁটা মারিয়াছিল, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ না থাকায়, এবং জিজ্ঞাসা করিলে সুকুমারীর ক্রোধ ও অভিমানের ভরে স্পষ্ট উত্তর না দেওয়ায়, অনেকেই এ অপবাদ বিশ্বাস করিল। গ্রামের সন্নিকটেই থানায় চুরির সংবাদ পৌঁছিল। তীক্ষ্ণমতি দারগা তখনই বুঝিল এ মকর্দ্দমায় কিছু রস আছে। কালবিলম্ব না করিয়া বেলা এক প্রহর না হইতে হইতেই দারগা বাবু দুইজন কনেষ্টবল সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। গ্রামে হুলস্থুলও বৃদ্ধিপাইল। বাহাড়ম্বরের অনেকটা বিশ্বাসজনয়িত্রী শক্তি আছে। লোকজন, পুলিস পাহারা, চৌকিদার কনষ্টবল প্রভৃতি

দেখিয়া এক এক জনের দৃঢ় প্রতীতি হইল সুকুমারী নিশ্চয়ই চুরি করিয়াছে। কল্পনা বিশ্বাসেরই অনুগামিনী। যাহারা পূর্ব্বদিন সুকুমারীকে খোকা বাবুদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছিল তাহারা সে সময়ে হয় ত কিছুই লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু আজ তাহাদের কল্পনা বলিতে লাগিল সুকুমারী যেন বস্ত্র ঢাকা দিয়া কি আনিতেছিল, যেন চোরের মত ভয়ে ভয়ে এদিকে ওদিকে তাকাইতেছিল। তাহারা পরস্পরের মধ্যে এই সকল কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

এদিকে দারগার তদন্তের আয়োজন আরম্ভ হইল। কনেষ্টবল দুইজন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের চৌকিদার জমা করিতে লাগিল, দুই একজনের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তখন তখনই উত্তম মধ্যম শিক্ষা কিছু হইয়া গেল। দারগা বাবুর পান ভোজনের ব্যবস্থা যে অতি সুন্দর রূপেই হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। যোগেন্দ্র স্বয়ং সে সকলের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। আহারান্তে দারগা বাবু চৌকীদারগণকে সাক্ষী সাবুদ ঠিক করিয়া রাখিবার আদেশ দিয়া এক নির্জ্জন গৃহে বিশ্রাম করিতে প্রবেশ করিল, সেখানে দুই একটি লোককে ডাকাইয়া গুপ্ত ভাবে কি কি জিজ্ঞাসা করিল, তৎপরে চুপ্ চাপ্ বিশ্রাম করিতে লাগিল। বেলা অপরাহ্ণ হইল তখনও দারগার বিশ্রাম আর শেষ হয় না। যোগেন্দ্র কিছু ব্যস্ত হইল এবং দারগাকে আসিয়া তাগিদ দিয়া বলিল "দারগা বাবু, বেলা শেষ হবে, তদন্ত আরম্ভ করুন।" দারগা গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "ভারি মকদ্দমা, তার আবার তদন্ত, এত তাড়াতাড়ি কেন হে, সন্ধ্যা হউক তার পর দেখা যাবে।" যোগেন্দ্র দারগার কথার অর্থ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ খোকা বাবুকে যাইয়া বলিল, "কিছু না বাহির করিলে ত তদন্ত হয় না।"

খোকা। কত চাই?

যো। একশতের কম ত আর দেওয়া যায় না।

খোকা। যত চাই দাও, পাজী বেটীকে যেমনে হউক জব্দ করা চাই ত ; যখন তাকে কনেষ্টবলে কাছারীতে ধরিয়া আনিবে, আমাকে একবার খবর দিও।

যোগেন্দ্র খোকাবাবুর নিকট একশত টাকা লইয়া পঞ্চাশটি নিজে কবলিত করিল এবং ২৫টি এক করচে রাখিয়া বাকী ২৫টি হাতে লইয়া দারগার ঘরে প্রবেশ করিল এবং দারগার নিকট তাহা রাখিয়া বলিল, "বেলা একবারে শেষ হইয়াছে আর না উঠিলে হয় না।" দারগা একবার চক্ষু খুলিয়া কি পরিমাণ টাকা দেখিল এবং পুনরায় নিদ্রার ভাণ করিয়া চক্ষু বুজিয়া তাচ্ছল্যের ভাবে বললেন, "এতে কি এ মোকদ্দমার তদন্ত হয়।" সুতরাং যোগেন্দ্রকে অগত্যা করচের ২৫টি টাকাও বাহির করিতে হইল। দারগা তখন উঠিয়া বসিল এবং রৌপ্য খণ্ডগুলির সুব্যবস্থা করিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে তখন অনেক লোক জমা হইয়াছে। দারগা প্রথমেই দুই একজন চৌকিদারকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিল। জনতার মধ্যে অনেক লোকে নালিস করিল যে তাহারা ঘটনার কিছুমাত্র জানে না অথচ তাহাদিগকে সকাল বেলা হইতে ধরিয়া রাখিয়াছে ; এ পর্য্যন্ত তাহারা স্নান আহার কিছুই করিতে পারে নাই। প্রত্যুত্তরে তাহারাও দারগা বাবুর কিছু কিছু মিষ্ট বুলি শুনিল। দুই একজন দারগা বাবুর সহিত তকরার করিতে সাহসী হওয়ায় চড়টা চাপড়টাও দুই এক ঘা খাইল। এ দারগাটি কিছু রোকাল, বেশ তেজের সহিত কাজ কর্ম্ম করে, এবং সে জন্য উপরওয়ালাদের নিকট বেশ প্রতিপত্তি আছে।

অতঃপর দারগা তদন্ত আরম্ভ করিল এবং যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল আপনাদের মোকদ্দমার বাদী কে? যোগেন্দ্র উত্তর করিল, "এত চুরির মোকদ্দমা, সরকার বাদী হবে।"

দা। আঃ, ভাল আইন শেখাতে এলেন আমাকে। সরকার বাদী হইলেও একজনকে ত নালিশ করিতে হইবে। কাহার মাল চুরি হইয়াছে?

যো। মাল ত আমাদের বাবুর পরিবারের চুরি হইয়াছে।

দা। কখন, কিরূপে ?

যো। কাল বেলা ৪টার সময়। তিনি বাক্স খুলিয়া আসামীকে দ্রব্যাদি দেখাইতেছিলেন সেই সময়ে আসামী অলঙ্কার ও টাকা বাক্স হইতে চুরি করে।

দা। তাহা হইলে ত বাবুর পরিবারই হইতেছেন বাদিনী। তিনি এজাহার না দিলে ত মোকদ্দমা চলিবে না। আর দিনের বেলায় তাঁহার সমক্ষে চুরি হইয়াছে তিনি একজন প্রধান সাক্ষী।

যো। সে কি দারগা বাবু! তিনি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, তিনি কিরূপে সাক্ষী হইয়া মকদ্দমায় এজাহার করিবেন ?

দা। তবে আপনাদের মকদ্দমা থাক্। তাঁর এজাহার না হইলে মকদ্দমা আদৌ চলিতে পারে না, আমি প্রথমেই বুঝিয়াছি আপনা-দের মকদ্দমা কিছুই নয়, কেবল একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া।

এই বলিয়া দারগা বাবু মুখখানা বাঁকাইয়া গম্ভীরভাবে যোগেন্দ্রের বিপরীত দিকে তাকাইয়া রহিল। যোগেন্দ্র বলিল, "কেন মশায়, আমাদের যদি অন্যান্য সাক্ষী ভালরূপ থাকে, তাহা হইলে একজন সাক্ষী না দিলে কি আর মকদ্দমা চলিবে না ?"

দা। বলি একজনকে ত চোরাই মালের দাবি করিয়া বাদী হইতে হইবে। তা সে হয় আপনাদের বাবুর স্ত্রী, না হয় আপনাদের বাবু স্বয়ং হইতে পারেন, আর কেহ নয়। যদি তাঁরা অসম্মত হন আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন, আমি চলিয়া যাই। আর কেন আপনারা একজন স্ত্রীলোকের নামে বৃথা চুরির অপবাদ দিয়া একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে অনর্থক ক্লেশ দিলেন তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ত না দিতে পারিলে

আপনাদের নামে মিথ্যা নালিশ করার অপরাধে মকদ্দমা চলিবে। সে সব বুঝিয়া কাজ করুন।

দারগার কথার মর্ম্ম বুঝিতে যোগেন্দ্রের কিছু বাকী রহিল না। যোগেন্দ্র কিছু চিন্তিতভাবে খোকা বাবুর সমীপে আসিল। খোকা বাবু তখন তাঁহাদের মাঝের বাড়ীর গৃহে নিজের খাস কামরায় দুই চারি জন মসাহেব বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। তাহারা সকলেই আজ খোকা বাবুর প্রভূশক্তির প্রশংসা করিতেছে। আজ যে গ্রামে চারিদিকে পুলিশ পাহারা লালপাকড়ী লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গ্রামে যে একটা হুলস্থুল পড়িয়াছে এবং আবালবৃদ্ধ সকলেরই মনে যে আজ একটা উদ্বেগমিশ্রিত ভয়ের উদয় হইয়াছে, এ সমস্তই তাহারা খোকাবাবুর অপরিমেয় শক্তি, সম্মান ও বাহাদুরীর পরিচায়ক বলিয়া বর্ণনা করিতেছে। এক জন খোকাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া অপরকে সন্তোষ করিতে হইলে অনেকে যেরূপ শুষ্ক চর্ম্ম কুঞ্চন মাত্র হাসি হাসিয়া থাকে, সেইরূপ একটু হাসিয়া, অধিক কৃত্রিমতা ও চতুরতার যে লক্ষণ কথা বলিবার সময় ঘনঘন চক্ষু টেপা, সেইরূপ দুই একবার চক্ষু টিপিয়া, বলিল, "দেখুন খোকাবাবু এই সমস্ত পুলিশ পাহারা লালপাকড়ী দেখিয়া মেয়েটার যে ভয় হইয়াছে, তাহার পেটের ভাত একেবারে চাল হইয়া গিয়াছে; আমি সংবাদ পাইলাম আজ আর তাহার হাঁড়ী চড়ে নাই।" অপর একজন হুঁকা হইতে মুখ উঠাইয়া, ষ্টীম ইঞ্জিনের চিমনীর মত প্রবল বেগে একমুখ বাষ্প উদ্গীরণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "দেখ শৃগাল হয়ে সিংহকে লাথী মারা, এ ত বড় সহজ কথা নয়, ইহার ফল পাইতেই হইবে।" তৃতীয় এক ব্যক্তি,—একটি প্রবীণ বয়স্ক, স্থূলকায় ব্রাহ্মণ, অনেক সময়ে গ্রামের ব্যবস্থাদাতা—তামাকু সেবনের জন্য একটি জামপাতার নল তৈয়ার করিতে করিতে, পূর্ব্ববক্তা অপেক্ষা কিছু অধিক গাম্ভীর্য্যসূচক স্বরে বলিল, "ওহে দেখ শাস্ত্রে বলে বলবানের সহিত

বিগ্রহ "বিনাশায়" অর্থাৎ বিনাশের হেতু। মেয়েটার নাকি নিতান্ত কুগ্রহ; বিনাশের কাল আগত প্রায়, তাই এমন কাজ করিয়াছে। জমীদার রাজার স্বরূপ, তাহাতে আবার আমাদের জমীদার দয়া দাক্ষিণ্যাদি সর্ব্বগুণশোভিত, তাঁহার সহিত বিরোধ! আরে বাপ্‌রে! আর কি জান বংশের দোষে এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয়। শ্রীরাম মুখুর্য্যে লোকটা ত ভাল ছিল না, অতিশয় হিংস্রক-প্রকৃতি ছিল, আমি গ্রামের অধ্যাপক, এবং সভাপণ্ডিত এই কারণ সর্ব্বদাই আমার কুৎসা করিত। তাহার ঔরসের কন্যা আর কত ভাল হইবে। আবার সেইরূপ মন্ত্রীও জুটিয়াছে, গোপাল।"

খোকাবাবু এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইতেছেন, অথচ মনে মনে একটু ভয়ও আছে। লুক্কায়িত ভাবে সেই জন্যই তিনি মাঝের বাড়ীর খাসকামরা ছাড়িয়া আজ বাহির বাড়ী বা কাছারী বাড়ী যান নাই। সেখানে যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতা চলিতেছে ঠিক সেই সময়ে যোগেন্দ্র বিমর্ষভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। খোকাবাবু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে যোগেন্দ্র, কি সংবাদ?" যোগেন্দ্র বলিল, "সংবাদ বড় ভাল নয়। দারগা ত সহজে তদন্ত করিতে রাজি হয় না।" ইহা শুনিয়া তত্রস্থ সকলেই একবারে বলিয়া উঠিল, "সে কি, এত বড় সঙ্গীন মকদ্দমা তদন্ত করিতে রাজি হয় না?" যোগেন্দ্র বলিল, "তা কি করা যায়, পুলিশের লোক, জোর করিয়া ত আর কিছু বলিতে পারি না। খোকাবাবু তোমার সঙ্গে গোপনে একটা কথা আছে।" খোকাবাবু সকলকে একবার বাহিরে যাইতে বলিয়া আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা যোগেন্দ্র?"

যো। দারগা বেটা বলে কি যে হয় বাবুর পরিবার না হয় বাবু নিজে বাদী না হইলে মকদ্দমা চলিবে না এবং মকদ্দমার তদন্তও সে করিবে না।

খোকাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি বাদী হতে রাজী আছি।"

যো। এমন কাযও করে। (খোকাবাবুর কাণের নিকট মুখ লইয়া) বলি আমরা ত জানিতেছি মকদ্দমাটা কি। এখন কিসে কি দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা কি, হয়ত অবশেষে আসল কথাই প্রকাশ পেয়ে যাবে। এ রকম ব্যাপারে কি হাতে কলমে ধরা দিতে আছে। যা শত্রু পরে পরে। অপর লোক দিয়া নালিশ করাইয়া যতদুর হয়।

খো। তা হলে যে মকদ্দমা চলিবে না বলিতেছ?

যো। কে বলিল মকদ্দমা চলিবে না। মনিবের ঘরে চুরি হইলে চাকর দিয়া নালিশ চলে না?————দারগা আবার আমার কাছে চালাকি করিয়া যাইবে?

খো। দারগা যদি তা হলে তদন্ত না করে?

যো। হুঁ, তদন্ত করবে না তার বাপ করিবে। তার কথার ভাব বুঝিলে না? আরও কিছু দক্ষিণা চায়।

খো। কত চায়?

যো। খাঁই কিছু বেশী। যে রকম বেঁকিয়া দাঁড়িয়েছে পাঁচ শত টাকার কম ত আর বলা যায় না। বেটা বোধ হয় এরই মধ্যে আসল কথা টের পাইয়াছে, বলে কি তোমার ও আমার নামে মিথ্যা নালিশ করার জন্য মকদ্দমা চালাইবে।

খোকাবাবুর হৃদয়ের লুক্কায়িত ভয় যেন জাগিয়া উঠিল। মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, এবং ত্রস্তভাবে বলিল, "ওহে বেটা যা চায় তাই দিয়ে রাজি কর, না হলে বেটা গোলমাল বাধাবে। আর একটা বেওয়া স্ত্রীলোক যদি আমার এত দূর অপমান করিয়াও কোন শাস্তি না পায় তবে বড়ই দুঃখের কথা। যোগেন্দ্র যত খরচ হয় হউক, তুমি মকদ্দমা যাহাতে ভালরূপ চলে সে বিষয়ে বিশেষ তদ্বির কর, এই লও তোমাকে ৫০০৲ শত টাকা দিতেছি।"

এই বলিয়া খোকাবাবু বাক্স খুলিয়া পাঁচ খানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া দিল।

যোগেন্দ্র পুনরায় তিনখানি গোপন করিয়া দুইখানি দারগার হস্তে দিল। দারগা তখন প্রফুল্লচিত্তে আগ্রহের সহিত তদন্ত আরম্ভ করিল। যোগেন্দ্র বৃদ্ধা পার্ব্বতীকে আনিয়া বাদিনী খাড়া করিল। তাহার এজেহার মত দারগা সুকুমারীকে খোকাবাবুর স্ত্রীর বাক্স হইতে টাকা ও অলঙ্কার চুরি করার ও পার্ব্বতী তাহাকে মাল সহিত ধরিলে তাহাকে গুরুতর জখম করিয়া তাহার দন্ত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অপরাধে অপরাধী করিয়া প্রথম এত্তেলা পূরণ করিল এবং সাক্ষী প্রমাণাদি গ্রহণ করিল। ঘটনা সুন্দররূপ প্রমাণ হইল। অবস্থার সাক্ষী, প্রত্যক্ষ দর্শনের সাক্ষী প্রভৃতি সকল প্রকারের সাক্ষীই প্রচুর পরিমাণে মিলিল। যোগেন্দ্র স্বয়ং পার্ব্বতীকে জখম করার প্রত্যক্ষ দর্শনের সাক্ষী হইল। সে দিন টেড়ি বাগাইবার সময় যোগেন্দ্র মাথায় বেশ বেদনা অনুভব করিয়াছিল; মাথাতে কিছু ফুলাও ছিল, পাঁচ ঘা ঝাঁটার বিষ ত বড় কম নয়। কিন্তু যোগেন্দ্র নিজে মার খাওয়ার কথাটা একবারে গোপন করিয়া আর সকল কথাই বলিল। পার্ব্বতীর এজেহার হইতে এরূপ প্রকাশ পাইল যে সুকুমারী চোরাই টাকা ও অলঙ্কার একটা কৌটা শুদ্ধ লইয়া যে সময় তাহার ঘরের দাওয়ায় উঠিতে যাইবে ঠিক সেই সময় পার্ব্বতী সেই খানে পৌঁছিয়া তাহাকে সেই মাল সহিত ধরে। সুকুমারী নিরুপায় হইয়া সেই কৌটা উঠানের এক কিনারা দিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং তৎপরে ঝাঁটা লইয়া আক্রমণ করে, সুতরাং পার্ব্বতী আর সে টাকা লইয়া আসিবার অবকাশ পায় নাই। দারগা বাবু এই সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পরে আসামী সুকুমারীকে কাছারিতে আনিবার জন্য কনেষ্টবলদ্বয়কে পাঠাইয়া দিল।

সুকুমারী আজ সমস্ত দিন স্বগৃহমধ্যে নিরুদ্ধ থাকিয়া বিবরস্থিতা

ক্রুদ্ধা সর্পিণীর ন্যায় তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বাস্তবিকই আজ তাঁহার আহার নিদ্রা হয় নাই। গোপাল অনেক করিয়াও আজ তাঁহাকে একমুঠা অন্ন খাওয়াইতে পারে নাই। তাঁহার আকর্ণায়ত লোচনদ্বয় রক্ত জবার ন্যায় লাল হইয়াছে; সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন অগ্নি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ক্রোধ, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি অনেক প্রবল ভাব যুগপৎ তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে এমন সময় কনেষ্টবল দুই জন সুকুমারীকে লইতে আসিল, এবং বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া কে আছ বলিয়া ডাকিল। গোপাল সুকুমারীদের বাড়ীতে ছিলেন। ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। গোপাল আজ ভয়ে সমস্ত দিন হাত পা হারা হইয়াছিলেন, কি করিলে কি হইবে, কি করা উচিত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সুকুমারীকে কাছারিতে ধরিয়া লইবার জন্য যখন লোক আসিল, তখন কিন্তু তাঁহার মনে প্রচণ্ড ক্রোধের উদয় হইল। কিন্তু সে ক্রোধ সহ্য করিয়া থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে যোড়হস্তে একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন, এ বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ তুমিই দেখাইয়া দাও।" তাহার পর কনেষ্টবলদ্বয়ের হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাপুরা, তোমরাও মানুষ, তোমাদের ও রক্ত মাংসের শরীর; রক্ষা কর, বিনা অপরাধে এই গরীব অসহায় ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার করিও না। এই অনাথা বিধবাকে……অপমান করিয়া কাছারিতে লইয়া যাইও না।"

কনেষ্টবল। আমরা কি করিব মশায়, আমাদের কি হাত আছে, আমরা কেবল দারগার হুকুম তামিল করি।

গো। আচ্ছা চল, তাহার পরিবর্ত্তে আমি যাইতেছি।

কনেষ্টবলগণ গোপালের ভাব দেখিয়া কিছু কোমল হইল, এবং নরম স্বরে বলিল, "তুমি যাইলে মশায় কি হইবে? তুমি ত আর

আসামী নও, দারগা বাবু আসামীকে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।”

গো। আচ্ছা, দারগা বাবু এই বাড়ীতে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করুন। তিনি ত একবার এই বাড়ীটে দেখিলেও ত অনেক বুঝিতে পারিবেন।

কনেষ্টবল। আচ্ছা চল, তোমাকেই প্রথম দারগা বাবুর কাছে লইয়া যাই, তার পর তিনি যা হুকুম দেন।

গোপালের অনুনয়ে ও সরেজমিনে দেখিবার ইচ্ছায় দারগা, পার্ব্বতী ও যোগেন্দ্র এবং অন্যান্য লোক লইয়া সুকুমারীদের গৃহে আসিল এবং কোথায় পার্ব্বতী সুকুমারীকে ধরিয়াছিল এবং কেমন স্থানে সে টাকার কৌটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় তাহা পার্ব্বতীকে দেখাইতে বলিল। পার্ব্বতী উঠানের পার্শ্বস্থ এক জঞ্জালময় স্থান দেখাইয়া দিল। একজন কনেষ্টবল একটা তীব্র আলোক লইয়া সেই স্থানের ধূলাগুলি ঠেলিয়া ঠেলিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে ২টী টাকা পাওয়া গেল। সকলেই চমকিত হইল। দারগা তখন পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, টাকা সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল কি না? পার্ব্বতী উত্তর করিল যে, একটা কাপড়ে বাঁধা কৌটা এই দিকে সুকুমারী ছুড়িয়া দিয়াছিল, ঝনাৎ করিয়া একটা শব্দ হইয়াছিল, তবে সমস্ত টাকা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল কি না তাহা সে বলিতে পারে না। দারগা গোপালকে তখন আসামীকে সম্মুখে আনিবার জন্য হুকুম দিয়া একটি চৌকির উপর বসিল। সুকুমারী ঘরের ভিতর ছিলেন। বালক শরৎ তাহাদের বাড়ীতে এত গোলমাল দেখিয়া এবং একটা যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া এই সময় কাঁদিতেছিল। সুকুমারী “ভয় কি দাদা, আমরা থাকিতে তোমার কি ভয়?” এই বলিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া চুম্বন করিয়া তাহার চক্ষের জল মুছিয়া দিতেছিলেন। সুকুমারীর নিজের চক্ষু কিন্তু জলে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। এই সময়ে গোপাল ঘরের ভিতর আসিয়া শুষ্কমুখে কাতর

স্বরে, ছলছল নয়নে বলিল, "দিদি সুকুমারী,একবার বাহিরে না আসিলে হয় না, দারগার কাছে জবাব দিতে হবে।" সুকুমারীর নয়নদ্বয়ে যে জলবিন্দু জমিয়াছিল, দুইটি ধারা হইয়া তাহা পতিত হইল। সুকুমারী তাহা অঞ্চলে মুছিয়া, শরৎকে গোপালের নিকট দিয়া, মনের আবেগ চাপিয়া ধীরভাবে অবনতমুখে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই ধীর স্থির গম্ভীর দীপালোকোদ্ভাসিত, দেবকন্যাপ্রতিম মূর্ত্তিটি দেখিয়া দারগা যেন চমকিত হইল। আসামীর প্রতি যেরূপ কর্কশ ব্যবহার করা পুলিশের লোকে কর্ত্তব্য ভাবিয়া থাকে, এ আসামীর প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা দারগার অসম্ভব বোধ হইল; বরং একটা সম্ভ্রমের ভাব তাহার মনে আসিল, এবং মনে মনে বিতর্ক হইতে লাগিল, এ রকম লোকে কি চুরি করিতে পারে? তৎপরে সুকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাল বিকালে বাবুদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন?"

সু। গিয়াছিলাম।

দা। খোকা বাবুর স্ত্রী আপনাকে বাক্স খুলিয়া জিনিষপত্র দেখাইয়াছিল?

সু দেখাইয়াছিল।

দা। আপনি সেই সময় ১০০ টাকা ও দুই খানি সোণার অলঙ্কার একটা কৌটা শুদ্ধ লুকাইয়া লইয়া আসিয়াছেন?

সু। না, কখন না।

দা। কাল ঠিক সন্ধ্যার সময় এই পার্ব্বতী আপনার বাড়ীতে আসিয়াছিল?

সু। আসিয়াছিল।

দা। সে আপনাকে ধরিলে আপনি একটা টাকার কৌটা এই স্থানে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিলেন?

সু। সে আমাকে ধরে নাই। আমি টাকা সহিত কৌটা ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

দা। সে কৌটা কৈ?

সুকুমারী ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর যাইয়া কাপড়ে বাঁধা কৌটাটি পূর্ব্বদিন ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবার পর যে অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থায় লইয়া আসিলেন। কৌটাটি আঘাতে একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বাঁধনের কাপড়টিও কতকটা খুলিয়া গিয়াছিল। দারগা কৌটাটি লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া খুলিয়া দেখিল, অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে ভাবিল; পরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কৌটা কার?"

সু। আমার।

দা। এ কৌটার টাকা কাহার?

সু। টাকা কাল আমি খোকাবাবুর স্ত্রীর নিকট হইতে আনিয়াছি।

দারগার এই সময়ে মনে হইল "ঘটনা ত তবে সত্য দেখিতেছি।" যোগেন্দ্রও এই সময়ে কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে বলিল, "সত্য ঘটনা, এ কি ঢাকিবার যো আছে।" দারগা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "খোকাবাবুর স্ত্রীর নিকট হইতে আপনি কিরূপে টাকা আনিলেন?"

সু। আমি অলঙ্কার বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া টাকা আনিতে গিয়াছিলাম। খোকাবাবুর স্ত্রী দয়া করিয়া একখানি মাত্র অলঙ্কার লইয়া আমায় ১৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন। এই কৌটার টাকা সেই টাকা। দারগা ভাবিল, "তাও কি কখন হয়, তাহার স্বামীর সহিত এত শত্রুতা!" এবং পুনরায় বলিল, "কি অলঙ্কার বন্ধক দিতে গিয়াছিলেন, তাহা কৈ আনুন দেখি?" সুকুমারী আপনার বালা দুই গাছি লইয়া আসিল। দারগা তাহা হাতে লইয়া পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ

এই তোমার বাবুর স্ত্রীর অলঙ্কার কি না ?" পার্ব্বতী এজেহারে বলিয়াছিল চিক ও অনন্ত চুরি গিয়াছে, সুতরাং এ সব গয়না চুরির মাল নয় বলিতে হইল। দারগা সুকুমারীকে তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি টাকা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন কেন ?"

সু। পার্ব্বতী আমাকে অসহ্য কথা বলে, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইল এই টাকা আমায় কোন কু-অভিপ্রায়ে দেওয়া হইয়াছিল। সেই জন্য আমি টাকা ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

দা। আবার তাহা তুলিয়া রাখিলেন কেন ?

সু। পার্ব্বতী সে টাকা না লইয়া চলিয়া গেল, সুতরাং আমাকে অগত্যা তুলিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

দারগা তখন মনে মনে ভাবিল, কথাগুলি সব ছেঁদো কথার মত, সরল ভাবের নয়। যোগেন্দ্রের উপদেশমত দারগা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, খোকাবাবু বাকী খাজানার জন্য আপনার উপর তাগাদা করে, উৎপীড়ন করে, সেই জন্যই আপনার টাকার আবশ্যক হইয়াছিল কি না ?"

সু। হাঁ।

দা। আপনি পার্ব্বতীকে ঝাঁটা মারিয়াছিলেন কি না ?

এই সময়ে চৌকিদার, কনেষ্টবল ও কয়েকজন লোক গোলমাল করিয়া উঠিল, "দারগা বাবু, এই জানালার নীচে কম্বল চাপা একখানি সোণার চিক রহিয়াছে।" দারগা তৎপর উঠিয়া চিক ও সেই স্থান দেখিল। যোগেন্দ্রের মুখ তখন হর্ষোৎফুল্ল। গোপালের মুখ একবারে শুকাইয়া গেল। দারগা চিক লইয়া সুকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ চিক কাহার ?" সুকুমারী চিকের দিকে তীব্র ভাবে চাহিয়া বলিল, "জানি না।"

দা। কিরূপে তোমার বাড়ীতে আসিল ?

সুকুমারী ক্রোধ-কম্পিত স্বরে ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর করিল, "তাও জানি না।"

দারগা তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, "ঘটনা ঠিক সত্য। আসামীও প্রায় সকল কথাই স্বীকার করিতেছে। অলঙ্কার বন্ধক দিয়া টাকা আনিতে যাওয়ার কথাটা কিছু নয়। তাহা হইলে অলঙ্কার আবার ফিরিয়া আনিবে কেন? আর খোকাবাবু যখন আসামীর নিকট টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন তাঁহার স্ত্রী তাহাকে টাকা দিবে কেন? এটা কোন কাযের কথাই নয়। আর টাকা যদি বাবুর স্ত্রীর ইচ্ছামত আনিয়া থাকিবে তবে তাহা আবার ফেলিয়া দিবে কেন ও পার্ব্বতীকে মারপিট করিবে কেন? আসামী ইহার কোনরূপ সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে না। অতএব আসামী চুরি করিয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। তবে স্ত্রীলোকটির চেহারা ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া শীঘ্র মনে হয় না যে সে চুরি করিতে পারে। কিন্তু তাতে আর কি? সব সময়ে কি চেহারা দেখিয়া সাধু কি অসাধু বুঝা যায়? আমরা পুলিশের লোক, অত ভাবিতে গেলে আর আমাদের কায করা হয় না, প্রমাণ পাইলেই মকদ্দমা চালান দিব। এ মকদ্দমার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তবে আজ এ আসামী এই বাড়ীতেই থাকুক। কনেষ্টবল ও চৌকিদার পাহারা দিক্। কাল সকালে আসামী চালান দিব।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া দারগা বাবু তদন্ত শেষ করিয়া উঠিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুসুমদলন।

দারগা সুকুমারীকে অপরাধী সাব্যস্ত মনে করিয়া তাহাকে চালান দিবার মানস প্রকাশ করিলে যোগেন্দ্র ও খোকাবাবুদের মধ্যে মহোল্লাস পড়িয়া গেল। তাঁহাদের আর আনন্দ রাখিতে স্থান নাই। গ্রামের অন্যান্য অনেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিও আসিয়া সে আনন্দে যোগ দিল। সুরা দেবীরও বিশেষ সম্বর্দ্ধনা হইল। প্রধান প্রধান সাক্ষীগণকে পরি-তোষ করিয়া খাওয়ান হইল। দারগারও পান ভোজনের বিশেষ জাঁক জমকের সহিত আয়োজন হইল।

যখন খোকাবাবু ও যোগেন্দ্র মাঝের বাড়ীতে আনন্দে মত্তপ্রায়, পার্ব্বতী সেখানে একবার দেখা দিল। যোগেন্দ্র তাহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া বলিল, "জান খোকাবাবু, পার্ব্বতী বড় পাকা এজেহার দিয়াছে; ওর এজেহারের বলেই মকদ্দমা টিকিয়া গেল।"

খো। তা না হলে আর আমি পার্ব্বতীকে এত ভালবাসি। জানিস্ পার্ব্বতী, তোরই উপর আমি বাড়ীর সব ভার দিব। মা বেটী ত কিছুই বুঝে না। বউটিত কোন কর্ম্মেরই নয়, কেবল প্যান্ প্যান করিবে। তুই হবি বাড়ীর গৃহিণী। তোর হুকুমের তাবেই সবাই থাকিবে।

পা। গিন্নি হওয়ার কপাল আমার! তোমরা এত খুসি হয়েচ, আমোদ আহ্লাদ করিতেছ, আর বাড়ীর ভিতরে দেখগে কান্নাহাটি।

খো। কেন?

পা। দয়াবতী বউঠাকুরণের দয়া উছলিয়া উঠিয়াছে। সুকুমারীকে চুরির দায়ে ফেলা হইয়াছে বলিয়া মায়ের কাছে কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা

কুটিয়া একাকার করিতেছে। বলিতেছে যে যখন সে ইচ্ছা করিয়া টাকা দিয়াছে, স্বকুমারীকে চুরির দায়ে ফেলিলে পাপ হইবে। মা কেবল তোমাকে ও নায়েব মহাশয়কে গালি দিতেছেন। আমি তোমাদের হয়ে দুকথা বলিতে গেলাম, তা দুজনে আমাকে যেন গিলিতে আসিল।

যো। দেখ, খোকা বাবু, তোমার মায়ের বড় অন্যায়। তিনি আমায় যখন তখন গালি দেন।

পা। বউএর অন্যায় তা চেয়েও বেশী।

খো। আচ্ছা, আজ এখন দুজনকেই ভাল রকম শিক্ষা দিব। যা পার্ব্বতী, তুই এখন যা।

পার্ব্বতী চলিয়া গেল। খোকা বাবু যোগেন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিল, "আচ্ছা যোগিন, সবই হইল, স্বকুমারী না হয় জেলে গেল, কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ, আমাদের উদ্দেশ্য কই সফল হইল?" যোগেন্দ্র মনে মনে ভাবিল, লাভ তোমার হউক, বা না হউক আমার বেশ হয়েছে, আরও কিছু আশা রাখি। প্রকাশ্যে বলিল, "উদ্দেশ্য সফল হবে না, কি বল হে? একবার মকদ্দমা স্বরু হইতে দাও ত, তখন দেখিবে মজা, স্বকুমারী ঘুরে আসিয়া পায়ে পড়িবে, তখন যা বলিব তাই শুনিবে।"

খো। তখন ত আর মকদ্দমা বন্ধ করা যেতে পারিবে না, স্বকুমারীর যদি জেল হয়।

যো। কেন পারিবে না? স্বকুমারীকে একবার হাত করিয়া লইয়া সাক্ষী গোলমাল করিয়া দিলেই মকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, আমাদের ত উদ্দেশ্য সাধন হবে।

খোকা বাবুর মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যোগেন্দ্রকে একবার আবেগভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যাও আজ রাত অনেক হইয়াছে, আমিও বাড়ীর ভিতর যাই।"

যোগেন্দ্র চলিয়া গেল। খোকা বাবু ভিতর বাড়ীর দিকে যাইতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন একটি রমণী দ্রুতপদে, আলুলায়িত কেশদাম বস্ত্রের দ্বারা ঢাকিতে ঢাকিতে মাঝের বাড়ী হইতে ভিতর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। রমণীকে তিনি চিনিলেন। তাঁহার মনে তখন রুদ্র রসের, প্রচণ্ড অভিমানের উদয় হইল। তিনি দ্রুতপদে রমণীর অনুসরণ করিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার কেশরাশি গ্রহণ করিলেন। রমণী ব্যাধধৃতা, ভয়চকিতা হরিণীর ন্যায় একবার কাতর ভাবে "মা গো" বলিয়া চিৎকার করিয়াই নীরব হইলেন। খোকা বাবুর মাতা "করিস্ কি বাছা, করিস্ কি বাছা" বলিতে বলিতে দৌড়িয়া আসিয়া রমণীকে ধরিলেন।

খো। করি তোমার বাপের শ্রাদ্ধ, বুড়ি বেটী পাজী!

খো মা। আহা বউটা মারা গেলরে, সে দিন মেরেছিলি, তারই বেদনা এখনও সারে নাই, আজ আর মারিস্ না বাবা, ছেড়ে দে।

খো। আজ এখন বেদনা ভাল করে সারিয়ে দিচ্ছি। আঃ নচ্ছার বেটী; আবার বউএর জন্য কাঁদুনি গাইতে এসেছেন, বেদনা সারে নাই তাই দুঃখ করা হচ্চে। নিজে ত আফিমের মাত্রা খুব চড়াচ্চ, গুণের বউকে খানিকটা খাইয়ে দিতে পার নাই, একবারে বেদনা টেদনা সব সারিয়া যাইত: তুই বেটীর জন্যই ত বৌটা খারাপ হয়েচে। তোর কি কিছু মাত্র শাসন আছে? আমরা মাঝের বাড়ীতে পাঁচজনে কথা-বার্ত্তা আমোদ আহ্লাদ করিতেছি, ওর সে বাড়ীতে যাওয়ার কি দর-কার? উনি সেখানে গিয়া কি না উঁকি ঝুঁকি মারবেন! আবার চুল এলো করে ছুটে পালিয়ে আসারই বাহার কত! এই চুলে আজ আগুন লাগিয়ে দিব।

খো মা। অই গুলোইত বউমার বড় দোষ, এত করে বলি তবু কথা শুনিবে না। ওবাড়ীতে যাওয়ার কি দরকার তোমার ছিল মা?

খো। আমি যার নিকট টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাকে ওর টাকা দেওয়ার কি আবশ্যক? ওর টাকা দেওয়ার কি এক্তার আছে? সে টাকা যে লয় সে চোর নয়?

মা। তা যা হবার তা হয়েচে, আর সে বামুনের মেয়েটিকে কষ্ট দিস্ না বাবা।

খো। আঃ কি আমার সৎপরামর্শদাতা গো!

মা। আমার পরামর্শ মত কে তোমরা কায কর বল বাবা। তুমি না হয় বেটা ছেলে, বউই কি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করে? এই যে সুকুমারীকে টাকা দিয়াছে তা কি আমাকে ঘুণাক্ষরে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে? কেন বাছা তোর লুকিয়ে তাকে টাকা দেওয়া?

এখন পর্য্যন্ত বধূটি তদ্রূপ কেশাকৃষ্টা হইয়া, রণোন্মত্তা উগ্রচণ্ডার হস্তে নৃমুণ্ডের ন্যায়, খোকা বাবুর হস্তে ঝুলিতেছিল, মার্জ্জারাক্রান্ত পক্ষি-শাবকের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। খোকা বাবু কেশ ধরিয়া থাকায় তাহার মস্তক অনাবৃত ছিল, কিন্তু বধূটি তথাচ হস্ত দ্বারা বদন অঞ্চলাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। বধূর দোষ সম্বন্ধে খোকা বাবুর মাতাও খোকা বাবুর সহিত এক মত প্রকাশ করায় খোকা বাবুর ক্রোধ যেন লম্ফ দিয়া বৃদ্ধি পাইল। পশ্চাতের দিকে নিম্নভাগে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বধূর মুখ উপরের দিকে করিয়া হস্ত দ্বারা তাহার অঞ্চলাবরণ খুলিয়া দিয়া ব্যঙ্গস্বরে খোকা বাবু বলিলেন, "আমরি, কি ভাল মানুষটি গো, এখন মুখে কথা নাই!" এবং পুনরায় মারিতে উদ্যত হইলেন। "আর মারিস্ না বাবা" বলিয়া তাঁহার মাতা ব্যগ্রভাবে আসিয়া বধূকে ধরিলেন। "মর বেটি পাজী, আবার ধরিতে আসিস্," এই বলিয়া খোকা বাবু পৃষ্ঠে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া, তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। বৃদ্ধার শুষ্ক চক্ষে অশ্রু আসিল এবং অতিশয় ভীতা হইয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন। আহা! সন্তানের হস্তে বৃদ্ধা জননীর এইরূপ ব্যবহার! তা কি করিবেন। ইহা অনেকটা নিজ কর্ম্মেরই ফল। তিনি অনেকক্ষণ কাঁদিলেন বটে, কিন্তু কি মর্ম্মাহত হয়েচেন? বোধ হয় না ত। তাঁহার মনের ভাব "ছেলেয় মেরেচে, অবোধ ছেলে, তাতে আর অধিক দুঃখ করিলে চলিবে কেন?" বৃদ্ধার সন্তান-বাৎসল্য এতই প্রবল, এখনও তিনি খোকাবাবুকে ঠিক পাঁচ বৎসরের খোকাটির মতনই ভাবিয়া থাকেন এবং ভালবাসেন, সেইরূপ তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে স্বর্গে যান, সেইরূপ তাঁহার আবদার সহ্য করেন এবং সেইরূপ তাঁহার অত্যাচার উৎপীড়নকে অবোধ ছেলের কার্য্য বলিয়া উড়াইয়া দেন। এই অন্ধ অপত্যস্নেহেই যে খোকাবাবুর সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। যখন তিনি খোকা বাবুকে নিতান্তই গর্হিত কার্য্য করিতে দেখিতেন, তখন সে কার্য্যের দোষ অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া মনে মনে সন্তানের দোষ স্খালন করিতেন। আজ এই মারপিটের পর যতক্ষণ পৃষ্ঠে বেদনা অনুভব করিলেন ততক্ষণ কাঁদিলেন। অবশেষে ভাবিয়া স্থির করিলেন "বউএর বাস্তবিকই অনেক দোষ আছে। বউ যদি ভাল হইত, কথামত কায করিত, তা হ'লে ছেলে কি আমার এত খারাপ হতো? এই দেখ দেখি, কেন তার সুকুমারীকে টাকা ধার দেওয়া। কেনইবা তার আবার ও বাড়ীতে যাওয়া। কাযেই মার খেতে হয়। আহা! কিন্তু এক এক বার বউটাকে বড় মারই মারে। তা কি করিব অবোধ ছেলে, এই যে আমি বুড়ী মা, আমাকেই ধ'রে মার্‌লে। একটু সহ্য না করিলে কি সংসার চলে?"

এ দিকে ব্যাঘ্র যেমন শীকার লইয়া স্ব বিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে আপন আয়ত্তের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে, খোকা বাবু সেইরূপ বধূকে আপন গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে-

ছেন। খোকা বাবু পালঙ্কের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছেন; নিম্নে ঠিক সম্মুখে বাত্যাচ্ছিন্ন কুসুম-কোরকের ন্যায় বধূটি নিম্নদৃষ্টি হইয়া বসিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। খোকা বাবু কর্কশভাবে বলিলেন, "দেখ্ ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া অত কাঁদিতে হবে না, কথার জবাব দে, কেন তুই ও বাড়ীতে গিয়াছিলি বল, তা না হলে এই এক জুতা শুদ্ধ লাথীতে তোর কান্না বাহির করিয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া বধূর সন্ত্রাসিত প্রাণেও ঘোর অভিমানের উদয় হইল; অশ্রুবিপ্লুত বদনমণ্ডলে সাহস ও প্রতিজ্ঞার ভাব দেখা দিল; ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। খোকা বাবু পুনরায় মেজের উপর সতেজে পদ পীড়ন পূর্ব্বক ধমক দিয়া বলিল, "বল্ ভাবচিস্ কি, শীঘ্র বল্, না বলিলে ছাড়ান নাই।" বধূ অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে, অথচ সতেজে, স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "আমি আজ বিকালে শুনিলাম সুকুমারী আমার বাক্স হইতে টাকা ও গয়না চুরি করিয়াছে বলিয়া তাহাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া যাইবে। সুকুমারী নির্দ্দোষী, তাহার কোন অপরাধ নাই, সে কোন অলঙ্কার চুরি করে নাই। টাকা আমি তাহাকে নিজে দিয়াছি। তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, সে দোষ আমার, তাহার কোন দোষ নাই। তবে তাহার উপর এত অত্যাচার করা হয় কেন? কি মতলবে তোমরা এরূপ ঘোর অধর্ম্ম করিতেছ, তাহা জানিবার জন্য আমি মাঝের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমি তোমাদের কথা বার্ত্তা সমস্ত শুনিয়াছি। কি ঘোর দুষ্ট মতলবে তোমরা এ কায করিতেছ তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ছিঃ, এমন অধর্ম্ম করিও না, আমাকে মার আর কাট তাতে আমার কিছু দুঃখ নাই, কিন্তু সেই নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণের মেয়ের উপর এত অত্যাচার করিও না। আহা, সে আমাকেও হয় ত কত দোষী ভাবিতেছে। তোমার পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করি, তাহাকে নিস্তার দাও।" এই বলিয়া বধূ স্বামীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। খোকা বাবু দুর্জ্জয়

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে পত্নীকে পুনরায় কেশাকর্ষণ করিয়া তুলিয়া বলিলেন, "বেহায়া বেআদব বদমাইস মেয়ে, তুমি আবার আমাকে ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছ, দেখ তোমার কি দুর্দ্দশা করি।" নিকটে আলমারীর উপর একখানি কাঁচি ছিল। খোকা বাবু সেইটি লইয়া এক হস্তে বধূর সুললিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া অপর হস্ত দ্বারা তাহা কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পশমতুল্য সুকোমল কেশরাশি নিঃশব্দে ধূলায় পতিত হইতে লাগিল; বধূ ধীরভাবে, অবনতমস্তকে তাহা দেখিতে লাগিলেন। তৎপর খোকা বাবু সেই দ্বিতল গৃহ হইতে বধূকে সিঁড়ির উপর দিয়া হুড়হুড় করিয়া টানিয়া আনিয়া পদাঘাত পূর্ব্বক উঠানে নিক্ষিপ্ত করিলেন, এবং বীরদর্পে সোপানারোহণ করিয়া নিজ কক্ষে চলিয়া গেলেন।

বধূটি প্রায়োপ-হতচেতন অবস্থায় একাকিনী সেই অন্ধকার নিশীথে, নির্জ্জন প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিলেন। আহা, বালিকা, তুমি কত আদরের মেয়ে! যদি তোমার মা বাপ তোমার এই অবস্থা আজ দেখিতেন, তাঁহাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইত! তাঁহারা কত সাধ করিয়া তোমার নাম রাখিয়াছিলেন—হেমলতা, আজ তোমার স্বর্ণ-অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত। যখন তুমি পিতৃ-মাতৃ-অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়াছিলে, তখন তাঁহাদের কল্পনায় তুমি কতই সুখের অধিকারিণী হইতে, তোমার ভবিষ্যৎ তাঁহারা কতই না উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতেন! কিন্তু তোমার বাস্তব জীবন কি বিপরীত! তোমার স্নেহময়ী জননী তোমার চিক্কণ চিকুর দামে কবরী বাঁধিয়া তাহাতে স্বর্ণ-ফুল পরাইয়া দিতে কতই ভালবাসিতেন। আজ তোমার সেই নিরুপম চিকুররাশি নিজ স্বামী কর্তৃক কর্ত্তিত হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে! হায়, হেমলতা তুমি বড়ই অভাগিনী! হায় হেমলতার পিতা মাতা, তোমরা ধন-মুগ্ধ হইয়া অপাত্রে কন্যাদান করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছিলে!

কিছুক্ষণ পরে হেমলতার চেতনা হইল, একবার উঠিয়া বসিল।

এখনও তাহার শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে ; সিঁড়ি দিয়া নামাইবার সময় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, পদদ্বয়ে প্রবল বেদনা অনুভব হইতেছে। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার জীবনের আর মূল্য কি ? প্রাঙ্গণস্থ ধূলিকণা অপেক্ষা আর তাহার জীবনের গুরুত্ব কি ? তবে আর সে ধূলি হইতে উঠিয়া বসে কেন ? এইরূপ ভাবিয়া আবার ধূলিতে শয়ন করিল। শয়ন করিয়া একবার পিতা মাতার মুখ স্মরণ হইল। দুই নয়ন ফাটিয়া জলধারা ছুটিতে লাগিল। তৎসঙ্গে তাঁহাদের উপর অভিমানও হইল। মনে মনে বলিল, "মা, কেন তুমি সূতিকাগারে আমাকে বধ কর নাই ? পিতা, কেন তুমি আমাকে নদীর জলে ভাসাইয়া দেও নাই ? তাহা হইলে আর আমাকে এ দুঃখ পাইতে হইত না, তোমাদিগকেও আর এ দুঃখের কথা শুনিতে হইত না। আহা, জীবনে আর কি তোমাদের মুখ দেখিতে পাইব ! পিতা, তুমি ত আমাকে ত্যাগ করিয়াই গিয়াছ। যে দিন আমাকে লইতে আসিয়া জামাতার নিকট অপমানিত হইয়াছিলে, সেই দিনই ত বলিয়াছিলে "হেম, তোর মমতা জন্মের তরে ভুলিলাম—আর তোকে কখন দেখিতে ইচ্ছা করিব না, তুইও আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিস্ না।" তবে আর আমার জীবনে লাভ কি, কার জন্য এ অসহ্য যন্ত্রণাময় জীবন ধারণ করিব ? জননি গো, বুঝিতেছি তোমার হৃদয় আমার জন্য অবিরাম কাঁদিতেছে, তুমি কাননের পশু, আকাশের পক্ষী দ্বারাও আমার সংবাদ লইতে উৎসুক হও। কিন্তু মা, এ অভাগিনী কন্যাকে লইয়া আর তোমার কি সুখ হইবে ? আমি আর এ বিষম যাতনাময় জীবন সহ্য করিতে পারি না !" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হেমলতা একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, কত শত নক্ষত্র নীলাকাশে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, আবার নিবিয়া যাইতেছে, কত শত নক্ষত্র সেই অনন্ত দীপ্তিমান্ আকাশখণ্ড হইতে স্খলিত হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। হেমলতা অনেকক্ষণ

ধরিয়া স্থির দৃষ্টিতে ইহা দেখিতে লাগিল। তাহার মুখকান্তি ধীর ভাব ধারণ করিল, নয়নদ্বয় শুষ্ক হইয়া আসিল; ধীরে ধীরে উঠিয়া সে একটি কক্ষ মধ্যে গমন করিল ও একটি কৌটা হইতে কি বাহির করিয়া লইয়া পুনরায় প্রাঙ্গণে আসিল। আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, গলবস্ত্রে, কর-যোড়ে, অশ্রুবিপ্লুত বদনে আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ভগবন্. অবলা বালিকার অপরাধ মার্জ্জনা কর, তোমাকে প্রণাম করি। জনক জননী, শ্বশ্রুঠাকুরাণী, তোমাদিগকেও প্রণাম করি, তোমরাও আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। স্বামিন্, তুমিও আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর আমি তোমাকেও প্রণাম করি। ভগবান তোমাকে শুভ মতি দিন। আজি আমি তোমাদের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি। এইত কত শত নক্ষত্র জ্বলিতে জ্বলিতে নিবিয়া যাইতেছে, জ্যোতিঃসাগর হইতে অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে, আমারও জীবনতারা ওদের মত আজ নিবিয়া যাউক।" এই বলিয়া সকলের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া হেমলতা কৌটা হইতে আনীত জিনিষটি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ*ঃ০—

আত্মহত্যা।

রাত্রির শেষভাগে খোকাবাবুদের বাড়ীতে একটা গোলমাল উঠিল। হেমলতা তখন বিষের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। খোকাবাবুর মাতা, খোকাবাবু, ভৃত্যবর্গ সকলেই উঠিয়াছে। ধূলিধূসরিতা হেমলতাকে একটি গৃহের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, সেখানে সকলেই তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। খোকাবাবু কেবল ভীত হইয়া ভিন্ন গৃহে বসিয়া সংবাদ লইতেছে। খোকাবাবুর মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউমা, কি হয়েচে? কেন অমন করিতেছ?" হেমলতা উত্তর করিল, "মা, কিছুই করি নাই, কেবল বেদনা সারিবার ঔষধ খাইয়াছি। গায়ের বেদনা, মনের বেদনা সব যাতে চিরকালের মত সারিয়া যায়, এমন ঔষধ খাইয়াছি। আর বেদনার যাতনা সহ্য করিতে পারি না মা!" বলিতে বলিতে হেমলতার চক্ষে জল আসিল। তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। "আহা, মা বাপের ধন, কেন তোমাকে মা বাপের কাছে পাঠাইয়া দিই নাই মা?" এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। গ্রামের প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী পাঁচ জন ক্রমে আসিয়া জুটিল। সকলেই আহা আহা করে, চক্ষের জল ফেলে এবং খোকাবাবুর নিন্দা করে। "আহা, এমন ননীর পুতুলের গায়ে কেমন করিয়া হাত তুলিতো গো! আহা, দেখ সর্ব্বাঙ্গে কালশিরা পড়িয়াছে!

চুলগুলো পর্য্যন্ত কাটিয়া দিয়াছে! হেঁগা গিন্নি, তুমি কি কিছুই দেখিতে না, বউমানুষ কিছুই বলিতে পারে না বলিয়া কি এত উৎপীড়ন করিতে আছে? ধর্ম্ম ত আছে! আহা, বউটি কি সাধারণ দুঃখে বিষ খাইয়াছে?” এইরূপ করিয়া কোন স্পষ্টবাদিনী প্রতিবেশিনী খোবাবাবুর মাতাকে শুনাইয়া দিল। নিজের দোষ নিজের নিকট অনেকেই স্বীকার করিতে রাজি হয়, অপরে যদি সে কথায় কর্ণ না দেয়! কিন্তু অপরে সে দোষের কথা তুলিলেই মন ফিরিয়া দাঁড়ায়, এবং অন্যের উপর সে দোষারোপ করিতে চেষ্টা করে। অপরের নিকট ভাল বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছাটা এতই প্রবল! খোকা বাবুর মাতা বধূর অবস্থা দেখিয়া অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই দুঃখিত হইতেছিলেন এবং নিজের ত্রুটি অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশিনীর কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন, “আমি দেখিতাম কি, না দেখিতাম, তোমরা আর তার কি জানিবে বল, সে কথায় আর তোমাদের কাজ কি বাপু! অবোধ ছেলে, অল্প বয়স, না হয় দুই এক দিন রাগের মাথায় কিছু করিল বা বলিল, সোমত্ত বয়সে অনেকেই অমন করে, বয়স হইলেই সারিয়া যায়। তা বলিয়া কি বউএর এমন কাজ করা উচিত হয়েচে? আপন হাতে বিষ খাওয়া কি উচিত হয়েচে?” পার্ব্বতী এই সময় উপস্থিত ছিল; তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, “গিন্নি মা, বউ করেচে আবার কি! তোমরা অত ভয় খাও কেন, বউএর গুণ ত জান না? তোমরা মিছিমিছি বিষ খাওয়া, বিষ খাওয়া করে গোলমাল করচ। ওসব কিছু নয়, বউএর সব ভঙ্গী, সব ঢং, এখনি দেখিবে আপনা আপনি সব ভাল হয়ে যাবে।”

প্রতিবেশিনী। মরণ আর কি মাগি পাজি কোথাকার! তোর জন্যই ত এমন ঘটেচে। আহা, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কচ্চে, শরীর নীলবর্ণ হয়ে আস্‌চে, জিহ্বা জড়িয়ে আস্‌চে, আর বলে কি না মিছিমিছি ভঙ্গী

কচ্চে। তুইই তবে বুঝি বিষ এনে দিয়েচিস্। তুইই বউটাকে মেরে ফেলালি, তুই আপনার কথায় আপনি ধরা পড়েচিস্।

পার্ব্বতী ক্রোধে কপালে চক্ষু উঠাইয়া বলিল, "দেখ, মুখ সাম্‌লে কথা কও, না হলে এখনি অপমান হবে।"

প্রতি। মর মর নচ্ছার মাগি! আমি মুখ সামালে কথা কব? আহাম্মক গিন্নি পেয়েচিস্ তাই এত আস্পর্দ্ধা; আমি হলে ঝাঁটায় তোর মুখ দিয়ে রক্ত বাহির করে তিন দিনে বাড়ীর বাহির করিয়া দিতাম। বেশ করেছিল সুকুমারী, ঝাঁটায় বিষ ঝেড়ে দিয়েছিল। তা হলে কি হবে, কাল কলি, সকলই উল্টো!

এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে, ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে সেই প্রতিবেশিনী খোকা বাবুদের বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল।

শেষ রাত্রে খোকা বাবুদের বাড়ীর মধ্যে এরূপ গোলযোগ কেন উঠিল ইহা জানিতে উৎসুক হইয়া দারগা কাছারি বাড়ী হইতে বৈঠক-খানা বাড়ীতে আসিয়া কোন লোকের সহিত দেখা হইবার প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিল, এই স্ত্রীলোকটি তাহার সম্মুখে পড়িল। তাহাকে দেখিয়া দারগা জিজ্ঞাসা করিল "হেঁ গো, কি হয়েচে, বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কিসের?"

স্ত্রী। কে তুমি?

দা। আমি দারগা, চুরি মকদ্দমার তদন্ত করিতে আসিয়াছি।

স্ত্রীলোকটি ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে, ঘন ঘন হাত নাড়িতে নাড়িতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। দারগাকে দেখিয়া বলিল, "আঃ, আমার দারগার কপাল! ভারি দারগাগিরি করিতে এসেচ! পাঁচ বদমাইসে মিলে একটা ব্রাহ্মণের মেয়েকে জব্দ করিবার জন্য চুরি অপবাদ করিল, আর সেই মকদ্দমা তদন্ত করিতেছ, আর এদিকে যে একটা মানুষকে খুন করে ফেলালে, ঘরের বউকে মেরে ধরে মাথার চুল মুড়িয়ে বিষ

খাওয়াইয়া মেরে ফেলালে, তাহার কোন খবর রাখ না। যদি কোন উপায় করিতে চাও, ত যাও সকল অনিষ্টের মূল সেই পার্ব্বতী হারামজাদীকে আর সেই ডাকাত ছোঁড়া খোকাকে পেছমোড়া করিয়া বাঁধ, এই বেলা যাও, না হলে পালাবে। হায় হায়, এমন ডাকাতের হাতেও এমন সোণার লক্ষ্মী মেয়ে পড়ে? আহা, মরে যাই, বাছাকে কত যন্ত্রণাই না দিয়েচে, চুলগুলো পর্য্যন্ত মুড়িয়ে দিয়েচে গো! এখনও বলে বউএর দোষ, ছেলে আমার ছেলেমানুষ বই ত নয়! আ মরণ!"

এইরূপ বলিতে বলিতে বায়ুতাড়িত অগ্নি-খণ্ডের ন্যায় স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল। যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইল তাহাকেই অগ্নিময় বাক্যে উত্তেজিত করিল। এদিকে দারগা কনেষ্টবল দুইজনকে সঙ্গে লইয়া খোকা বাবুদের ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র খোকা বাবু ত যে গৃহমধ্যে বসিয়াছিলেন তাহা অর্গলবদ্ধ করিলেন, এবং রামা খানসামাকে জানালার নিকট ডাকিয়া সত্বর যোগেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। যোগেন্দ্র বিছানা হইতে না উঠিয়া রামার মুখে সকল কথা শুনিয়া ভাবিল, "ব্যাপার গুরুতর, কে এখন এ খুনের ফ্যাসাদের মধ্যে যাবে"। পরে জড়িত স্বরে উত্তর করিল, "এত রা—রা—রাত থাকিতে বাবা কো—কো কোথা যাব?" ইহার পর যোগেন্দ্র একেবারে নীরব হইল। রামা অনেকবার ডাকিল। কিন্তু যোগেন্দ্র পুনরায় কোন উত্তরও দিল না, দরজা খুলিল না। রামাও বুদ্ধিমান্ খানসামা, তাহার আর তখন বুঝিতে বাকী রহিল না যে, যোগেন্দ্রের জড়িত স্বরটা কেবল নেশার ভাণ, এ গোলযোগে যাইতে ইচ্ছুক নয় বলিয়া নেশার ভাণ করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তখন প্রভুপ্রিয় খানসামা রামা খোকা বাবুর বাড়ী পুনঃ প্রবেশ করা তাহার নিজের পক্ষে কত দূর যুক্তিসঙ্গত তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল এবং শেষে না যাওয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিল। এদিকে দারগা

যে ঘরে হেমলতা শায়িতা ছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরে তখন খোকা বাবুর মাতা, পার্ব্বতী ও আরও দুই একটি স্ত্রীলোক ছিল এবং একটী বৃদ্ধ পুরুষও ছিলেন। এই পুরুষটি গ্রামের কবিরাজ। তিনি দুই একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, ও বায়ুর চঞ্চলতা কমিলেই রোগী আরাম হইবে, ভয়ের কোন কারণ নাই, এইরূপ বলিয়া খোকা বাবুর মাতাকে সাহস দিতেছেন। খোকা বাবুর মাতা কবিরাজপ্রদত্ত ঔষধ হেমলতাকে খাওয়াইতেছিলেন, হেমলতা ভাল হইবে এই কথায় বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, কিন্তু বিপরীত আশঙ্কা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে খোকা বাবুর ভাবী অমঙ্গল-চিন্তা তীব্রতর হইয়া মনে উঠিতেছিল। হেমলতার ভাল হইবার আশা আর মনে স্থান পাইতেছিল না। পার্ব্বতীর কিন্তু হেমলতা ভাল হইবে এই কথাটাতেই অধিক বিশ্বাস হইতেছিল; সে ভাবিতেছিল "হেমলতা পাছে মারা না যাইয়া ভাল হয়, মারা যায় ত বেশ হয়, আপদ যায়; কিন্তু তাকি যাবে?" পার্ব্বতীর হেমলতার উপর এতদুর বিদ্বেষ কিজন্য? কিজন্য তা সেই জানে। দারগা সেই গৃহে প্রবেশ করিলে সকলেই ত্রস্ত হইল। খোকা বাবুর মাতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "মনে মনে যে আশঙ্কা করিতেছি বুঝি বা কাজে তাহাই ঘটে, খোকা বুঝিবা কোন বিপদে পড়ে।" দারগা কবিরাজকে বলিল, "কি কবিরাজ মহাশয়, দেখেন কি, এ যে দেখিতেছি বউটিকে বিষ খাওয়াইয়াছে; আপনি এর কিছু জানেন কি?" কবিরাজ ভীত হইয়া "আমি কিছু জানি না বাবু, আমি কিছু জানি না" বলিয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। পার্ব্বতী পূর্ব্বদিন দারগার বেশ পরিচিত হইয়াছে, দারগার নিকট ভাল এজেহার দিয়াছে বলিয়া মনে মনে তাহার একটা গৌরব ও সাহসের ভাবও আছে; অতএব নির্ভীক ভাবে এখন বলিল, "দারগা মশায়, বিষ খাওয়ানের কথা কি বলেন, সে সব কিছু নয়, বউয়ের একটা ব্যারাম আছে, বল না গো কবরেজ

মশায়, ব্যারামটার নাম বল না, এই যে আমাদের কাছে বাই চঞ্চল না কি বলিতেছিলে, এখন চলে যাও কেন? বউ এখনি ভাল হবে।” দারগার পার্ব্বতীর উপর সন্দেহ হইল; এবং একজন কনেষ্টবলকে সঙ্কেতে পার্ব্বতীর নিকট দাঁড়াইতে বলিল যেন সে পালাতে না পারে। তাহার পর হেমলতার বিছানার দিকে অগ্রসর হইল। হেমলতা একটু উৎসুক ভাবে দারগার দিকে তাকাইল। দারগা জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার কি হইয়াছে? কে আপনার কি করিয়াছে, সকল কথা আমায় বলুন, আমি পুলিশের দারগা, আপনার উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহাকে আমি শাস্তি দিবার উপায় করিব।” হেমলতা অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে দারগার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, অনেক চেষ্টার পর, অস্পষ্ট স্বরে বলিল, “সুকুমারী সম্পূর্ণ নিরপরাধী, তাহার যেন কোন অনিষ্ট না হয়।” হেমলতা আর কথা কহিতে পারিল না, আর কোন কথা বলিবার ইচ্ছাও বোধ হয় ছিল না।

পল্লীগ্রাম, বিশিষ্ট প্রতিকার কিছুই হইল না। ক্রমে হেমলতার অবস্থা অতিশয় খারাপ হইতে লাগিল, যাতনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শরীরের আক্ষেপ আরম্ভ হইল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার হইতে লাগিল, রক্তবর্ণ চক্ষুর্দ্বয় ক্রমে অর্থশূন্য ভাবে প্রসারিত হইল, কণ্ঠে একপ্রকার কঠিন যাতনাব্যঞ্জক স্বর শ্রুত হইতে লাগিল। মৃত্যু সন্নিকট হইয়া আসিল! কি মর্ম্মচ্ছিদ্ দৃশ্য! হায়, হেমলতা, তুমি কি কুকাজই করিয়াছ! আর তোমারই বা দোষ কি! শুষ্ক, উত্তপ্ত, কঠিন পাষাণখণ্ডে সুকুমার কুসুম পেষণ করিলে তাহা বিনষ্ট হইবে না ত আর কি হইবে? পাপের রাজ্য হইতে পুণ্য অপসরণ করিবে না ত আর কি হইবে? হেমলতা, তুমি একা নও। তোমার মত কত কুসুম-কোরক এইরূপ কঠিন পাষাণ সংস্পর্শে অকালে বিনষ্ট হইতেছে! কত অভাগিনী তীব্র জ্বালাময় জীবনজ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুরূপ অন্ধকারে

ঝাঁপ দিতেছে! তোমার দোষ দিই না। তুমি ইহলোক ত্যাগ করিলে বটে, কিন্তু ক্ষণকালস্থায়ী ক্ষুদ্র যুঁই ফুলটির ন্যায় তোমার স্বর্গীয় সুগন্ধময় হৃদয়টির ঘ্রাণ যে একবার পাইয়াছে, সে তোমাকে কখনই ভুলিবে না।

হেমলতার শেষ অবস্থা দেখিয়া দারগা কনেষ্টবলের প্রতি পার্ব্বতীকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিল। পার্ব্বতী "আমি বাবু এসবের কিছু জানি না, এ সবের কিছু জানি না" এই কথা বলিতে বলিতে, চোক মুখ ঘুরাইতে ঘুরাইতে, পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কনেষ্টবল বজ্র-মুষ্টিতে তাহাকে ধরিল। শেষ মুহূর্ত্তে হেমলতার মুখে সুকুমারীর নিরপ-রাধিত্বের কথা শুনিয়া দারগার তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছিল। সুকুমা-রীকে জব্দ করিবার জন্য খোকাবাবু ও যোগেন্দ্র ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং হেমলতা সেই ষড়যন্ত্র নষ্ট করিবার প্রয়াস পাওয়ায় তাহার উপর এইরূপ অত্যাচার করা হইয়াছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে দারগার এইরূপ দৃঢ় ধারণা হইল। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে প্রবল ক্রোধেরও উদয় হইল। মনু-ষ্যের শরীর ত। দারগা কাঁপিতে কাঁপিতে আরক্ত নয়নে পার্ব্বতীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "বল বেটী পাজী, বল্ কে এ কাজ করেছে? বল্, তুই এ সকলের মূল, তুই সব জানিস্।" পার্ব্বতী কাঁদিয়া পাড়া গোল করিয়া বলিল, "ওরে বাপ্‌রে, আমি কিছু জানি না রে, আমি এই শেষরাত্রে আপ-নার ঘর হইতে আস্‌চি, কিছুরই ধার ধারি না আমাকে মিছিমিছি দায়ে ফেলায় গো! ওগো তোমরা সকলে দেখ গো, আমাকে অনাথা গরিব পেয়ে মিছিমিছি খুনের দায়ে ফেলায় গো।"

দা। বেটী, সোজা সুজী জবাব দে, গোলমাল করবি কি পেছমোড়া করে বেঁধে জুতোর চোটে তোর পিঠের চামড়া তুলিব। বাঁধ ত হে কনেষ্টবল, বেটীকে পেছমোড়া করে বাঁধ ত। বেটী ভিতরের কথা সবই জানিস্। সুকুমারীর বিরুদ্ধে মকদ্দমার তুই ত বাদিনী, বল্ দেখি সে মকদ্দমা মিথ্যা কি নয়?

কনেষ্টবল পার্ব্বতীর হাত পেছমোড়া করিয়া বাঁধিল। সে তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা দারগা, আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি জানি বল, আমাকে পাঁচজনে যা বলে আমি তাই করি। আমি যার খাই সে আমাকে যা বলে তাই করি। [illegible] মিথ্যের আমি কি জানি বাবা ?"

দা। হুঁ, তাই বুঝি যার খাও তার কথামত বউটাকে বিষ খাইয়ে মেরেচ ?

পা। না বাবা! সে কাযটি আমি করি নাই।

দা। তুই করিস্ নাই কে করেচে বল্, না হলে জুতা শুদ্ধ লাথীতে তোর মুখ ভেঙ্গে 'দব। কে এই বউটিকে মেরেচে ধরেচে, চুল কাটিয়া দিয়াছে এবং বিষ খাইয়েছে বল্?

পা। বাবা, যার পরিবার সেই করেচে, সে না হলে আর কে করিবে। আর শুধু কি এই একদিন বউকে মেরেচে, অমন কতদিন মেরেচে ধরেচে সে কথা গ্রাম শুদ্ধ লোকে জানে।

দা। চল্ বেটী চল্ তোর বাবু কোথা আছে।

পা। এস না, সে আপনার নিজের ঘরে খিল দিয়ে বসে আছে, যে অপরাধ করে তারই না ভয় হয়। আমার বাবা কোন ভয় নাই। আমার যে গা হাত কাঁপিতেছে, সে বাবা ভয়ে নয় কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই বলিয়া। চল বাবা, তোমাকে আমি বাবুর ঘরে লইয়া [illegible]।

দারগা ও দুই কনেষ্টবল পার্ব্বতীর অনুগমন করিল। [illegible]রগা মনে মনে ভাবিতেছিল ব্যাপার গুরুতর। ইহার ভিতরে নিশ্চয়ই কোন কথা আছে। স্ত্রীলোকটি কিরূপে মরিল ? আত্মঘাতী হইয়াছে কি ? বোধ ত হয় না, যেরূপ গুরুতর আঘাতের দাগ রহিয়াছে চুলগুলো পর্য্যন্ত কাটা, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে অপরকর্ত্তৃক এই ঘটনা হইয়াছে। ইহার স্বামীকর্ত্তৃকই হইয়াছে, তা না হলে সে লুকায়ে থাকিবে কেন ? আর

পার্ব্বতীই বা প্রথমতঃ ঐ সকল কথা ঢাকিবার চেষ্টা করিবে কেন? পার্ব্বতী ভিতরের কথা সব জানে, রাত্রে ঘুমায় নাই তাহা পর্য্যন্ত বলিয়া ফেলিয়াছে। একটু চাপিয়া ধরিলে সকল কথাই বাহির হইবে। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে দারগা যে কক্ষে খোকা বাবু ছিলেন তাহার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। খোকা বাবু দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্থির ভাবে, নীচে পার্ব্বতী কি বলিতেছিল তাহা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন, সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া ভাবিতেছিলেন, এইবার দারগা তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে। জানালা দিয়া দারগাকে উপরে উঠিতে দেখিয়া খোকা বাবুর আশঙ্কা ভয়ের পূর্ণ মাত্রায় পরিণত হইল, তিনি চকিত ভাবে গৃহের চারিদিকে তাকাইলেন, যদি পলাইবার কোন পথ থাকে। কোন পথই নাই। তখন প্রাণটা যেন দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উড়িয়া যাইবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু তাহা ত ইচ্ছা করিলেই হয় না। দারগা বলিল, "মহাশয়, দরজা খুলুন, আর ঘরে লুকাইয়া থাকিলে কি হবে, যে কায করেচেন্!" খোকাবাবু চমকিয়া উঠিলেন। হেমলতার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে যে হত্যাকারী বলিয়া ধরিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা তাঁহার মনে প্রথম হইতেই জন্মিয়াছিল। তথাচ মনে মনে একবার একবার আশা হইতেছিল বুঝি বা তিনি ফাঁকে ফাঁকে এড়াইয়া যাইবেন। সে আশা দারগার কথায় একবারে বিনষ্ট হইল। এখন মনে হইল, সর্ব্বনাশ, ধরা ত পড়িয়াছি, তবে উপায় কি? পলায়ন। পুনরায় ব্যাকুল ভাবে ঘরের চারি দিকে তাকাইলেন। কিন্তু পলাইবার কোন পথই নাই। অবশেষে লুকাইবার স্থান দেখিলেন। দারগা জানালা দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিল, সেইজন্য জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া একটি কোণে যাইয়া দাঁড়াইলেন। দারগা ও কনেষ্টবল দ্বয় অনেক বার তাঁহাকে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিল। অনুরোধে কোন ফল না দেখিয়া শেষে ভয় প্রদর্শন আরম্ভ করিল, বলিতেলাগিল যে, তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে

প্রবেশ করিবে এবং দরজায় সজোরে আঘাত আরম্ভ করিল। খোকা বাবুর মুখ একবার শুষ্ক, একবার রক্তবর্ণ হইতে লাগিল, কি করিবেন, কি করা উচিত স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্রমে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া একবারে লোপ পাইল, কেবল অন্ধ ভয় ও অন্ধ ক্রোধ ক্রমান্বয়ে তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। কিন্তু পলায়নাদি ভয়প্রণোদিত ক্রিয়ার পথ একবারে রুদ্ধ থাকায়, ভয়ের ভাব শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া তাহার স্থানে ভয়ের বিরুদ্ধ ভাব প্রচণ্ড ক্রোধের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার বাড়ী দারগা প্রবেশ করে? আমি জমীদার, মনে করিলে বেটার মাথা উড়াইয়া দিতে পারি, সে আমার অন্দরমহলে প্রবেশ করে, আমাকে ধরিবার জন্য? বেটাকে কেটে দুখানা করিয়া ফেলিব না? এই ভাব খোকা বাবুর হৃদয়ে যে মুহূর্ত্তে উদয় হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি গৃহের দেওয়ালে লম্বমান তরবারি দেখিতে পাইলেন, যে তরবারি তিনি একদিন হেমলতার স্কন্ধের উপর ধরিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। খোকা বাবু লম্ফ দিয়া সেই তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আয় বেটারা আয়, কে আমাকে ধর্‌বি আয়, যে বেটা আস্‌বি সেই বেটারই মুণ্ডপাত করিব।" দারগা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল "ঘরে খিল দিয়া এত বীরত্ব দেখালে কি হবে, দরজা খুলে বাহির হও না।" "বেটা মনে করেচ আমি ভয় পাইয়াছি" এই বলিয়া খোকা বাবু উন্মত্তের ন্যায় দৌড়াইয়া যাইয়া সুবৃহৎ জানালার গরাদের ভিতর দিয়া তরবারি দ্বারা দারগাকে আক্রমণ করিল। সৌভাগ্যক্রমে দারগা তৎপর পিছিয়া পড়িল, কেবল তরবারির অগ্রভাগ লাগিয়া তাহার হাতে সামান্য জখম হইয়াছিল। খোকা বাবুর তরবারি যেমন জানালার বাহির হইবে, অমনি একজন কনেষ্টবল প্রবল বেগে তাহার উপর এক লাঠির আঘাত করিল। তরবারি খোকা বাবুর হস্তচ্যুত হইয়া বাহিরে পতিত হইল। এখন খোকা বাবু হতভম্ব

হইলেন। ক্রোধের বেগ ঘুরিয়া গিয়া আবার ভয়ের উদয় হইল। দারগার উপর এইরূপ তরবারি লইয়া আক্রমণ করায় পুলিসের লোকের সকলেরই অতিশয় ক্রোধ উদ্দীপিত হইল। তাহারা প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক খোকা বাবুকে গ্রেপ্তার করিল এবং হাতকড়ি লাগাইল।

শীঘ্রই প্রাতঃকাল হইল। যে সূর্য্য বিগত সন্ধ্যায় খোকা বাবুকে আনন্দপূর্ণ দেখিয়া, সুকুমারীকে জব্দ করিয়া আপন মনোরথ সফল করিবে এই আশায় উৎফুল্ল দেখিয়া, অস্ত গিয়াছিলেন, সেই সূর্য্য আজ উদয় হইয়াই দেখিলেন খোকা বাবু পুলিস কর্ত্তৃক বন্দীকৃত ও হাত-কড়ি-বদ্ধ হইয়া নিজ বাড়ী হইতে বাহির হইতেছেন। তাঁহার পশ্চাৎ কুটিলা পার্ব্বতী তদ্রূপ অবস্থায় আসিতেছে, এবং তাহার পশ্চাতে হেম-লতার মৃত দেহ বাহকস্কন্ধে নীত হইতেছে। গ্রামের লোক সকলেই শিহরিয়া উঠিল!!
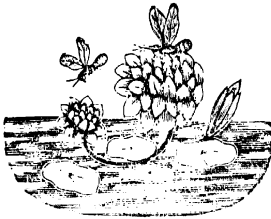
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন জাল।

দারগা খোকা বাবুকে লইয়া বাড়ীর বাহিরে কিছু দূরে আসিলেই একটি বৃদ্ধা রমণী "ও বাবা দারগা, আমার ছেলেকে একবার দেখিতে দেরে" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে উন্মত্তার ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া দারগার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। বলা বাহুল্য ইনি খোকা বাবুর মাতা। দারগা খোকাকে ধরিয়া লইয়া যাইয়াই ফাঁসি দেওয়াইবে, এজীবনে পুত্রমুখ আর দেখিতে পাইবেন না, এই ভাবিয়া তিনি পুত্রকে একবার' শেষ দেখা দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। মূর্চ্ছিতাবস্থায় তিনি অন্যত্র নীতা হইলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খোকাবাবুদের বৈঠকখানা, কাছারীবাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। দারগা রীতিমত সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া তদন্ত আরম্ভ করিল। যোগেন্দ্র এই সময়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, যেন এইমাত্র ঘুম হইতে উঠিল এইরূপ ভাবে, এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিবার বড় ইচ্ছা ছিল না, তবে না আসিলে লোকে পাছে সন্দেহ করে, এই ভাবিয়া আসিল। লোকজন এবং খোকা বাবুকে হাত-কড়ি-বদ্ধ দেখিয়া, যোগেন্দ্র যেন অতি বিস্মিত হইল এবং বলিল "এ কি? ব্যাপার কি? হয়েছে কি?" খোকা বাবু তখন কাতর ভাবে যোগেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। যোগেন্দ্র যে এসব ব্যাপারের মূলে আছে, দারগার তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, সুতরাং তাহার এই কৃত্রিম অজ্ঞানতার ভাণ দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তীব্র স্বরে বলিল "দেখ, ওসব চালাকি ছাড়, সরল ভাবে বল এই সমস্ত ব্যাপার কে

ঘটাইয়াছে। তা না হইলে দেখিতেছ তোমার বাবুকে, তোমারও এই দশা হইবে।" যোগেন্দ্রের তাল জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল, কোথায় কি খাটে, তাহা বেশ বুঝিত। ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া, গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল "দেখ, তোমার মত দারগা ঢের দেখেছি, সাবধান হইয়া কথা বলিবে। কি প্রমাণে তুমি আমাকে জড়াও বল দেখি? আমি কাল সুকুমারীর মকদ্দমার তদন্তের শেষ হইলে উঠিয়া গিয়াছি আর এই এখন আসিয়াছি, ইহার মধ্যে কি ঘটিয়াছে তাহার বিন্দুমাত্র জানিনা, আর তুমি আমাকে দোষী বল? কই দাও দেখি আমার হাতে হাত কড়া, হাত পাতিয়া দিতেছি, তুমি কেমন দারগা দেখি, তোমার চাকরি করিয়া খাওয়া কেমন না ঘুচাই। ওঃ পুলিসে চাকরি ক'রে কি বুদ্ধি খুলেছে গো, উনি আমার হাতে হাতকড়া লাগাইয়া, এই গ্রামে মকদ্দমা আস্কারা করিবেন! ভারি সাধ্য, কর দেখি কি করিতে পার দেখি।" খোকা বাবু যোগেন্দ্রের এই বীরোক্তি শুনিয়া অনেকটা আশান্বিত হইলেন, অতি উপযুক্ত নায়েব রাখিয়াছিলেন ভাবিয়া মনে মনে একটু গর্ব্বিত হইলেন। দারগা কিন্তু যোগেন্দ্রের শেষ কথাগুলির ভাব ও ভঙ্গীতে একটি সঙ্কেত পাইল, চকিতের মধ্যে বুঝিতে পারিল যে যোগেন্দ্রকে চটাইয়া কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবেনা, বরং হাতে আনিবার চেষ্টা করিলে আসিতে পারে। দারগা ইহা বুঝিয়া নরম হইয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে যোগেন্দ্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া বলিল "দেখ, তোমাকে আমি বাঁচাইয়া দিতেছি, তোমার গায়ে কিছুমাত্র আঁচ লাগিবে না, তুমি আমার এই মকদ্দমাটি যাহাতে প্রমাণ হয়, খোকা বাবুই যে তাহার স্ত্রীকে মারিয়া বিষ খাওয়াইয়া মারিআছে তাহা যাহাতে প্রমাণ হয় তাহা কর।" যোগেন্দ্র বলিল "ভাই, এইবার পথে এস, বুদ্ধিমানের মত কাজ কর। তা তোমার চিন্তা কি, দেখত আমি সুন্দর রূপে মকদ্দমা প্রমাণ করাইয়া দিতেছি।" এই কথা-

গুলি বলিয়া যোগেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ কি যেন অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা করিল। ভাবিল "এইবার বুঝিবা এত দিনের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, খোকা বাবুর গদিতে যোগেন্দ্র বিশ্বাস বসে। এই মকদ্দমাটা আর প্রমাণ করিয়া দিতে পারিবনা, নিশ্চয়ই পারিব। আর প্রমাণ হইলে সঙ্গীন মকদ্দমা। হয় ফাঁসি না হয় দ্বীপ চালান। আর এত দূর দণ্ডও যদি না হয় কিছু দিনের জন্যত এখন ঘানি টানাটা নিশ্চয়। সেই সময়ের মধ্যেই যোগেন্দ্র বিশ্বাস সমস্ত ঠিক করিয়া লইবে, বিষয়গুলোত আমার নামেই প্রায় সব লেখা হইয়াছে কেবল একবার নিজ নামে দখল করিয়া লওয়া। এক-বার দখল করিতে পারিলে আর ও আহাম্মকটা কি করিবে? আর হয়ত জেলখানা হইতে ফিরিতে হইবে না। অদৃষ্ট সানুকুল দেখিতেছি।" তাড়িতবৎ এই চিন্তাগুলি খোকা বাবুর বাল্যবন্ধু যোগেন্দ্রের মনে প্রভা-সিত হইল। তাহার পর বন্ধুবর অতি আগ্রহের সহিত মকদ্দমার তদ্বির করিতে আরম্ভ করিল, এমন কি প্রকাশ্য ভাবে যাহাতে খোকা বাবুর বিরুদ্ধে মকদ্দমা প্রমাণ হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। দুই এক-বার খোকা বাবুর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল "ছিঃ খোকাবাবু, তুমি এত-দূর নিষ্ঠুরের কায করিয়াছ, নিজের স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছ, তোমার সাজা হওঁয়াই উচিত।" খোকা বাবুর যাহা কিছু আশা ভরসা ছিল এইবার তাহা নির্ম্মূল হইল। খোকা বাবু বালকের ন্যায় অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তবে কথায় বলে অদৃষ্টের ফল ভাল থাকিলে লোকে শত্রুতা করিয়া কিছু করিতে পারে না। তদন্তে প্রমাণাদি যেরূপ পাওয়া গেল এবং অবস্থা যেরূপ প্রকাশ হইল তাহাতে খোকা বাবু হেমলতাকে মার-পিট করার জন্য হেমলতা স্বহস্তে আফিং খাইয়াছে অপর কেহ তাহাকে খাওয়ায় নাই এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির হইল। এদিকে হেমলতার পিতাও দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া আসিয়া পঁহুছিলেন। তিনি একজন প্রাচীন ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু। প্রথমে তিনি তাঁহার কন্যার হন্তারক নিষ্ঠুর জামা-

তাকে শাস্তি দিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুর হৃদয়ে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি বড় দুর্ব্বল, তাহার উপর খোকা বাবুর মাতার নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহারও বিশ্বাস হইয়াছিল যে হেমলতা স্বহস্তেই, বিষ পান করিয়াছিল। খোকা বাবুর মাতার ক্রন্দনেও তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। খোকা বাবুর উপর মকদ্দমা চালাইলে হেমলতার মৃত দেহ সহরে নীত হইয়া অস্ত্র দ্বারা খণ্ডবিখণ্ডিত হইবে, শাস্ত্রানুযায়ী তাহার সৎকার হইবে না, ইহা ভাবিয়াও তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে তিনি অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়াছে আর মোকদ্দমা করা নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ স্থির করিয়া যাহাতে মিটিয়া যায় সেইরূপই পরামর্শ দিলেন।

এদিকে খোকাবাবুর মাতা দারগার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা, আমার যথা সর্ব্বস্ব তোমাকে দিতেছি আমার ছেলেটিকে বাঁচাইয়া দাও।" দারগার মাথা ঘুরিল, মন ফিরিল, মোকদ্দমা প্রমাণ করিবার জন্য যোগেন্দ্রের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দারগা অবশেষে রিপোর্ট করিল, হেমলতা আত্মহত্যা করিয়াছে কোন সন্দেহের কারণ নাই। সুকুমারীর বিরুদ্ধে মকদ্দমাও মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট করিয়া দারগা তদন্ত শেষ করিয়া স্বস্থানে ফিরিল। বামে শৃগাল দেখিয়া দারগা এই তদন্তে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু দোষ, কাহার? দারগার, না লোকের?

গোলমাল মিটিয়া গেল। কিন্তু খোকা বাবু যোগেন্দ্রকে স্পষ্টতঃ বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখিয়া তাহার উপর খাপ্পা হইয়া উঠিল। "হাঁ, বেটা আমার অন্নে প্রতিপালিত, আর আমারই অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করে, জানেনা কে আমি, আমি যদি লাঠিয়াল দিয়া বেটার শির না লই, আমি বাপের বেটা নই। বেটা ভাবে সে না হলে আমার চলে না। এইত ও বেটা শত্রুতা করিয়া আমার কি করিল?" যোগেন্দ্রের প্রতি

খোকা বাবুর মনের ভাব এখন এই রূপ। বাস্তবিক এই মোকদ্দমায় নিষ্কৃতি পাইয়া খোকাবাবুর আত্মবাহাদুরিত্বে বিশ্বাস বড়ই প্রবল হইল, দুর্বৃত্তপনাও অনেক বৃদ্ধি পাইল। যোগেন্দ্রের উপর বিদ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারীর উপর বিদ্বেষও ঘোরতর হইল। সুকুমারীর জন্যই ত এতটা। তাহার সর্ব্বনাশ করিতেই হইবে! সুকুমারীর সর্ব্বনাশ ও যোগেন্দ্রের মুণ্ডপাত, ইহাই খোকাবাবুর দিবারাত্রি জল্পনার বিষয় হইল। ইহার জন্য যদি তাঁহাকে ফাঁসি কাষ্ঠেও ঝুলিতে হয় তাহাতেও প্রস্তুত। নানারূপ ষড়যন্ত্র ও উদ্যম চলিতে লাগিল। মাঠে, ঘাটে, অন্ধকারে যোগেন্দ্রের উপর দুই একবার আক্রমনও হইল। যোগেন্দ্র দেখিল খোকা বাবুকে লইয়া তাহার খেলা সাঙ্গ হইয়াছে, এখন অন্য খেলা আরম্ভ করিতে হইবে। যে জাল ফেলিয়াছে এখন তাহা টানিলে ছিঁড়িয়া যাইবে। এখন সময় ও লোক প্রতিকূল। অতএব কিছুদিনের জন্য অপেক্ষা করা উচিত; কালে বাতাস ফিরিবে, লোক অনুকূল হইবে, তখন জাল টানিয়া তুলিবার সময় হইবে। কিন্তু অপেক্ষা করিয়া যে থাকিবে কি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া? অবশ্য বুদ্ধির অভাব না থাকিলে কখন কার্য্যের অভাব হয় না। যোগেন্দ্র গোপাল ও সুকুমারীর সহিত সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে খোকাবাবুর নিযুক্ত লাঠিয়াল কর্তৃক আহত হইয়া যোগেন্দ্র অতি শঙ্কিত ও শশব্যস্তভাবে গোপালের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া ফুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "ভাই, আর ত এ গ্রামে থাকিতে পারি না, এই দেখ বাবুর লাঠিয়াল আমাকে খুন করিবার উপক্রম করিয়াছিল; মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে, আর একটু হইলে মরিয়া যাইতাম। আর শুধু আমাকে নয়, লাঠিয়াল বেটারা চীৎকার করিয়া বলিল যে, তাহারা আমাকে খুন করিবে, তোমার নাক কাণ কাটিয়া দেবে, এবং তাহার পর সুকুমারীর জাতি মান নাশ করিবে। চল ভাই,

আর এ গ্রামে বাস করিয়া কায নাই আমরা অন্যত্র পলাইয়া যাই।” গোপাল যোগেন্দ্রকে এতদিন শত্রুই ভাবিত। কিন্তু শত্রুকেও বিপদাপন্ন হইয়া আত্মদুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক সহানুভূতির প্রার্থী দেখিলে সরল-চিত্ত ব্যক্তি শত্রুতা বিস্মৃত হয়। অন্ধকার রাত্রিতে যোগেন্দ্রকে সেই রূপ রুধিরাক্ত অবস্থায় হঠাৎ দেখিয়া সরল প্রাণ গোপালের চিত্তেও সহানুভূতির উদয় হইল। আবার যোগেন্দ্রের সহিত ভয়ের সমকারণ থাকায় সে সহানুভূতি শীঘ্রই গাঢ়তর হইয়া যোগেন্দ্রর সমকার্য্যানুবর্ত্তক হইতে প্রবৃত্তি দিল। গোপাল ভীত ভাবে বলিল, “তাই ত, এরূপ অত্যাচার! এখন উপায়!” যোগেন্দ্র বলিল, উপায় একমাত্র গ্রাম হইতে পলায়ন, আমি ত যাইবই, মানভূম জেলায় আমার মামা শ্বশুর কার্য্য করেন, আমি সেই স্থানে যাইব। প্রথম একলা যাইয়া একটা চাকরী বাকরীর যোগাড় করিয়া তাহার পর স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইব, এ গ্রামে আর বাস করিবনা। তবে যদি ভগবান কখনও দিন দেন, দেখা যাবে; উঃ কি ভয়ঙ্কর লোক, যে আপনার স্ত্রী হত্যা করিতে পারে সে কি না পারে! দেখ গোপাল তোমরা হয়ত মনে কর, আমিই তোমাদের উপর এত অত্যাচার করিয়াছি। ভাই তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি আমি যদি জ্ঞাতসারে কোন অপরাধ করিয়া থাকি। খোকাবাবু আমাকে বারবার বলিতে লাগিল যে, সুকুমারীর নিকট অনেক খাজনা বাকী পড়িয়াছে; আমি তাহার চাকর, আমি তাকাদা না করিলে আমার ধর্ম্ম থাকে কেমন করিয়া বল। তাহার পর আমাকে বলিল যে, সুকুমারী গহনা ও টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই সুকুমারী সে দিন বাবুদের বাটী হইতে টাকা গহনা আনিয়াছিল। এখন বাড়ীর ভিতর কি হইয়াছে, ধার দিয়াছে কি চুরি হইয়াছে, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? আমাকে যেরূপ বলিল আমি সেইরূপ বুঝিলাম, ইহাতে ভাই আমার দোষ কি বল দেখি! এসব মিথ্যা জানিলে কি আমি কোন রূপ সহায়তা করিতাম,

তেমন লোক আমাকে ভাবিওনা। এই যে খোকাবাবু খুনের দায়ে পড়িয়াছিল, আমি কি তাহার সহায়তা করিলাম, আমার বিশ্বাস হইল যে, সে বাস্তবিকই আপনার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে, এমন কায যে করে সে যেই হউক না, তার শাস্তি হওয়াই উচিত, সেই জন্য তার বিরুদ্ধে কত চেষ্টা করিলাম দেখিলে ত। আমি যাহা সত্য বুঝি, সেইমত কার্য্য করি, তাতে কাহারও খাতির রাখি না।" সরল চিত্ত গোপাল ভাবিল "যোগেন্দ্র যাহা বলিল তাত ঠিকই, উহার দোষ কি, উহার বুদ্ধিতেই যদি সব হইত, তবে শেষ কালে সে খোকা বাবুর বিরোধী হইবে কেন? এখন দেখি তাহারও বিপদ, আমাদেরও বিপদ। এখন উপায় কি? যোগেন্দ্র না হয় পলাইল, আমরা পলাই কি করিয়া।"

যখন যোগেন্দ্র ও গোপালের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে ছিল সুকুমারী তখন গৃহে থাকেন নাই, বাড়ীর নিকটস্থ পুরাতন দেবমন্দিরে ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন, ভ্রাতা শরৎও সঙ্গে ছিল। যখন গোপাল অবনত মস্তকে ভাবিতেছে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, সেই সময়ে সুকুমারী এক হস্তে শরতের একটি আঙ্গুল ধরিয়া, অপর হস্তে একটি প্রদীপ লইয়া প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। সুকুমারীকে দেখিয়া যোগেন্দ্র দৌড়িয়া যাইয়া তাহার পদতলের নিকট পতিত হইল এবং কাতর স্বরে বলিল, "আপনি সচ্চরিত্রা ব্রাহ্মণ-কন্যা,আপনার নিকট আমি শত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু ভগবান জানেন, না জানিয়া শুনিয়া করিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি যাহার কথামত করিয়াছি সে যে এতদুর পাপিষ্ঠ তা জানিতাম না, আমি বুঝিয়াছিলাম সকলই সত্য। আমি যাহার এত দিন ধরিয়া এত উপকার করিলাম, সেই দেখ আমার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে, আবার তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।" সুকুমারী শিহরিয়া উঠিলেন। "এ আবার কি ব্যাপার! এ যে দেখিতেছি যোগেন্দ্র বিশ্বাস, ইহার মাথায় মুখে রক্ত, কে ইহাকে

মারিয়াছে ? আমাদের সর্ব্বনাশ আবার কি করিবে ? এই সকল চিন্তায় সুকুমারীর মন আলোড়িত হইল। সুকুমারী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল দাদা, কি হইয়াছে ? গোপাল সকল কথা বলিলেন। সুকুমারী ভীতা ও চিন্তিতা হইলেন। গোপাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া যোগেন্দ্রকে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার পালাইবার স্থান আছে, আমরা পালাইব কোথায়, আমাদের ত কোন স্থান নাই।" যোগেন্দ্র বলিল, "সে ভাই ভাবিয়া দেখ। কিন্তু তোমাদিগকে বলিতেছি কিছুদিনের জন্য পালাও, নচেৎ নিস্তার নাই। আমি কি সহজে ভয় পাইবার লোক, কিন্তু আমার মাথা ফাটাইয়া দিল, তথাপি আমি পালাইতেছি, কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছি না। ইহাতেই বুঝিতেছ না ব্যাপারটা কি ! খোকা বাবু "মরিয়া" হইয়া উঠিয়াছে, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দস্যু ডাকাত লাঠিয়াল একত্র করিয়াছে, ইহাদের অসাধ্য কায কিছুই নাই। তা না হইলে আমি পালাই। তোমরাও পালাও, নতুবা সর্ব্বনাশ।" গোপালের ভয়ে হৃৎকম্প হইতে লাগিল। সুকুমারী স্তম্ভিতা হইয়া রহিলেন। যোগেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কিছুদিনের জন্য কোথাও কি যাইয়া থাকিবার স্থান নাই ? আচ্ছা, সুকুমারীর মাতার শ্রাদ্ধের সময় যে লোকটী টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল শুনিয়াছিলাম, তাহার বাড়ীতে যাইয়া কি কিছুদিন থাকিতে পার না ? এই কথায় গোপাল ও সুকুমারীর মন যেন হঠাৎ আশার আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল।

গোপালচন্দ্র বলিলেন, "তা হইতে পারে, কি বল সুকুমারী ?" সুকুমারীও সায় দিলেন। গোপাল কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া আবার বলিলেন, "আচ্ছা, আমাদের আলাপ শুদ্ধ বিনয় বাবুর সহিত। তিনি বাড়ীতে থাকেন না, শুনিতেছি তিনি পশ্চিমে আছেন, এমন অবস্থায় তাঁহাদের বাড়ীতে যাই কি করিয়া, সেখানকার লোকে কি বলিবে।"

যো। তা বেশ ত তোমরা না হয় পশ্চিমে যাইবে, সে ত আরও সুবিধা হইবে, আমিও পশ্চিমে যাইব তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব। তিনি কোন্ ঠিকানায় আছেন জান ত?

গো। হাঁ তা জানি, তিনি ইস্লামাবাদে থাকেন। যোগেশ বাবু নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সেখানে কার্য্য করেন।

যো। দেখ তোমরা যদি রাজি হও, আমি তোমাদিগকে সেখানে পঁহুছিয়া দিতে পারি, তোমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। আর যদি ভাল চাও, তোমরা শীঘ্র পলাইবার চেষ্টা কর, যাহাতে দুই এক দিনের মধ্যেই পলাইতে পার, সেইরূপ বন্দোবস্ত কর।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র চলিয়া গেল। গোপাল ও সুকুমারীর মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। উভয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাওয়াই স্থির করিল। গোপালের মন শান্ত হইল, তাহারি এক একবার আশাও হইতেছিল পশ্চিমে যাইলে বিনয় বাবুর সাহায্যে হয়ত একটা চাকরী বাকরীরও সুবিধা হইতে পারে। যোগেন্দ্র মানভূমে যাইয়া চাকরী করিবে এই কথা শুনিয়াই গোপালের মনে এইরূপ আশার উদয় হয়। সুকুমারীর মনটা কিন্তু কেমন ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করিতে লাগিল!

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহত্যাগ—শঠে সরলে।

এক দিন রাত্রি শেষে গোপাল, সুকুমারী ও বালক শরৎ তাহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইল। সঙ্গে একটী মোটবাহী, ষ্টেসন পর্য্যন্ত তাহা-দিগকে পঁহুছাইয়া দিবে। গ্রামের বাহিরে, পথে, যোগেন্দ্রের সহিত তাহাদের দেখা হইবে এইরূপ কথা আছে। বালক শরৎ নূতন স্থানে যাইতেছে, কলের গাড়ীতে চাপিবে, এই সকল ভাবিয়া বড় আনন্দিত। গোপালের চিত্তও বালকের ন্যায় সরল; নূতন স্থানে যাইতেছেন, কত কি নূতন দেখিবেন ভাবিয়া তাঁহারও মন কতকটা উৎফুল্ল, বিশেষতঃ এক একবার চাকরীর আশা জাগরিত হইয়া সে উৎফুল্লতা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। তিনি একবার সুকুমারীকে বলিলেন, "দেখ সুকুমারী, হয় ত আমাদের শাপে বর হইল, যদি আমার একটা কোন প্রকার কায কর্ম্ম জুটিয়া যায় তাহা হইলে পশ্চিমেই কিছুদিন থাকিব, আর শরৎকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিব, তাহা হইলে ওরও গ্রামে থাকা অপেক্ষা লেখা পড়ার অনেক সুবিধা হইবে। আর পশ্চিমে যাইলে এ'টা না একটা কায নিশ্চয়ই জুটিবে।" সুকুমারীর মন কিন্তু অমানিশার অন্ধকারে পূর্ণ, তাহাতে কোন প্রকার আশালোক দেখা যাইতেছে না। যখন সুকু-মারী এক একটী গৃহ তালা বন্ধ করিলেন, তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন এক একটী চিরসুহৃদের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন; নয়নদ্বয় বাষ্পে পূর্ণ হইতে লাগিল। যখন বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহির দরজায় চাবি দিলেন, তখন যেন একবারে হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, মনে হইল যেন এক মাত্র আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া অগাধ সমুদ্রে

ঝাঁপ দিলেন। তখন স্বর্গীয়া মাতাকে স্মরণ হইল, প্রবল বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, এবং ভাবিলেন "মা তোমা বিনা আমাদের এই দুর্দ্দশা; এই অবোধ শিশুকে লইয়া কোথায় যাইব, কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অদৃষ্টে কি আছে জানি না, এখন মা দুর্গা যা করেন।"

এইরূপ মানসিক অবস্থায় সুকুমারী গোপালের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই যোগেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যোগেন্দ্র ও গোপালচন্দ্র অনেক প্রকার কথাবার্ত্তা করিতে করিতে চলিতে লাগিল। যোগেন্দ্র, পশ্চিমে যাইয়া কত লোকের চাকরী হইয়াছে, অদৃষ্ট ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিতে লাগিল, গোপালচন্দ্র তৃষিত প্রাণে সেই সকল গল্প শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিলেন। সুকুমারী নীরবে, কখন ভ্রাতাটিকে কোলে তুলিয়া, কখন তাহার হাত ধরিয়া, তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তাহারা তিন চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিল, এবং বেলা প্রায় ১১টার সময় মেমারি রেলওয়ে ষ্টেসনে পঁহুছিল। ষ্টেসন সে সময়ে খুব জমকাল হইয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই একখানি কলিকাতার যাত্রী-গাড়ী আসিবে, চারিদিকে লোক ছুটাছুটী করিতেছে, টিকিট লইবার ঘরে ভীড় লাগিয়াছে, এক একটী মেয়ের দল পরস্পরের আঁচল ধরাধরি করিয়া কোলাহল করিতে করিতে ভীত ও ব্যস্তভাবে "এইটী কি তিরবেনীর গাড়ী বাবা?" প্রশ্ন করিতে করিতে ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ষ্টেসনের বাবুরা ধড়াচূড়া বাঁধিতেছে, দৃষ্টিপথান্তর্ভূত ধাবমান গাড়ীদর্শনোৎসুক বালকবৃন্দের সাক্ষাৎ যম স্বরূপ জমাদার সাহেব শ্বেতনীল মুরাঠায় মস্তক মণ্ডিত করিয়া প্লাটফর্ম প্রান্তে নাগরাশোভিত পদের সগর্ব্ব বিক্ষেপে বিচরণ করিতেছে, পান দেশালাই চুরটওয়ালা, পূরিমেঠাই ওয়ালা, রুটি কাবাবওয়ালা প্রভৃতি সকলে একে একে আসিয়া জমি-

তেছে। এইরূপ সময়ে সুকুমারী প্রভৃতি আসিয়া ষ্টেসনে পঁহুছিল। যোগেন্দ্র ষ্টেসনে অতি পরিচিত লোক; প্রশান্ত মনে একটী দোকানে উঠিল, পার্শ্বে একটী পরদা দেওয়া বারন্দায় সুকুমারীকে বসিতে বলিয়া নিজে দোকানসম্মুখস্থ এক কেরোসিন তেলের বাক্সর উপর উপবেশন পূর্ব্বক এক হুকা গ্রহণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তীর একজনের হুকা হইতে কলিকা উঠাইয়া লইয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিল। দোকানদার যোগেন্দ্রের দিকে একবার দৃষ্টি করিয়া 'কি গো কোথা হতে' এই প্রশ্ন মাত্রের পর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আপন খরিদ্দারের হুকুম তামেল করিতে লাগিল। বালক শরৎ নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়াছিল, কিন্তু ষ্টেসনে পঁহুছিয়াই সে সকল ভুলিয়া গেল, এবং কাহার ও কথা না মানিয়া একবারে ষ্টেসনের দিকে ছুটিল। সুকুমারী ব্যস্ত ভাবে বলিল "গোপাল দাদা শরৎকে দেখ, যেন কোথাও গোলমালে না যায়।" গোপাল শরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ষ্টেসনের নিকট দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে লৌহাশ্ব ভীমবেগে হুঙ্কার করিতে করিতে আসিয়া ষ্টেসনে প্রবেশ করিল। বালক শরৎ ও গোপালচন্দ্র উভয়েরই হৃদয় গুড়গুড় করিয়া উঠিল, উভয়েই ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে অদ্ভুত অসীম প্রতাপ শালী জীববৎ প্রতীয়মান এঞ্জিনের দিকে তাকাইয়া রহিল, এঞ্জিন খানি একটু বিরাম করিয়া হঠাৎ শ্রুতিবিদারক তীব্র ধ্বনি তুলিয়া কতকটা ধূমোদ্গীরণ করিয়া ফেলিল, এ ব্যাপারে গোপালচন্দ্র ভয়ে কয়েক পা পিছিয়া পড়িলেন, শরৎ চমকিয়া উঠিয়া সটান এক ছুট লাগাইল, কিয়দ্দূর যাইয়া ভয় প্রশমিত হইলে আবার ফিরিয়া আসিল। গাড়ীতে কয়েকটি সহরবাসী যুবক ছিল, তাহারা গোপাল ও শরতের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাদিগকে পাড়াগেঁয়ে ভাবিয়া খুব হাসিল।

হাসিলে বটে, কিন্তু হে সহরবাসী সৌখীন যুবকবৃন্দ, তোমরা অনেক

দেখিয়াছ শুনিয়াছ, অনেক গাড়ীতে চাপিয়াছ বলিয়া যে ক্ষুদ্র অভিমান-টুকু রাখ, তাহা একবার ভুলিয়া, একটু ভাবিয়া দেখ দেখি এই এঞ্জিন, এই বাষ্পীয় রথ কি এক অপূর্ব্ব প্রভাবশালী জাতির অসীম শক্তি, অপরিমেয় বুদ্ধি ও অদ্ভুত কার্য্যকুশলতার স্মরণ করাইয়া দিতে দিতে, তোমাদিগকে যেন তুচ্ছ করিয়া, তোমাদের ক্ষীণতা, হীনতা, বুঝাইয়া দিতে দিতে, রুধির শোষণ করিতে করিতে, ভারতবক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বীরদর্পে ছুটিতেছে না? সে দর্প কি দেখিতে পাও? *সে দর্প ভাবিলে, সে হুঙ্কার স্মরণ করিলে কি, গোপাল ও শরতের ন্যায় হৃদয় গুড়্ গুড়্ করিয়া উঠে না?* *তোমাদের বাহিরের* ভয় কাটিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে কি ইহা অনুভব কর না?

গোপাল ও শরৎ যখন এইরূপ গাড়ী দেখিতেছিল সুকুমারীও তখন দোকানগৃহের পরদান্তরাল হইতে ষ্টেসনের দিকে নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়াছিলেন। ষ্টেসনের কোলাহলে, গাড়ীর শোঁ শোঁ শব্দে, নানা প্রকারের লোক দর্শনে, কিছুক্ষণের জন্য তিনি নিজাবস্থা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, মনের মলিনতা ঘুচিয়াছিল। নূতনত্বের এমনি মহিমা! ক্রমে গাড়ী চলিয়া গেল, কোলাহল শেষ হইল। ষ্টেসন একবারে নীরব নির্জ্জনপ্রায় হইল। বংশে কীর্ত্তিমান্ পুরুষের আবির্ভাবে সংসারটি যেমন কার্য্যময় কোলাহলময় ঝঞ্ঝাটময় এবং লোকপূর্ণ হইয়া থাকে, আবার তাঁহার তিরোভাবে কে কোথায় আপন আপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চলিয়া যায়, প্রকাণ্ড বাড়ী লোকশূন্য হইয়া খা খা করিতে থাকে, এক প্রান্তে হয়ত একাকিনী বিধবা অপোগণ্ড শিশুর ভবিষ্যদুন্নতির আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকে, রেলওয়ে ষ্টেশনগুলির অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। এক এক খানি গাড়ীর আগমনে কত লোক কত প্রকার মানসে ছুটিয়া আসে, গাড়ী চলিয়া যায় তাহারা তিরোহিত হয়,

প্রকাণ্ড ষ্টেশন ফাঁক হইয়া যায়, কোথায় আপিস ঘরের এক কোণে বসিয়া তার-বাবু ঘুট ঘুট করে, ও দ্বিতীয় গাড়ীর অপেক্ষা করিতে থাকে।

ষ্টেশনের কোলাহলের নিবৃত্তির সঙ্গে সুকুমারীও নিবিষ্ট-চিত্ততা শেষ হইল। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন, নিজাবস্থা অধিক কষ্টকর রূপে স্মরণপথে উদিত হইল। কিন্তু আর গালে হাত দিয়া ভাবিবার সময় নাই। শরৎ ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, তাহার মুখ শুকাইয়াছে। শরৎ ফুল্লমনে দিদির নিকট গাড়ী সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া সুকুমারীর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। সুকুমারী গোপালকে ডাকিয়া শীঘ্র আহারাদির কোন বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। যোগেন্দ্র তৎপর সকল ব্যবস্থা করিয়া দিল। যোগেন্দ্রের নিকট দোকানদারের কিছু প্রাপ্য থাকায় সে প্রথমে ধারে কোন দ্রব্যাদি দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু এবার যোগেন্দ্র ১টা টাকা প্রথমেই নগদ ফেলিয়া দেওয়ায় আর তাহার আপত্তি রহিল না। সুকুমারী রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াই-লেন, কিন্তু যোগেন্দ্রের পাতে অন্ন দিবার সময় তাঁহার কি এক প্রকার তীব্র কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, পার্ব্বতীকে ঝাঁটা মারার দিনের সায়ং-কালের সমস্ত ঘটনাটি মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার অন্তরের ভিতর যেন বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু সে কষ্ট চাপিয়া রাখিয়াও তিনি যোগেন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিয়া খাওয়াইলেন।

পশ্চিম যাইবার গাড়ী ৬টার সময়। সেই গাড়ীতে যাইবার জন্য যোগেন্দ্র সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিল, এবং গাড়ীর সময় নিকটবর্ত্তী হইলে টিকিটের টাকা হিসাব করিয়া গোপালের নিকট লইল। বলা বাহুল্য যে, যাহা যথার্থ লাগিবে তদপেক্ষা কিছু বেশী লইয়াছিল। টাকা লইয়া যোগেন্দ্র সকলের জন্য টিকিট কিনিয়া আনিল এবং গোপাল ও

সুকুমারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তোমাদের কোন চিন্তা নাই আমি তোমাদিগকে ঠিক স্থানে পঁহুছাইয়া দিব, কোন কষ্ট হইবে না, কেবল আমি যা বলি সেইরূপ করিবে। টিকিট সব আমার নিকট থাকুক, তোমরা হারাইয়া ফেলিবে।" যোগেন্দ্র যে এ সকল কাযে বিশেষ পটু গোপালের সে ধারণা সম্পূর্ণই ছিল, তাহার উপর যোগেন্দ্রের যত্ন ও আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাহার প্রতি গোপালের বিশ্বাস ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতেছিল, অতএব কোন বিষয়েই গোপাল আর দ্বিরুক্তি করিল না। ক্রমে গাড়ী আসিল। যোগেন্দ্র অগ্রে গোপালকে একটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া বলিল, "তুমি এই খানে থাক, আমি সুকুমারীকে স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠাইয়া দিইগে, বর্দ্ধমান ষ্টেশনে নামিয়া আমি আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" এই বলিয়া যোগেন্দ্র সুকুমারীকে স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠাইয়া দিল ; স্ত্রীলোকের গাড়ী একবারে খালি ছিল, অতএব বালক শরৎকেও সেই গাড়ীতে উঠাইয়া দিল ; এবং নিজে পার্শ্বের গাড়ীতে উঠিল। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী পঁহুছিলে যোগেন্দ্র নামিয়া আসিয়া গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। গোপাল ষ্টেশনের জাঁকজমক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, লোক জনের হুড়োহুড়ী, দলেদলে সাহেব মেম, প্রভৃতি দেখিয়া একবারে হতভম্ব হইয়া গাড়ীর এক কোণে বসিয়াছিল। যোগেন্দ্র আসিয়া বলিল, "বড় লোকের ভীড়, তুমি আর নামিও না, আমি সুকুমারী ও শরৎকে বেশ আরামে বসাইয়াছি, তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি কিছু জলখাবার কিনি আনি। ইহার পর আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।" এই বলিয়া যোগেন্দ্র জলখাবার কিনিতে গেল, যাইতে যাইতে অনেক পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইল, কথাবার্ত্তাও করিল। গোপাল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বাঃ, যোগেন্দ্র কি বাহাদুর, এই সাহেব সুবোর মাঝ দিয়া অম্লান বদনে যাইতেছে, আর আলাপই কত লোকের সহিত, এরূপ

সেই গাড়ীতে উঠাইয়া দিল, নিজে পার্শ্বের গাড়ীতে উঠিল। বৰ্দ্ধমান ষ্টেসনে গাড়ী পঁহুছিলে যোগেন্দ্র নামিয়া আসিয়া গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। গোপাল ষ্টেশনের জাকজমক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী লোকজনের হুড়োহুড়ি, দলে দলে সাহেব মেম প্রভৃতি দেখিয়া একবারে হতভম্ব হইয়া, গাড়ীর এক কোণে বসিয়াছিল। যোগেন্দ্র আসিয়া বলিল, "দেখ, বড় লোকের ভীড়, তুমি আর নামিও না, আমি সুকুমারী ও শরৎকে বেশ আরামে বসাইয়াছি, তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি কিছু জল খাবার কিনিয়া আনি, ইহার পর আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।" এই বলিয়া যোগেন্দ্র জল খাবার কিনিতে গেল, যাইতে যাইতে অনেক পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইল, কথাবার্ত্তাও করিল। গোপাল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বাঃ, যোগেন্দ্র কি বাহাদুর, এই সাহেব সুবোর মাঝ দিয়া অম্লান বদনে যাইতেছে, আর আলাপই কত লোকের সহিত, এরূপ লোকের সঙ্গে না হইলে কি গাড়ীর রাস্তায় কোথাও যাইতে আছে?" যোগেন্দ্র জলখাবার লইয়া ফিরিল, এবং গোপালের হাতে কিছু খাবার দিয়া বলিল—"দেখ, এইবার জংশন ষ্টেশনে গাড়ী থামিবে, আমাদিগকে সেইখানে নামিয়া আর এক গাড়ীতে উঠিতে হইবে।" তুমি গাড়ী থামিলেই নামিয়া পড়িবে, কোন মতে বিলম্ব করিবে না এবং যেখানে নামিবে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, আমি তোমাকে আসিয়া ডাকিয়া লইব। তুমি ঘুরিয়া বেড়াইলে হয়ত খুঁজিয়া পাইব না।" গোপাল বলিলেন "আচ্ছা তা আমি ঠিক যেখানে নামিব সেইখানেই থাকিব, এক পা এদিক ওদিক যাইব না।" যোগেন্দ্র তখন চলিয়া গেল এবং কিছু মিষ্টান্ন শরতের হাতে দিয়া সুকুমারীকে তাহা ভাল করিয়া রাখিতে বলিয়া, নিজের গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, এবং দেখিতে দেখিতে জংসন ষ্টেশনে পৌঁছুছিল। গোপালচন্দ্র সত্বর গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া

রহিলেন; এখন বেশ মুখ আঁধারি হইয়াছে। কয়েকটী মাত্র লোক নামা উঠা করিল, এবং মুহূর্ত্ত কয়েকের মধ্যেই গাড়ী আবার ছাড়িয়া দিল। সুদীর্ঘ গাড়ীখানির এক প্রান্ত হইতে কয়েকটী পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক নামিয়াছিল। গোপাল দূর হইতে, তাহাদের মধ্যেই যোগেন্দ্র ও সুকুমারী এবং শরৎ আছে ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া যে স্থানে নামিয়াছিলেন সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে যে লোকগুলি গোপালের নিকট হইয়া চলিয়া গেল; গোপাল দেখিলেন তাহাদের মধ্যে যোগেন্দ্র, সুকুমারী বা শরৎ কেহই নাই। গোপাল বিস্মিত হইলেন। প্লাটফর্ম্মে আর তখন কোন লোক নাই। কি হইল, ইহারা কোথায় গেল এইরূপ ভাবিয়া গোপাল ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, যে লোকগুলি তাঁহার নিকট হইয়া চলিয়া গেল, পুনরায় তাহাদের নিকট ছুটিয়া গেলেন, সুকুমারী প্রভৃতি কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বেগে ষ্টেসনের দিকে যাইয়া, অতি কাতর ভাবে একজন ষ্টেসনের কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় একটী স্ত্রীলোক একটী বালক এবং যোগেন্দ্র বিশ্বাস নামে একটী পুরুষ এই গাড়ী হইতে নামিয়াছে তাহাদিগকে কি দেখিয়াছেন?" কর্ম্মচারী বলিল, "যে কয়েকটী লোক নামিয়াছে তাহারা ঐ যাইতেছে দেখুন না।"

গোপাল। উহাদের মধ্যে তাহারা নাই আমি বেশ করিয়া দেখিয়াছি।

কর্ম্মচারী। তবে আর কোন লোক ত বাপু এ গাড়ী হইতে নামে নাই।

গো। সে কি মহাশয়, আর কেহ নামে নাই?—তবে কি——।

গোপালের বাক্য রোধ হইল, বিকট বজ্রাগ্নির ন্যায় মনের মধ্যে এক বিষম জ্বালাময় আলোক উদ্ভাসিত হইল; আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন মাথায় পড়িল, গোপাল বসিয়া পড়িলেন। তখনও গাড়ী খানি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি-

বহির্ভূত হয় নাই, পশ্চাতের আলোক বেশ দেখা যাইতেছে। গোপাল সতৃষ্ণনয়নে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনের আবেগে, "মহাশয় গাড়ী কি একবার থামিবে না?" বলিয়া সেই দিকে দ্রুতবেগে ছুটিয়া গেলেন। নিকটে যাহারা ছিল তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "লোকটা কি পাগল না কি।" যে কর্ম্মচারীটীর সহিত কথা হইতেছিল তিনি বলিলেন, "না পাগল নয়, ভিতরে কিছু কথা আছে। যাও ত খালাসী, লোকটীকে লইয়া এস ত, ব্যাপারখানা কি জিজ্ঞাসা করা যাউক।" একজন খালাসী দ্রুত গোপালের অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিল—"আরে মশায়, তুমি পাগল না কি, ছুটিয়া যাইয়া গাড়ী ধরিবে? কি হয়েচে কি বল দেখি?"

গো। অ্যাঁ, অ্যাঁ, গাড়ী থামিবে না, থামিবে না, কোথাও থামিবে না?

খালাসী। হাঁ থামিবে, ইহার পরের ষ্টেসনে, এখান হতে সে ১২ ক্রোশ।

গোপাল পুনরায় বসিয়া পড়িলেন, ও বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। খালাসী বলিল, "মশায়, অমন করে কাঁদিলে আর কি হবে, কি হয়েচে আপিসের বাবুদিগকে বলিবে চল, যদি কোন উপায় হয়। গোপাল উপায়ের কথা শুনিয়া উঠিয়া আগ্রহ সহকারে ষ্টেসনের কর্ম্মচারীদের নিকট গেলেন। ষ্টেশন মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় কোথা হতে আসচেন?

গো। মেমারি হইতে।

ষ্টে. মা। কোন্ গাড়ীতে?

গো। এই গাড়ীতেই।

ষ্টে. মা। কোথায় যাচ্ছিলেন?

গো। যাচ্ছিলাম যাচ্ছিলাম—স্থানটার নাম মশায় মনে হয় না—পশ্চিমে, যেখানে বিনয় বাবু আছে—নামটা মনে পড়িল না।

ষ্টে. মা। আপনি ত আচ্ছা লোক মশায়, কোথা যাচ্ছিলেন তা বলিতে পারেন নাই? টিকিট আছে? দেখি টিকিট খানা।

গো। টিকিট মশায় আমার সঙ্গে নাই, তার সঙ্গে আছে।

অন্যতম কর্ম্মচারী। দেখুন মশায়—টিকিট না লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া তাহার পর পলাইবার জন্য এই সব ভাণ করিতেছে—তা না হলে অমন করিয়া ছুটিয়া যায়?

ষ্টে. মা। না হে না, লোকটার চেহারায় বুঝিতে পারিতেছ না? পলাইবার ইচ্ছা থাকিলে ত অনায়াসে কোন গোলমাল না করিয়া পলাইতে পারিত। (গোপালের প্রতি) আচ্ছা, মশায়, আপনি সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বলুন দেখি কি হইয়াছে, তবে বুঝিতে পারি।

গোপাল আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। সকলে শুনিয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। গোপাল হঠাৎ ষ্টেশন মাষ্টারের পদতলের নিকট পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মহাশয় ইহার কিছু উপায় করিয়া দেন নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

ষ্টে. মা। মশায়, কি করেন, কি করেন, আপনি ব্রাহ্মণ দেখিতেছি, পায়ে ধরেন কি, উঠুন উঠুন। এই বলিয়া ষ্টেশনমাষ্টার গোপালকে ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং গোপালকে একটু স্থির হইয়া বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "দেখি আমাদের হইতে যতটুকু হইতে পারে করি। ওহে তারবাবু পরের ষ্টেশনে গাড়ী পঁহুছিতে এখনও বিলম্ব আছে, একটা সংবাদ দিয়ে দাও দেখি, যে সুকুমারী নামে একটি স্ত্রীলোক ও শরৎ নামে একটী বালক স্ত্রীলোকের গাড়ীতে আছে, তাহাদিগকে যোগেন্দ্র বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, ঐ স্ত্রীলোক ও বালককে যেন নামাইয়া রাখা হয়, পরের

গাড়ীতে তাহাদের ভ্রাতা গোপালচন্দ্র যাইবে।" সংবাদ চলিয়া গেল। গোপাল একটু আশান্বিত হইয়া স্থির হইলেন, পরের গাড়ী কতক্ষণে আসিবে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, পরের ষ্টেশনে পৌঁছিলে নিশ্চয়ই শরৎ ও সুকুমারীকে দেখিতে পাইবেন। ষ্টেশনমাষ্টার কিছুক্ষণ পরে তার বাবুকে পুনরায় কি হইল তাহার সংবাদ লইতে বলিলেন। তার বাবু তার যোগে জিজ্ঞাসা করিলেন সুকুমারী প্রভৃতিকে পাওয়া গিয়াছে কি না। উত্তর আসিল "তাহাদের কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যায় নাই। স্ত্রীলোকের গাড়ীতে কেহই থাকে নাই"—বাস্তবিক যোগেন্দ্র চতুরতা পূর্ব্বক ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিবামাত্র তাহাদিগকে অন্য গাড়ীতে লইয়াছিল। গোপাল সংবাদ শুনিয়া পুনরায় বজ্রাহতের ন্যায় পড়িলেন ও নিতান্ত শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরতায় ষ্টেশনমাষ্টার ও সকলে ব্যথিত হইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি এত কাতর হইতেছেন কেন বুঝিতেছি না, সে স্ত্রীলোক ও বালকটি ত আপনার নিজের ভাই ভগিনী নহে।"

গো। মহাশয়, আমার নিজের ভাই ভগিনী অপেক্ষাও অধিক। আহা তাহাদের মা মৃত্যু-শয্যায় আমার হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিল, আর আমি পামর কি করিলাম, তাহাদিগকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলাম, উঃ উঃ (হস্তদ্বারা মুখ আবরন করিয়া ক্রন্দন)।

ষ্টে. মা। আচ্ছা, মশায়, আপনি দুঃখিত হবেন না, কিন্তু আপনার কথায় আমরা যতদূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে স্ত্রীলোকটির যে বিনা অভিমতিতে তাহাকে এরূপ করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহা ত বোধ হয় না। তাহা কি কখন সম্ভব হয় ? আমার বিবেচনায় তাহারা দুইজনে যোগ করিয়া কৌশলে আপনাকে এইরূপ পশ্চাৎ ফেলিয়া পলাইয়াছে। এই দেখুন না, আমি ত নাম টাম সমস্ত দিয়া সংবাদ দিয়াছিলাম, অবশ্যই পরের ষ্টেশনে স্ত্রীলোকের গাড়ীতে তাহার নাম করিয়া ডাকিয়াছে, যদি

তাহার যাবার ইচ্ছা না থাকিত তা হলে ত সে সেই খানেই নামিত। নাম টাম সমস্ত গোপন করিয়াছে সেই জন্য কোন অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। ইহাতেই বোঝা যাইতেছে যে সে স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ ইচ্ছার সহিতই গিয়াছে। আপনি বৃথা কেন এত কাতর হইতেছেন, তাহাদের চিন্তা ছাড়িয়া দেন।

গোপাল একথা শুনিয়া কাণে হাত দিয়া বলিল "মহাশয়, এমন কথা বলিবেন না, স্থকুমারী গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র, আমি নির্ব্বোধ নরাধম, না বুঝিয়া তাহাকে পিশাচ যোগেন্দ্রের জালে ফেলিয়া দিয়াছি। ওরে যোগেন্দ্র বিশ্বাস! পিশাচ! রাক্ষস! তোর মাথায় বজ্রাঘাত হউক রে, সর্ব্বস্বান্ত হ রে, নির্ব্বংশ হ রে, ব্রাহ্মণের এমন সর্ব্বনাশ করিলি! আহা, স্থকুমারী, তোমার কোন দোষ নাই, তুমি সব বুঝিতে পারিয়াছিলে, সেই জন্য তোমার আসিতে এত অনিচ্ছা ছিল, আমি না বুঝিতে পারিয়াই এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছি, (ষ্টেশনমাষ্টারের প্রতি), বলুন মশায়, যদি কিছু উপায় থাকে।

ষ্টে.মা। উপায় আর ত কিছু দেখি না। আপনি গ্রামে ফিরিয়া যান, গ্রামস্থ সকল লোকের সহিত পরামর্শ করুন, এবং কোন সাকুব লোক লইয়া অনুসন্ধানে বাহির হন। আপনি যেরূপ লোক দেখিতেছি একলা, কিছুই করিতে পারিবেন না। যোগেন্দ্র বিশ্বাস ত আপনাদের গ্রামের লোক বলিতেছেন, তাহার বাড়ী ঘর স্ত্রী পরিবার আছে, যাইবে কোথায়, অনুসন্ধানে শীঘ্রই পাইবেন।

এই কথা শুনিতে শুনিতে গোপাল ষ্টেশনমাষ্টারের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া পাগলের ন্যায় তাকাইয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন গ্রামে যাইয়া কিরূপে মুখ দেখাইবেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

অগ্নিদাহ।

তৎপর দিন গোপালচন্দ্র, যদি কোন সংবাদ পাওয়া যায়, যদি কিছু উপায় হয় এইরূপ আশায় জংশন ষ্টেশনেই রহিলেন। কিন্তু কোন উপায়ই হইল না। ষ্টেশনের লোকগুলি তাঁহার স্নানাহার বিষয়ে বেশ যত্ন করিল, কিন্তু তাঁহার অসাক্ষাতে নানাবিধ সমালোচনা চলিতে লাগিল। কেহ গোপালকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "লোকটি অতি সরল, সংসারের ক্রূরতা কিছু বুঝে না, সেই জন্য এইরূপ প্রতারিত হইয়াছে"; কেহ বলিল, "লোকটা অতি নির্ব্বোধ, একটা নষ্টা দুষ্টা স্ত্রীলোক ছল করিয়া, উহাকে বেকুফ বানাইয়া পলাইয়াছে, আর ও কাঁদিয়া সারা হইতেছে;" কেহ বলিল "লোকটার একটু পাগলাটে ছিট আছে", কেহ বলিল "শুধু পাগল নয় ভায়া, ও রসের পাগল"। কেহ এ ভাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিল,"আর দূর! লোকটা স্ত্রীলোকটাকে ভগ্নী ভগ্নী করিয়া সারা হইতেছে আর তুমি কি অসম্ভব কথা বল।" প্রতিবাদের প্রতিবাদ হইল, "আরে ভায়া, তুমি ত দুনিয়ার সবই বুঝ, ঐ যে ভগ্নী ফগ্নী সম্পর্কের কথা, ও সব হজমি গুলি, আমি যা বলিতেছি তা যদি ঠিক না হয়, আমার নাম বদলাইয়া রাখিও, আসল কথা কি বলিব, দুটো পুরুষে যোগ করিয়া মেয়েমানুষটাকে বাহির করিয়া আনে, তাহার পর যেটা চালাক বেশী সেই তাকে সম্পূর্ণ হাত করিয়া ভাগিয়াছে, এ লোকটা কিছু আহম্মক কছমের, এখন ফাঁপরে পড়িয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে। অত হাউ হাউ করিয়া কান্না, একি বাবা মরমে টান না লাগিলে বাহির হয়? তোমরা যেই যাহা বল না, আমার ত এই ধ্রুব ধারণা।

কোন প্রকার স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ থাকিলেই, লোকের দূষিত কল্প-

নার কতই না স্ফূর্ত্তি হয়। আর রমণীগণ, তোমাদের কি দুর্ভাগ্য! স্বর্গের ন্যায় পবিত্র হইলেও গণ্ডির বাহির হইলেই তোমাদের কত না কলঙ্ক রটনা হয়!

গোপালের সাক্ষাতে পূর্ব্বোক্ত সমালোচনা সকল না হইলেও তিনি অনেকটা লোকের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সে জন্য অন্তরে অধিক তীব্র যাতনা বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি করিবেন। লোকের মুখে কে হাত দেয়। জংশনে এক দিন থাকিয়া তৎপরদিন তিনি হতাশ হৃদয়ে শূন্যমনে মেমারীতে ফিরিয়া আসিলেন। যে স্থানে শরৎ দাঁড়াইয়া গাড়ী দেখিয়াছিল, যে থামে সুকুমারী রন্ধন করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন, সেই সকল স্থান দেখিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। "হায় হায়, সে লক্ষ্মীপ্রতিমা সুকুমারীকে, সে সরল শিশু শরৎকে কোথায় ভাসাইয়া দিয়া আসিলাম" বলিয়া তিনি সেই দোকান ঘরে বসিয়া ব্যাকুল ভাবে কতকক্ষণ কাঁদিলেন। দোকানদার সকল কথা গোপালের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, এবং অবশেষে বলিল, "ঠাকুর তুমি আপনার গ্রামের লোক চিনিতে পারিলে না, আমরা তাহাকে চিনিয়া রাখিয়াছি। গোপালচন্দ্র ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুমি যোগেন্দ্র কোথায় যায় কি করে কিছু জান কি? দোকানদার উত্তর করিল, "না মশায়, তা আমি জানি না, তবে সে আর যাবে কোথায়—কিছু দিনের মধ্যে তাকে আপনার গ্রামেই পাইবেন, কিন্তু সে ফিরিলে আর কি হবে, স্ত্রীলোকটি, ব্রাহ্মণের ঘরের কন্যা, তাহার ত ইহকাল পরকাল সমস্ত নষ্ট হইল।"

গোপাল পুনরায় হস্ত দ্বারা মুখাবরণ করিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি শীঘ্র গ্রামে ফিরিতে পারিলেন না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, যোগেন্দ্রকে অভিসম্পাত করিতে করিতে, এ গ্রাম ও গ্রাম করিয়া দুই দিন ঘুরিলেন।

এদিকে সুকুমারীদের গ্রামে, যোগেন্দ্র হস্তছাড়া হইয়া পলাইয়াছে, বিশেষতঃ সুকুমারীকে লইয়া পলাইয়াছে, এই সংবাদে খোকাবাবু ক্রোধে লাল হইয়া উঠিলেন। খোকাবাবুর প্রতিহিংসানল যোগেন্দ্র ও সুকুমারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য অবিরাম ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। যোগেন্দ্র যে গোপাল ও সুকুমারীকে ভয় প্রদর্শন করিয়া স্থান পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছিল তাহার বাস্তবিকই কারণ ছিল। অপরিতৃপ্ত লালসা, অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসার সহিত মিলিয়া খোকাবাবুর হৃদয়ে এক ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার প্ররোচনায় খোকাবাবু উন্মাদগ্রস্তবৎ। সুকুমারী যখন সেই রাক্ষসীর করাল কবল হইতে মুক্ত হইলেন খোকাবাবুর পক্ষে ইহা একবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। যে যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক ইহা সংঘটিত হইল অবিলম্বে তাহার সর্ব্বনাশ করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তিনি স্বরক্ষিত দস্যুদলের সহিত মন্ত্রণায় নিযুক্ত হইলেন। মন্ত্রণা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল। যোগেন্দ্র ও সুকুমারী প্রভৃতির গ্রাম ত্যাগের তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে, যোগেন্দ্রের গৃহচূড় হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, গ্রামবাসীকে চমকিত করিয়া, গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইল, এবং লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া মুহূর্ত্ত কালের মধ্যেই যোগেন্দ্রের যথাসর্ব্বস্ব ভস্মসাৎ করিল। যে সঞ্চিত অর্থের গৌরবে স্ফীতবক্ষ হইয়া, যে জাল দলিল দস্তাবেজ রাশির বলে খোকাবাবুর সমস্ত বিষয় গ্রাস করিবার আশায় বিভোর হইয়া, যোগেন্দ্র আনন্দে কাল কাটাইত, সে সমস্তই আজ ভস্মীভূত হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন কোন প্রকারে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিল। প্রাণে রক্ষা পাইলে কিন্তু কি হইবে, পরদিন আর তাহাদের একটু মাথা রাখিবার স্থান রহিল না। গ্রামে জনরব উঠিল যে, যে যোগেন্দ্রের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দিবে খোকাবাবু তাহারও এইরূপ সর্ব্বনাশ করিবে। সুতরাং তাহাদিগকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইল। যোগেন্দ্রের মাতা ভিন্নগ্রামস্থ

আত্মীয়ের বাড়ী গমন করিল এবং তাহার পত্নী একটি লোক সঙ্গে পদব্রজে পিত্রালয়ে গমন করিল। হঠাৎ কি পরিবর্ত্তন! যে নায়েব-পত্নী সাটিন সাজে সজ্জিতা হইয়া স্বর্ণভূষণভূষিত করযুগল দ্বারা অর্দ্ধরুদ্ধ পাল্কীদ্বার শোভিত করতঃ আপনাকে ধন্য ভাবিতে ভাবিতে পিত্রালয়ে গমন করিত, যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাস দাসী পাইক পিয়াদা ছুটিয়া যাইত, আজ সে এক রাত্রির ঘটনায় সৌভাগ্যচ্যুত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পদব্রজে পিত্রালয়ে গমন করিতেছে!

কয়েক দিন পরে গোপাল প্রত্যাবর্ত্তন করিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, যোগেন্দ্রের ভিটায় কেবল ভস্মস্তূপ! সে বাড়ী নাই, সে ঘর নাই, সে নবনির্ম্মিত সাধের বৈঠকখানা নাই, কিছুই নাই, কেবল ভস্মস্তূপ! ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া অশ্রুবিগলিত নয়নে একবার দাঁড়াইলেন, তাঁহার বোধ হইল যেন দাবানলসদৃশ যে বিষম বহ্নিরাশি তাঁহার হৃদয় মধ্যে অহরহঃ হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহারই প্রকোপে, এ সমস্ত ভস্মীভূত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই সে অনল মন্দীভূত হইয়া আসিল। গোপাল কিছু শান্ত হইয়া, গগনমধ্য-শোভিত মাধ্যন্দিন কিরণমালীর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কর-যোড়ে, গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "দেব, তুমি আছ, তুমি সত্য, পাপের শাস্তি আছে।"

অতঃপর গোপাল শরৎ ও সুকুমারীর উদ্ধারের সৎপরামর্শ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যে বিনয়কুমারের কাছে লইয়া যাইবার ছলে সুকুমারীকে যোগেন্দ্র লইয়া গিয়াছে, কামিনীপুর গ্রামে তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বাস করেন, একথা গোপালের স্মরণ হইল। বিনয়কুমারের কাছে সুকুমারীকে লইয়া গিয়াছে কি না এ বিষয় শ্রীশচন্দ্রের দ্বারা বিশেষ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে, এবং শ্রীশচন্দ্র নিজে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক; এ বিষয়ে সদুপদেশ দিতে পারেন, এই ভাবিয়া গোপাল

তাঁহার নিকট গমন করিলেন। শ্রীশচন্দ্র সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতীব বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন এবং তৎপর বিনয়কুমারের নিকট একটি টেলিগ্রাম পাঠাইলেন।

পাঠকের স্মরণ হইবে রোটসগড়ের সেই শারদীয় জ্যোৎস্নাধৌত সৌধোপরি বিনয়কুমার এই টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্তচ্যুতি।

যোগেন্দ্রের গ্রামত্যাগে আর একটি হুলস্থূল ব্যাপার বাধিয়া গেল। গ্রামে একটি সুবর্ণবণিকের মেয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে জিনিষবন্দকী কায করিয়া হাতে বেশ দু পয়সা করিয়াছিল। গ্রামত্যাগের কয়েক দিন পূর্ব্বে যোগেন্দ্র তাহার নিকট একখানি অলঙ্কার বন্ধক দিয়া কিছু টাকা লয়। যোগেন্দ্রের বাক্‌চাতুরীতে ভুলিয়া স্ত্রীলোকটি অলঙ্কারের মূল্য অপেক্ষাও অধিক টাকা দিয়া ফেলিয়াছে। টাকা দিবার পর তাহার ইহা ঠিক হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে অলঙ্কারটি ফিরিয়া লইবার কথা থাকায় সে চুপ করিয়াছিল, কাহাকেও একথা বলে নাই। যোগেন্দ্রের পলায়নের কথা প্রচার হইলেই তাহার একবারে ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে, যোগেন্দ্র তাহাকে ঠকাইবার জন্যই অলঙ্কারটি বন্ধক দেয়। আর যাহার যত সর্ব্বনাশই হউক না, যোগেন্দ্র তাহার অপেক্ষা আর কাহারও অধিক সর্ব্বনাশ করে নাই, এই বিশ্বাসে সেই অলঙ্কার হস্তে করিয়া সে পাড়ায় পাড়ায় কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। অলঙ্কারটি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিল "ওমা একি! এ হার যোগেন্দ্র কি করিয়া পাইল, এ যে বিনোদিনীর হার দেখিতেছি।" একথা ক্রমে বিনোদিনীর মাতার কর্ণে উঠিল। বিনোদিনীর মা একবারে দশবাহু চণ্ডী হইয়া প্রথম চোটেই বিনোদিনীকে ফইজোত আরম্ভ করিল। বিনোদিনী আর কি বলিবে, বলিল যে, সে হার ঘরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল, কখন চুরী হইয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। বিনোদিনীর মাতা তখন সেই বেনের মেয়ের দ্বার চাপিয়া বসিয়া বলিল, "তোর এত বড়

বুকের পাটা, তুই চোরাই মাল ঘরে রাখিস্‌ ? আমার হার বাহির করিয়া দিবিত দে, না হলে আমি পুলিশ দেখাব, আইন আদালত করিব। তুমি কেমন বেনের মেয়ে তা দেখিব।” বেনের মেয়েও বড় সহজ পাত্র নহেন। সে চোরাই মালের কথা খণ্ডন করিয়া, বিনোদিনীর উপর অজস্র বাক্যবাণ—অসংখ্য টিট্‌কারী ঝাড়িতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল।

বিনোদিনীকে লক্ষ্য করিয়া চোকটেপাটিপি, মুচকি হাসি, গোপনে নিন্দাবাদ এ সকল করিতে আর গ্রামের কেহ বাকি রাখিল না। বিনোদিনীর মাও তাহাকে বাহিরে সম্পূর্ণ নিরপরাধী সাব্যস্ত করিলেও নির্জ্জনে গঞ্জনা দিতে বাকি রাখিল না। বিনোদিনীর মুখ দেখান ভার হইল। সমগ্র গ্রামটি তাহার পক্ষে যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইল, যেখানে যায় সেই খানেই বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টির অসহ্য তীব্র যাতনা। যাহা হউক, এ যাতনা, এ বাহিরের সন্তাপ, বিনোদিনী বোধ হয় সহ্য করিতে পারিত, যদি অন্তরের দাহ না থাকিত। কিন্তু তাহার হৃদয় মধ্যেও হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছিল। যে যোগেন্দ্রকে আপনার ভাবিয়া প্রাণ সঁপিয়াছিল, সে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শুধু কি তাই, সুকুমারীকে সঙ্গে লইয়া পলাইয়াছে। কি অসহ্য কষ্ট! আবার ইহার উপর ঘোরতর অবজ্ঞা। বিনোদিনী নিজের যথাসর্ব্বস্ব হার গাছটি প্রেমোচ্ছ্বলিত হৃদয়ে যোগেন্দ্রকে উপহার দিল, যোগেন্দ্র আর কিছু করুক না করুক, সেই হারটি তাহার প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ চিরকাল রাখিলেও বিনোদিনীর অনেক তৃপ্তি হইত। যোগেন্দ্র কি না সেই হার এত অল্প দিনের মধ্যে বিক্রয় করিয়াছে। যোগেন্দ্র কি তবে অতীব নির্ম্ম প্রতারক নহে ? এইরূপ চিন্তায় বিনোদিনীর হৃদয় খাক্‌ হইয়া যাইতেছে। তাহার জীবন দুর্ব্বিসহ ভার বোধ হইতেছে।

এইরূপ মানসিক অবস্থায় বিনোদিনী একদিন স্নান করিতে গিয়াছে।

আজ আর সে বহুজনাকীর্ণ সানবাঁধান দীঘিকা-ঘাটে যায় নাই; গ্রাম-প্রান্তস্থিত জঙ্গলাবৃত, জনশূন্য এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে গিয়াছে। স্নানের জন্য তৎপরতা নাই। পুষ্করিণীর কন্দরে, এক বৃক্ষান্তরালে বসিয়া বিনোদিনী ভাবিতেছে; আয়তনয়নদ্বয় নিশ্চল ও নিম্নদৃষ্টি; নীরবে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছে। এরূপ নির্জ্জন স্থানে আসিয়াও তাহার মনে কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি নাই। লোকের তীব্র তিরস্কারধ্বনি যেন এখানে আসিয়াও তাহার কর্ণকুহর পূর্ণ করিতেছে। আবালবৃদ্ধ সকলেই যেন বলিতেছে "বিনোদিনী, তোর জীবনে ধিক্! যে বিনোদিনীর কলঙ্কের কথা কিছুই জানে না, বিনোদিনীর কল্পনায় সেও যেন ভাবিতেছে "বিনোদিনী তোর জীবনে ধিক্।" সরল শিশুরাও যেন ভাবিতেছে "বিনোদিনীর জীবনে ধিক্।" পুষ্করিণীতীরস্থ বৃক্ষসকল ও তদ্‌শাখাস্থ বিহঙ্গমগণ যেন সকলেই সমস্বরে বলিতেছে "বিনোদিনী, তোর জীবনে ধিক্। বিনোদিনীর অন্তর হইতে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে "বাস্তবিকই আমার জীবনে ধিক্, আমি এমন হতভাগিনী, প্রেমের জন্য কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইলাম, তাহাতে এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে প্রতারিত, আমার জীবনে শত ধিক্! এ জীবন আজ এই পুষ্করিণী-সলিলে বিসর্জ্জন দিব।"

হায়, বিনোদিনী, যে অগ্নিতে তুমি আজ পুড়িতেছ, একদিন প্রলোভনের মোহে পতিত হইয়া স্পর্দ্ধার সহিত ইহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলে।

এইরূপ অবস্থায় বিনোদিনী বসিয়া আছে, এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া সেই পুষ্করিণীর ঘাটে নামিল। স্ত্রীলোকটির বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দেহটি হৃষ্টপুষ্ট, মুখখানি সরস ও প্রসন্ন, গলায় এক ছড়া সোণার দানা, হাতে সোণার অনন্ত ও বালা, পরণে একখানি পাতালা লাল পেড়ে শাড়ি। সে ঘাটে নামিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া বস্ত্র ধৌত করিতে লাগিল এবং দুই একবার প্রসন্নভাবে

অনন্তবালাশোভিত বাহুদ্বয়ের বস্ত্রধাবন কালীন আন্দোলন দর্শন করিল। বিনোদিনীকে সে এ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে নাই। নির্জ্জনতাভিলাষিণী বিনোদিনীর হৃদয়জ্বালা তাহার আগমন মাত্রেই বাড়িয়া গেল এবং সে ইচ্ছা করিতে লাগিল যেন তাহাকে না দেখিয়াই এ স্ত্রীলোকটি চলিয়া যায়। তাহা কিন্তু হইল না। ঘাট হইতে উঠিবার সময় বিনোদিনী তাহার নজরে পড়িল। তীব্র লজ্জাবেশে বিনোদিনীর সর্ব্বাঙ্গ যেন একবার স্পন্দিত হইয়া সঙ্কুচিত হইল, অশ্রুপ্রবাহ শুষ্ক হইল এবং বিনোদিনী অধিকতর অধোবদন হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি বিনোদিনীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ও মা! তুমি এখানে এমন ক'রে বসে! কেন গা, এত কিসের জন্য, কি হয়েচে যে তোমার এত দুঃখ? যাও ঘরে যাও, বেলা ঘুরে পড়েচে।

বিনোদিনী মাথা উঠাইতে পারিল না। স্ত্রীলোকটি আবার বলিল "আহা, দিদি এখনও ছেলে মানুষ কি না, তাই লোকের কথায় অত দুঃখ করিতেছ লোকের ত স্বভাব জাননা,; এই যে অমুক গিন্নি তোমার কথা লয়ে ঘরে ঘরে দলনা করে বেড়াচ্চে, ওঁর মেয়ের গুণের কথা ত জাননা। এই কথা বলিতে বলিতে স্ত্রীলোকটি বিনোদিনীর নিকট হইয়া বসিল, স্বর মৃদু করিল। এবং বহুবিধ মুখভঙ্গির সহিত গ্রামের অনেক স্ত্রীলোকেরই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অশ্রুতপূর্ব্ব কুৎসা কহিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বলিল, "জানিলে দিদি, লোকেরা যদি আপনার গায়ে হাত দিয়া কথা বলে, তা হলে ভাবনা কি, নিজের দোষ কেউ দেখিতে পায় না, আমাকেও দিদি, দাগা দিতে লোকে কসুর করে নাই, আমারও চক্ষে এক দিন এমনি ক'রে জল ফেলাইয়াছে। (অঞ্চল দ্বারা কিয়ৎক্ষণ নীরবে মুখাবরণের পর) যা হউক, গতর বজায় ছিল, হাতে দুপয়সা করিতে পারিয়াছি, এখন কত লোকে খোসামদ করিতেছে। তাই বলি দিদি অত দুঃখ কিসের, কেঁদে কেটে আপনার দেহটা মাটি করে আর

কি হবে। সংসারে জান, যদি গতর বজায় থাকে ও হাতে দুপয়সা হয়, তবে সব সুখ। এখন ঘরে যাও দিদি।

এই সকল কথায় বিনোদিনীর চিত্ত অনেক স্থির হইল, বিষাদ কালিমা যেন তাহার মুখ হইতে একটু অপসৃত হইল। এখন মুখ তুলিয়া সে স্ত্রী-লোকটির দিকে তাকাইল। পতনশীল হৃদয়ে যে মধ্যে মধ্যে আত্মগ্লানি ও লোকলজ্জাভয়ের উদ্রেক হইতে থাকে, অপরের দোষ দর্শনে ও শ্রবণে তাহার তীব্রতা অনেক কমিয়া যায়। সত্য হউক, মিথ্যা হউক এই রমণীর মুখে গ্রামস্থ অনেক স্ত্রীলোকেরই কুৎসা শুনিয়া বিনোদিনীর তীব্র আত্মগ্লানি ও লোকলজ্জাজনিত যন্ত্রণা অনেক হ্রাস হইয়া গেল। আর হার বন্ধক দেওয়া ঘটনাটি প্রকাশ হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বিনোদিনী কাহারও মুখে একটীও সহানুভূতির কথা শ্রবণ করে নাই। এই রমণী একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া একবারে বিনোদিনীর চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলিল। বিনোদিনী তাহাকে পরম আত্মীয় ভাবিল। বিশেষতঃ বিনোদিনী যে ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময় ভাবিতেছিল, এই রমণীর কথায় ও দৃষ্টান্তে যেন সেই অন্ধকারের মধ্যে একটু আলোকদীপ্তি দেখিতে পাইল। সুতরাং বিনোদিনী কিয়ৎপরিমাণে আত্মসংযম করিয়া সেই রমণীর মুখের দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিল। রমণী পুনরায় বলিল "দিদি কেন দুঃখ করিতেছ ঘরে যাও।" বিনোদিনী বলিল, "ঘর কি আমার আছে দিদি যে যাব, যে ঘর আছে সেখানে আমি আর যাইতে পারিব না, আমার পক্ষে সে অগ্নিকুণ্ড; বরং পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিব, তবু আর সেখানে যাইতে পারিব না, আর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।" স্ত্রীলোকটী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "তা হবে বৈকি, এমনি দুঃখই মনে হয় বটে, তা দিদি এক কাজ করিবে, আমার সঙ্গে যাবে? আমি কলিকাতায় যে বাড়ীতে কাজ করি, সে বাড়ীর বাবু, গিন্নি ও সকলেই বড় ভাল লোক; আর তারা রান্নাবান্নার কাজের জন্য একটী

মেয়েমানুষ খুঁজিতেছে। তোমাদেরই তারা স্বজাত। তোমাকে তারা বত্তে যাবে। আর স্বজাতের কথাই বা বলিবে কেন, বল্‌বে যে তুমি কুলীন বামুনের মেয়ে। তোমার রূপ দেখ্‌লে, শ্রী দেখ্‌লে, কে আর সে কথায় অবিশ্বাস করিবে। কলিকাতায় দিদি কি আর জাত আছে, কত চাষা ভুষার মেয়েও, এমন কি মুচি মুদ্দোফরসের মেয়েও বামুনের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়া পার হইয়া যাইতেছে। তুমি বামুনের মেয়ে বলে পরিচয় দিলে কত বাড়ীতে তোমার কাজ যুটিবে, কত লোকে সাধাসাধি করিবে।”

বিনোদিনীর মনে ইতিপূর্ব্বেই যে আশা অস্ফুট ভাবে জাগিয়াছিল, এখন তাহা স্ফুটতর হইয়া এই রমণীর মুখ হইতে প্রকাশ পাইল। বিনোদিনীর মন স্থির করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সে একেবারে বলিয়া ফেলিল, “কুসুম দিদি, আমি তোমার সঙ্গে যাব, নিশ্চয়ই যাব, তুমি কবে যাবে বল?”

রমণী। তুমি যদি যাও আমি কালই যাইতে পারি।

বিনো। আমি কালই যাব, আজ তোমার ঘরে গিয়া থাকিব।

রমণী। না, তা হলে গোলমাল হবে, হয়ত যাওয়া হবে না। ভোর ভোর তুমি ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার ঘরে আসিও।

এই পরামর্শই ঠিক রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রচার হইল বিনোদিনীকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। অনেকে ভাবিল বিনোদিনী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে; কেহ কেহ বলিল যে, বিনোদিনীকে বনপুকুরে স্নান করিতে যাইতে দেখিয়াছে কিন্তু আর ফিরিতে দেখে নাই; কেহ বা বলিল যে, সে বনপুকুরের জলে একটা শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া যায় কিন্তু কিছু দেখিতে পায় না, কেবল বড় মাছ নড়িলে যেমন জল নড়ে, সেইরূপ জল নড়িতে দেখিয়াছে। সেই পুষ্করিণীতে একবার জাল

নামাইয়া দেখা হইল। ক্রমে প্রকাশ পাইল যে, বিনোদিনী গ্রামের কুসুম গোয়ালিনীর সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে।

যে প্রস্ফুটিত পদ্ম সরসীবক্ষে ভাসমান থাকিয়া এত দিন শোভা সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতেছিল, পামর যোগেন্দ্র-কীট কর্ত্তৃক দষ্ট হওয়ায় তাহা সমাজবৃন্ত হইতে চ্যুত হইয়া পঙ্কে নিমগ্ন হইল! আর কি তাহা কখন পুনরায় দেখা দিবে? যদি দেয়, তবে সে গলিত, পঙ্কিল, দুর্গন্ধময় অবস্থায়।

গ্রামে দিন কয়েক খুব আন্দোলন চলিল। ক্রমে সকলে আপন আপন কাজে মন দিল। প্রায় দুই তিন মাস পরে বিনোদিনীর মাতার নামে একখানি রেজেষ্টারী করা চিঠি আসিল, তাহার মধ্যে একখানি ১০ টাকার নোট বিনোদিনী পাঠাইয়াছে। বিনোদিনীর মায়ের অতি কষ্টে দিনপাত হইতেছিল, অতএব টাকা কয়েকটি পাইয়া বৃদ্ধা বড় খুসী হইল; কলিকাতায় এক বড় লোকের বাড়ী বিনোদিনীর কাজ হইয়াছে, বেশ আরাম ও ইজ্জতের সহিত আছে, বিনোদিনীর মাতা গ্রামের সকলের কাছে এইরূপ বলিতে লাগিল। কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শঠতার চূড়ান্ত।

নওয়াদা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে একটি পার্ব্বতীয় পথে কিছু দূর অগ্রসর হইলে এক পর্ব্বতমালাবেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে উপনীত হওয়া যায়। প্রান্তরের এক প্রান্তে, পর্ব্বতের পাদতলে, পাহাড়ী জাতীয়দিগের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার অনতিদূরে, অথচ গ্রাম হইতে বিভিন্ন, কয়েকখানি গৃহ আছে। এ গৃহগুলি প্রশস্ত, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; এবং দেখিলেই বোধ হয় সেগুলি পাহাড়ীগণের অধ্যুষিত নহে। প্রান্তরের মধ্য দিয়া এক প্রবল কল্লোলিনী ক্ষুদ্র তটিনী প্রবাহিতা। তাহার এক তীরে, কিছু দূরে, কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ। বৃক্ষতলস্থ স্থানটি সুপরিচ্ছন্ন; কোথাও কোথাও দুই একখানি উচ্চ, স্বভাবনির্ম্মিত আসনের ন্যায় মসৃণ শিলাখণ্ড। দুই একখানি তৃণাচ্ছাদিত সামান্য গৃহও এখানে আছে। এই স্থানে পাহাড়ীদিগের সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট হয়।

শরৎকাল; আকাশ প্রায় মেঘভারনির্ম্মুক্ত। উন্নত গিরিশৃঙ্গরূপ ধরিত্রীবক্ষ আর নিবিড় কুয়াসাবৃত নহে। এখন তাহার পূর্ণ যৌবনের সরস শ্যামল লাবণ্য প্রদীপ্ত প্রাতঃসূর্য্যের সুবর্ণকিরণজালে প্রভাসিত হইয়া আনন্দে তরঙ্গায়িত হইতেছে। পর্ব্বতগাত্রবাহিনী সলিলধারা সকল রবিকিরণচ্ছুরিত হইয়া শ্যামাঙ্গলম্বিত সুবর্ণহারের ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রান্তরস্থা তটিনী স্বল্পতোয়া হওয়ায় স্থানে স্থানে শৈবালমণ্ডিত শিলাখণ্ড সকল মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ইহার বিপুল কল্লোলরাশি আরও বিপুলতর হইয়াছে।

এই গিরিমালাবেষ্টিত প্রান্তরটি এক অপূর্ব্ব শোভার, অনন্ত সৌন্দর্য্যের, অপার শান্তির, চিরন্তন পবিত্রতার নিকেতন স্বরূপ বোধ হয়। কিন্তু এ শোভা সৌন্দর্য্য বোঝে কে? ঐ ত অজ্ঞ অসভ্য সাঁওতাল, এ সৌন্দর্য্যের দিকে একবার মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে মৃত্তিকা খনন করিতেছে। এ শান্তি, এ পবিত্রতার মর্য্যাদাই বা কয় জন করে? কোন ধ্যানপরায়ণ সাধু-নির্ম্মিত এক মন্দির পর্ব্বতশিরে শোভা পাইতেছে বটে, কিন্তু আবার এই স্থানেই আমরা কত অশান্তি, অপবিত্রতা ও অত্যাচারের আগার দেখিতে পাইব।

পাঠক, যোগেন্দ্র ও সুকুমারীর তত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। দেখুন, তটিনীতীরস্থ যে হাটতলার বর্ণনা করিয়াছি সেই দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন বৃক্ষতলে এক শিলাখণ্ডে একটি লোক উপবিষ্ট রহিয়াছে। এই না যোগেন্দ্র? যোগেন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে কি চিন্তা করিতেছে। তাহার মুখভাব দেখিলেই বোধ হয় কি যেন মৎলব আঁটিতেছে। কিসের মৎলব? অবশ্য সুকুমারীর সর্ব্বনাশ সাধনের। যোগেন্দ্র কি সুকুমারীর প্রেমে বা রূপে মুগ্ধ? প্রেম যোগেন্দ্র সদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে থাকিতে পারে না। রূপের মোহ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা এক দিনের সম্মার্জ্জনীর আঘাতে দূরীভূত হইয়াছে। ভীরু যোগেন্দ্র সুকুমারীকে উপভোগ করিবার আশা আর মনে আনিতেই পারে না। সে ভাব মনে হইলেই তাহার বুক গুড়গুড় করিয়া উঠে; সুকুমারীর সিংহিনীমূর্ত্তি স্মরণ হয়। সুতরাং সে আশা একবারেই ত্যাগ করিয়াছে। তবে সুকুমারীর সর্ব্বনাশ সাধিতে যোগেন্দ্র এত ব্যস্ত কেন? শুদ্ধ কি নিজের অপমানের প্রতিশোধের জন্য? প্রতিহিংসাই মূল বটে, কিন্তু কেবল এই একমাত্র প্রবৃত্তির উত্তেজনায় এতদূর উদ্যম যোগাইত না। যোগেন্দ্র স্বভাবতঃ অতি ক্রূরচক্রী। কবি কাব্য সৃজনে, চিত্রকর চিত্রাঙ্কনে যেরূপ আনন্দ পায়, যোগেন্দ্রের

ন্যায় খলপ্রকৃতির লোক সেইরূপ পরের অনিষ্ট সাধন জন্য নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবনে আনন্দিত হইয়া থাকে। এইরূপ কৌশল আবিষ্কার ইহাদের একটি শিল্প বিদ্যা স্বরূপ।

এই শিল্পে নৈপুণ্য ও বিচিত্রতা দেখাইবার আগ্রহে ইহারা অনেক সময়ে ভবিষ্যতের হিতাহিত ভুলিয়া যায়। সেই জন্যই বড় বড় চতুর-চূড়ামণিও অনেক সময়ে আপনারই চাতুরীর জালে জড়িত হইয়া সাধা-রণের নিকট অতি নির্ব্বোধ স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। এবং সেই জন্যই এইরূপ কত চতুর ও ক্রূর প্রকৃতির লোক গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় আপনাদের স্বভাবসুলভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যোগেন্দ্রের প্রতি-হিংসানল এইরূপ স্বভাবপ্ররোচনায় উদ্দীপিত হইয়াছে। তাহার উপর অর্থলালসা রূপ প্রবল সমীরণ যোগ দিয়াছে। সুতরাং যোগেন্দ্র সর্ব্বান্তঃকরণে সুকুমারীর সর্ব্বনাশচিন্তায় নিযুক্ত।

সুকুমারী কোথায়? ঐ দেখুন, তটিনীতীর উজ্জ্বল করিয়া, স্নাতা সিক্তবাসা আলুলায়িতকেশা সুকুমারী আকটিদেশগভীর সলিলে পূর্ব্বাস্যা হইয়া দণ্ডায়মানা; তাঁহার করদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ ও হৃদিসংন্যস্ত; নয়ন নিমীলিত; গণ্ডদ্বয় বিশুষ্ক, পাণ্ডুবর্ণ ও উত্তপ্তনয়নাসারপ্লাবিত। তিনি অনন্যমনে প্রাণের বেদনা প্রাণপুরুষকে জানাইতেছেন। বাহ্য-প্রকৃতি সম্পূর্ণ উদাসীন। পাষাণদুহিতা তটিনী কল্লোলময় অট্টহাস্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে করিতে আপনার আনন্দে আপনি মাতিয়া ছুটিয়াছে। শারদীয় সমীরণ ও দুরন্ত বালকের ন্যায় কাশপুষ্প উড়াইয়া চারিদিকে আপন মনে ছুটাছুটী করিতেছে। পাহাড়ী রমণীগণ, কেহ জঙ্গলসংগৃহীত ইন্ধনমস্তকে, কেহ বা মহিষদুগ্ধভাণ্ড হস্তে পাষাণবৎ দণ্ডায়মান হইয়া সুকুমারীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। কেহই কিন্তু সুকু-মারীর হৃদয়ের আভাস পাইতেছে না। জড় বাহ্যপ্রকৃতি না পারিলেও, হে অন্তর্যামিন্ আত্মন্! তুমি কি আজ সুকুমারীর হৃদয়-বেদনা জানি-

তেছ না? তোমার এক বিন্দু আশীর্ব্বাদকণা কি সুকুমারীর শিরে পতিত হইয়া, সিক্ত কেশরাশিনিঃস্যন্দিত গণ্ডবাহি বারিবিন্দুর ন্যায় তাঁহার উত্তপ্ত নয়নাসার শীতল করিবে না?

সুকুমারী একবার বিশ্বচক্ষু সূর্য্যদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রণামার্থ মস্তক ধীরে অবনত করিলেন এবং তৎপরে ক্ষুদ্র এক কলস জল লইয়া পূর্ব্ববর্ণিত তটিনীতীরাদূরবর্ত্তী এক কুটীরে প্রবেশ করিলেন। যোগেন্দ্র *যেখানে বসিয়াছিল সেই স্থান হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়া গাত্রোত্থান করিল* এবং যে কুটীরে সুকুমারী প্রবেশ করিয়াছিলেন তথায় গমন করিল। সুকুমারী কুটীরে যাইয়া ভ্রাতা শরচ্চন্দ্রকে কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় দিয়া যোগেন্দ্রেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এমন সময়ে যোগেন্দ্র কুটীরে উপস্থিত হইল। সুকুমারী ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিগো, গোপাল দাদা কেমন আছেন, এখানে তিনি কবে আসিবেন?" যোগেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিম্নদৃষ্টি হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সুকুমারী অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় বলিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে কেন গো, শীঘ্র বল না, কি হয়েছে, গোপাল দাদা কেমন আছেন? তিনি যদি না আসিতে পারেন, তবে আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া চল।"

যোগেন্দ্র উত্তর করিল, "তাহাকে আনিব কি তাহার ব্যারাম কঠিন, আর অন্য ব্যারাম নয়, ওলাউঠা, তাহাকে গাড়ীতে ত আনিতে হবে না।" সুকুমারী এই কথা শ্রবণ মাত্র ভয়চকিত হইয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; তৎপরে দৃঢ়স্বরে বলিল, "তবে আমাকে এইক্ষণেই তাঁহার নিকট লইয়া চল।" যোগেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল, "তুমি সেখানে কোথায় যাইবে, তাহাকে আসনসোলের হাঁসপাতালে রাখা হইয়াছে, সেখানে কত লোক জন, সাহেব সুবো যাইতেছে, আসিতেছে, সেখানে কি স্ত্রীলোক থাকিতে পারে?"

সু। কি বল গো তুমি, গোপাল দাদা আমার প্রাণে মারা যাইতেছে আর আমি এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব? সেখানে যত লোকই থাক্ আমি আজ যাবৎ যাব। তুমি যদি আমাকে না লইয়া যাও আমি নিজেই সেখানে যাব, যদি না পারি তবে আত্মঘাতী হব। এরূপ পাষাণী হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সেও অনেক ভাল।

যোগেন্দ্র বলিল, "দেখ তুমি যদি নিতান্ত জেদ্ কর, ত অগত্যা সেখানে তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু একটী কথা বলি, তোমাদিগকে আমি বিনয়কুমার বাবুর নিকট পঁহুছিয়া দিব বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। তিনি বাড়ীতে নাই, কলিকাতা গিয়াছেন। তিনি আসিলে তাঁহার নিকট তোমাদিগকে পঁহুছাইয়া দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। তাহার পর তিনি যা বলেন সেইরূপ কার্য্য করি। আমি গোপালকেও কাল যখন দেখিতে গিয়াছিলাম তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব কি না। তাহারও মত যে তোমাকে সেখানে না লইয়া যাওয়া হয়। গোপাল আমাকে বলিল যে, তোমাকে বিনয়কুমার বাবুর বাড়ীতে রাখিয়া দেওয়া হয়, সে আরাম হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

সু। বিনয়কুমার বাবুর বাড়ী কোন্ খানে?

যো। ঐ যে পাহাড়ের নিকট একটী কোটাবাড়ী দেখিতেছ ঐটী বিনয়বাবুদের এখানকার বাসাবাড়ী।

কলিকাতার শ্যামলাল চৌধুরী নামক কোন ধনী ব্যক্তির এই স্থানে একটী বাড়ী আছে, যোগেন্দ্র সেইটীকে বিনয়কুমারদের বাড়ী বলিয়া দেখাইয়া দিল। সুকুমারী বলিল "তবে আমাকে একবার বিনয় বাবুদের বাড়ীতে লইয়া চল, আমি সুপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব।"

যো। বিনয় বাবুদের বাড়ীতে লইয়া যাইব কি সেখানে আজ কাল তাঁহারা নিজে কিংবা তাঁহাদের কোন মেয়ে ছেলে কেহই নাই।

বিনয় বাবুর ভ্রাতার পীড়ার জন্য তাহারা সকলে কলিকাতা গিয়াছে, কেবল তাহাদের চাকর বাকর বাড়ীতে আছে। তা না হলে ত আমি তোমাকে সেইখানেই রাখিতাম।

সু। যাক্ তবে সে কথা; এখন আমাকে গোপাল দাদার নিকট যত শীঘ্র পার লইয়া চল। এক দণ্ড বিলম্ব আর আমার সহ্য হইতেছে না।

যোগেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিল "আচ্ছা তবে দেখি, আজ বিকালের গাড়ীতে তোমাকে আসনসোলে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব।" এই কথা বলিয়া যোগেন্দ্র বাহির হইয়া গেল। সুকুমারী আরক্তিম বদনে, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, দন্তদ্বারা অধর পেষণ করিতে করিতে নীরবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া স্বগত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "কি, যোগেন্দ্র আমাকে গোপাল দাদার কাছে লইয়া যাইবে না? সেই জন্যই বুঝি গোপাল দাদা যখন অসুস্থ হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া যায় তখন আমাকে কোন সংবাদ দেয় নাই। আচ্ছা, পামর কেমন তুমি আমাকে রাখিতে পার, আমি তাই দেখিব, আজ আমি গোপাল দাদার নিকট যাইবই যাইব।" সুকুমারীর মনে এইরূপ চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত, এমন সময়ে যোগেন্দ্র পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল। সুকুমারী সুপ্তোত্থিতা সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ যোগেন্দ্র, তোমার ভাব ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে আমাকে গোপাল দাদার নিকট লইয়া যাইতে তোমার ইচ্ছা নাই। সেই জন্যই গোপাল দাদা কখন পীড়িত হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া যায় তাহার কোন সংবাদ আমাকে দাও নাই। আমি তোর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু পামর! মনে রাখিস্, তোর কোন দুরভিসন্ধিই সিদ্ধ হইবে না। এখন ভাল চাস্ ত আমাকে গোপাল দাদার নিকট শীঘ্র লইয়া চল্।"

যোগেন্দ্র কম্পিত কলেবরে জীব কাটিয়া, কর্ণে হাত দিয়া উত্তর

করিল "ছি! ছি! এমন কথা বলিবেন না, আপনি ব্রাহ্মণের কন্যা, আপনার পায়ে হাত দিয়া শপথ করিতে পারি আমার মনে কোন প্রকার কু অভিসন্ধি নাই। আপনি কেন এমন কথা বলিতেছেন? আমি আজই আপনাকে আসনসোলে লইয়া যাইব। গোপাল স্বয়ং নিষেধ করিয়াছিল সেই জন্যই আমি কিছু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আর গোপাল যখন গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়াছিল আমি কি তা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা হইলে আর এত গোলমাল হইত? আমি ত গোপালদের গাড়ীতে থাকি নাই, তোমাদের গাড়ীর নিকটে ছিলাম। আসনসোলে গোপাল নামিয়া যায়, আমি তাহার দুই তিন ষ্টেসন পরে গোপালের সংবাদ লইতে যাইয়া, যে গাড়ীতে গোপাল ছিল সেই গাড়ীর একটী লোকের নিকট শুনিলাম যে গোপাল পেটের পীড়ায় কাতর হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া যায়। তখন আর উপায় কি? তোমাকে তখন এ কথা বলিয়াই বা লাভ কি? নওয়াদা ষ্টেশনে নামিয়াই আমি তোমাকে একথা বলিলাম এবং আসনসোলে তারে সংবাদ পাঠাইলাম। তাহার পর দুই দিন গোপালকে দেখিয়া আসিলাম। ইহাতে আমার কি দোষ আছে বলুন। আপনি গোপালের কাছে যাইতে জেদ করেন, চলুন আজই লইয়া যাই আমার কোন আপত্তি নাই। সন্ধ্যার সময় গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতে লইয়া যাইব, সন্ধ্যার আগে ত আর গাড়ী নাই।"

এই কথা বলিয়া যোগেন্দ্র পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল। সুকুমারী একটু স্থিরচিত্ত হইয়া সামান্য মত কিছু আহার্য্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভাইটিকে খাওয়াইলেন। যোগেন্দ্রের বর্ণিত বৃত্তান্ত সুকুমারী সমস্তই এক প্রকার বিশ্বাস করিলেন। কেনই বা না করিবেন?

আহারাদি করিয়া সুকুমারী সেই নির্জ্জন কুটীরে ভাইটিকে নিকটে লইয়া বসিয়া আছেন, ভাবিতেছেন, রোদন করিতেছেন, অদৃষ্টের নিন্দা-

বাদ করিতেছেন, এক একবার ভাইটিকে চিন্তিত দেখিয়া আবার তাহাকে সাহস দিতেছেন, এবং ব্যাকুলহৃদয়ে সন্ধ্যার গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতে-ছেন, এমন সময়ে তিনটি স্ত্রীলোক সেই কুটীরাঙ্গনে প্রবেশ করিল। একটি গৌরবর্ণা পরিষ্কৃতপরিচ্ছদা, মধ্যবয়স্কা বাঙ্গালিনী, অপর দুইটি যুবতী, পাহাড়ী জাতীয়া। প্রথমোক্তা ইতিপূর্ব্বেই তত্রস্থ কোন কর্ম্ম-চারীর পত্নী বলিয়া সুকুমারীর নিকট পরিচিতা। স্ত্রীলোকটির ভাবভঙ্গীতে কথায় বার্ত্তায়, কিন্তু কুলবধূ বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক এই স্ত্রীলোকটিই এ কয় দিন সুকুমারীর তত্ত্বাবধারণ করিতেছে। স্ত্রীলোকটি আসিয়া অনেক কথা কেলিল। সুকুমারী একবার অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেঁ গা, এ মেয়ে দুটি কে ?"

স্ত্রী। ওরা সাঁওতালদের মেয়ে, কলিকাতা অঞ্চলে কায করিতে যাবে।

সু। হেঁ লা, তোদের বিয়ে হয় নাই ? মা বাপ আছে ?

সাঁওতাল রমণীদ্বয়। মোদের সাদি বিয়ে হয়েছে, মা বাপ ভাই সব আছে।

সু। তারা কে সঙ্গে যাবে ?

সাঁওতাল রমণীদ্বয়। না তারা কেন যাবে ? মোরা হাটে এসে-ছিলাম সেখান হতে মোদিকে এনেচে। মোদের মুলুকে বড় দুঃখ। কলকাতায় বড় সুখ, বহুত কাম মিলে।

সু। আ মরণ তোদের সুখের কপাল, মা বাপ, সোয়ামী ছেড়ে কোথা যাবি মরতে।

এই সময় সুকুমারী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন ; নিজের আশ্রয় ছাড়িয়া আসিলে স্ত্রীলোককে যে কত বিপদে পড়িতে হয়, নিজের জীবনে তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে করিতে সেই সাঁওতাল যুবতী-দ্বয়ের প্রতি একবার সহানুভূতির চক্ষে তাকাইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলিলেন। অপরা স্ত্রীলোকটি এই সময়ে বলিল, "ঠাকরুণ, তুমি ত জান না এ দেশে ওদের কত দুঃখ, দু বেলা খেতে পায় না, পর্‌তে কাপড় পায় না, কোন সুখ নাই। আর কলকাতার অঞ্চলে গেলে কত কায পাবে, রোজকার করবে, ভাল খাবে, পর্‌বে, হাতে দুপয়সা কর্‌বে, সুখে থাক্‌বে। আর ওরা ছোট জাত, ওদের মা বাপ সোয়ামীর সঙ্গে ভারি ত সম্পর্ক, কতলোকে সেখানে যেয়ে আবার পছন্দ মত বিয়ে থা ক'রে, সুখে ঘরকন্না করে। আমাদের বাবু এই কাযই করে কি না, এদেশে যাদের বড় দুঃখ দেখে, তা দিকে কলকাতার অঞ্চলে পাঠাইয়া দেয়। অনেক সময়ে কত কাপড় চোপড় পয়সা কড়িও দিয়া থাকে। তিনি বড় ভাল লোক গো, কত লোকের উপকার করেচে। এই ঠাকরুণ, তোমাদের কষ্টের অবস্থা হয়েচে, তিনি শুনে কত দুঃখ কল্লেন, আর বল্লেন যে যদি তোমরা তাঁর কথামত কায কর, তা হলে তিনি তোমাদের অনেক উপকার করিতে পারেন। অনেক সাহেবের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে, বলিয়া কহিয়া তোমার এই ভাইটিকে একটু লেখা পড়া শিখাইয়া কোন কায কর্ম্ম করিয়া দিতে পারেন। তা কিছুদিনের মধ্যেই ভাইটির ১০৲ ১৫৲ টাকা মাহিনার চাকরী নিশ্চয় যুটিয়া যাইবে। আর তুমিও ভাইটিকে লইয়া সুখী হইবে। তোমাদের ত আর দেশে কেহ নেই গো, যেখানে সুখে থাক্‌বে সেই তোমাদের ঘর। দেখ, যদি মত হয়, ত আমি দুই এক দিনের মধ্যেই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিই।"

স্ত্রীলোকটির এই কথাগুলি সুকুমারী অন্যমনস্কভাবে শুনিতেছিলেন, সকল কথা তাঁহার কাণে যায় নাই। তাঁহার হৃদয় বিষাদে, গোপালের জন্য চিন্তায় পূর্ণ; নিজের সুখের উপায় চিন্তা এখন একবারেই তাঁহার মনে স্থান পায় না। অতএব এ সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহাদের সম্ভবতা অসম্ভবতা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না। যত বেলাবসান হইতেছিল ততই তিনি উৎকণ্ঠিত হইতেছিলেন; ভাবিতে-

ছিলেন যোগেন্দ্র বুঝি আর না আসে, বুঝি তাঁহার গোপালকে দেখিতে যাওয়া হয় না।

এদিকে যোগেন্দ্র সুকুমারীর নিকট হইতে উঠিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত শ্যাম-লাল চৌধুরীর বাড়ীতে গমন করিল। এই বাড়ীর অধিবাসী কয়েকটি বলিষ্ঠকায় পিয়াদা এবং দুইজন ভদ্রবেশধারী লোক। যোগেন্দ্র শেষোক্ত দুইটি লোকের সহিত কিয়ৎক্ষণ পরামর্শ করিল। একজন যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা তুমি মেয়ে মানুষটাকে শেষ কি কথা বলেছ বল দেখি?" যোগেন্দ্র উত্তর করিল "আমি বলেচি যে গোপালের ওলাউঠা হইয়া মরমর হইয়াছে, বাঁচিবার কোন আশাই নাই, তবে নিতান্ত দেখা করিতে ইচ্ছা কর ত সন্ধ্যার গাড়ীতে তোমাকে আসনসোলে লইয়া যাইব।"

"বেশ কথা বলেচ, এখন একটা কাণে কাণে কথা বলি শুন দেখি" এই বলিয়া সেই লোকটি যোগেন্দ্রের গলা ধরিয়া চুপু চুপু কি বলাবলি করিল। শেষ যোগেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "ঠিক পরামর্শ, আমিও এইরূপই আঁচিয়াছিলাম, এখন বিকালের গাড়ীতে তুমি দুইজন পেয়াদা লইয়া আসনসোল রওনা হইয়া যাও, তাহলে দুই ঘণ্টা আমাদের আগে পঁহুছিবে। সেই সময়ের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিবে।"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর যোগেন্দ্র সুকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিল। সুকুমারী তখন সেই স্ত্রীলোকের কথা শুনিতে শুনিতে উৎ-কণ্ঠিত হইয়া যোগেন্দ্রর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যোগেন্দ্র আসিয়াই সুকুমারীকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল। যোগেন্দ্র একটী গরুর গাড়ী পর্য্যন্ত আনিয়াছিল। সুকুমারী তৎপর প্রস্তুত হইয়া ভ্রাতা সহ গোযানে উঠিলেন এবং ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে নওয়াদাষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিলেন।

অনেক রাত্রিতে গাড়ী আসনসোল ষ্টেসনে পঁহুছিল। সুকুমারী

ভ্রাতাটিকে কোলে করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। প্রাণ তাঁর ভয়ে কণ্ঠাগত, হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, কি জানি কি সংবাদ শুনিতে পান। গোপালের মুখ স্মরণ হইয়া চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছে। যোগেন্দ্র তাঁহাকে ষ্টেসনের বাহির করিয়া একটি পথ দিয়া কিছু দূর লইয়া গেল এবং এক বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই খানে একটু অপেক্ষা কর আমি একজন লোক পাঠাইয়া প্রথমতঃ সংবাদ লই।" যোগেন্দ্র একটি নিজের সহচর লোককে এক দিকে পাঠাইয়া দিল। কয়েক মিনিট পরেই একটি লোক যোগেন্দ্রর নিকট আসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল। যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে কি সংবাদ ?" লোকটি উত্তর করিল "আর ভাই, অনেক চেষ্টা করিলাম, লোকটিকে বাঁচাইতে পারিলাম না। এমন ডাক্তার কবিরাজ এখানে নাই যাহাকে দেখাই নাই, তোমরা বিনয়কুমার বাবুর নিকট আসিয়াছিলে বলিয়া আমি আর চেষ্টা করিতে কিছু বাকী রাখি নাই, তা করিলে কি হবে, আসল কলেরা, শিবের অসাধ্য রোগ। আজ সন্ধ্যার সময় লোকটির মৃত্যু হইল।"

সুকুমারী একটি অস্ফুট-ধ্বনি করিয়া বৃক্ষতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। শিশু শরৎ ক্রন্দন করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সুকুমারীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। যে সুকুমারী হৃদয়ের গূঢ়তম স্থান হইতে যোগেন্দ্রকে ঘৃণা করিতেন সেই সুকুমারীই আজ মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর আপনাকে নিতান্ত নিঃসহায় ভাবিয়া যোগেন্দ্রের পদতলে আছড়াইয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্রও তাঁহার সঙ্গে অনেক ক্রন্দন করিল ও বুঝাইল। যোগেন্দ্র অবশেষে সংবাদদাতা লোকটিকে সৎকার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। সে লোকটি উত্তর করিল, "হাঁ, তা করিয়াছি বৈ কি, অনেক চেষ্টায় চারিজন ব্রাহ্মণ যোগাড় করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া

দিয়াছি। ঐ দেখ না চিতা দেখা যাইতেছে দাহ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।”

কিছুদূরে চিতাগ্নির ন্যায় একটা অগ্নি দেখা গেল। সুকুমারী কিয়ৎক্ষণ অনিমেষলোচনে সেই অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তাঁহার চিত্ত সে চিতাগ্নি অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক জ্বালাময় শিখায় জ্বলিতে লাগিল। তিনি উন্মাদগ্রস্তার ন্যায় সেই অগ্নি নিরীক্ষণ করিতে করিতে পুনরায় জ্ঞান হারাইলেন।

সংবাদদাতা লোকটি যোগেন্দ্রকে চুপে চুপে বলিল, “ওহে এইবার মেয়েটা খুব ভয় পেয়েচে, এখন যা বলিবে তাই বোধ হয় শুনিবে। চল আজই ভোরের গাড়ীতে উহাকে লইয়া কলিকাতা রওনা হই।” যোগেন্দ্র বলিল “দূর আহাম্মক, ভোরের গাড়ীতে যাইলে অধিকাংশ রাস্তা দিনের মধ্যে পড়িবে, কোন চেনা পরিচিত লোক সম্মুখে পড়িলে আবার গোলমাল বাধিবার সম্ভাবনা। আমি বলি কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই খানে রাখিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হওয়া যা’বে, যে সমস্ত রাস্তাটা রাত্রিতেই কাটিবে এবং রাতারাতিই কলিকাতায় পঁহুছিব।”

“সে মন্দ কথা নয়, তবে সেইরূপই ব্যবস্থা কর”

উভয় বন্ধুর পরামর্শ শেষ হইল। সুকুমারীও পুনর্ব্বার চৈতন্যলাভ করিলেন। যোগেন্দ্র তখন সুকুমারীকে বুঝাইতে লাগিল যে, পথে ক্রন্দন করিয়া আর ফল নাই, কোন গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইলেই ভাল হয়। সুকুমারী এখন সম্পূর্ণরূপ শোকবিহ্বলা এবং বিচারশক্তিহীনা। যোগেন্দ্র যেথায় লইয়া গেল তথায় তিনি নীরবে অনুগমন করিলেন। আর উপায়ান্তরই বা কি।

পর দিন সুকুমারী বাড়ী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যোগেন্দ্র বলিল “দেখ এখন বাড়ী যাইয়া তোমার কি উপকার; বরং অনেক বিপদের সম্ভাবনা। খোকা বাবুর ক্রোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তোমার

প্রধান সহায় ছিল গোপাল, তাহাও ত চুকিয়া গেল। এখন বাড়ী যাইলে তোমার কেবল অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া হইবে। তাহা অপেক্ষা বিনয়কুমার বাবুদের বাড়ীতে কিছু দিন থাকিলে তোমার ভালই হইবে। শুনিতেছি বিনয়কুমার বাবুরা অতি ভদ্রলোক। এই যে লোকটি—গোপালের চিকিৎসাদি করাইয়াছিল এটি বিনয় বাবুদেরই লোক। আমরা বিনয় বাবুর নিকট আসিয়াছিলাম শুনিয়াই এত যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিতেছে। এ লোকটি আমাদিগকে কলিকাতায় যেখানে বিনয় বাবুরা আছেন সেখানে লইয়া যাইতে রাজি আছে। আমি বলি আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে আমরা কলিকাতা রওনা হই। আর রাস্তায় রাস্তায় আমি স্ত্রীলোক লইয়া কত ভুগিব। আর দেখ, আমি তোমাকে গ্রামে লইয়া যাইতে পারিব না, তাহাতে আমার নিন্দা হইবে, যত দোষ আমারই শিরে চাপিবে। তোমাকে বিনয় বাবুর নিকট পঁহুছাইয়া দিব, তাহার পর তুমি বাড়ীতেই যাও বা যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে। এখন তোমার কি মত, কি ইচ্ছা বল।”

সুকুমারী কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, “দেখ, আমার আর নিজের মত, ইচ্ছা কিছুই নাই, আমার ইচ্ছায় কোন ফলও নাই। যখন বাড়ীর বাহির হই নাই, সমুদ্রে ঝাঁপ দিই নাই তখন আমার ইচ্ছানিচ্ছার সময় ছিল। এখন তরঙ্গে ভাসিয়াছি, কোথায় যাইয়া ঠেকিব কিছু কূল কিনারা দেখিতেছি না। কেবল ভগবানের কৃপা মাত্র সার। তুমি আমার হাজার হউক গ্রামের লোক, এ অবস্থায় তোমাকে না বিশ্বাস করিয়া আর উপায় কি? যাহা ভাল বিবেচনা হয় কর। আমার মতামত কিছু নাই।”

যোগেন্দ্রের হৃদয় আশায় ও আনন্দে সাত হাত ফুলিয়া উঠিল; ভাবিল সুকুমারী এইবার তাহার বশে আসিয়াছে। আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া রাত্রির গাড়ীতে সুকুমারী ও তাহার ভ্রাতাকে লইয়া

কলিকাতায় রওনা হইল। যোগেন্দ্রের সঙ্গী অপর লোকটিও তাহাদের সাথী হইল। এ লোকটিকে পাঠক চিনিয়াছেন কি? শ্যামলাল চৌধুরীর বাড়ীতে যে লোকটি যোগেন্দ্রের গলা ধরিয়া পরামর্শ করে এ সেই লোক। যোগেন্দ্র ইহাকেই বিনয়কুমার বাবুদের লোক বলিয়া সুকুমারীর নিকট পরিচয় দিয়াছিল। ইহার নাম সাতকড়ি দাস।
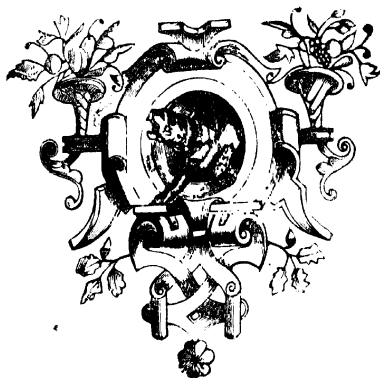
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন লোক।

জাগরণ ও নিদ্রার মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার মানসিক অবস্থা আছে যাহাতে নিজের দুঃখবিপত্তিময় অবস্থার অস্পষ্ট চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে, ঘোর বিভীষিকাময় অস্বাভাবিক স্বপ্নজাল মনের সম্মুখে বিস্তৃত হইতে থাকে। যাহাদের হৃদয়গ্রন্থি কখন তীব্র যাতনায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, ভবিষ্যৎ ঘোর বিভীষিকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহারাই এ অবস্থা অবগত আছে। গাড়ীতে অধিকাংশ রাস্তাই সুকুমারীর এই রূপ অবস্থায় কাটিল। সুকুমারী জাগরিতা নহেন; তথাচ গাড়ীর অবিরাম নির্ঘোষ, ষ্টেশনের ষ্টেশনের লোককোলাহল, সুদূরাগত অস্পষ্ট কল্লোল-ধ্বনির ন্যায় তাঁহার চেতনায় সর্ব্বদা বিরাজিত। সেইরূপ স্বপ্নাবেশময় মনে তিনি কখন দেখিতেছেন যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বিকট মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, এবং সেই ব্যাঘ্রের উপরে যেন যোগেন্দ্র চাপিয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যোগেন্দ্র যেন ব্যাঘ্রের সহিত মিশিয়া গেল এবং শুদ্ধ ব্যাঘ্রটা গর্জ্জন করিতে লাগিল; আবার তখনই যেন ব্যাঘ্রটা অদৃশ্য হইল, শুদ্ধ যোগেন্দ্র তাঁহাকে কখন মিষ্টবাক্যে অনুনয় করিতে লাগিল এবং কখন বা ভ্রূকুটিবদ্ধ ক্রূর দৃষ্টিতে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কখন বোধ করিতেছেন যেন অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে অতলগভীরে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং যোগেন্দ্র যেন সেই শৃঙ্গোপরি দাঁড়াইয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। কখন ভাবিতেছেন তাঁহার শিশু ভ্রাতাটি হারাইয়া গিয়াছে, তিনি ব্যাকুল প্রাণে অন্বেষণ করিয়

বেড়াইতেছেন ; পরে অন্বেষণ করিতে করিতে ভাইটিকে যেন নিজেদের বাড়ীতেই গোপালের কোলে দেখিতে পাইলেন ; তাঁহার সকল ব্যাকুলতা দূর হইয়া গেল ; গোপালকে দেখিয়া অপার শান্তি হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল, ভাবিতে লাগিলেন "এ কি গোপাল দাদাকে যে মৃত ভাবিতেছিলাম, তা ত নয় সেটা স্বপ্ন, এই যে গোপাল দাদা জীবিত।" এইরূপ অনুভূতির পরই সেই স্বপ্নাবেশময় অবস্থা কাটিয়া গেল, বাস্তব চৈতন্য জাগিয়া উঠিল, নিজের যথার্থ অবস্থা স্মরণ হইল। সুকুমারী শিহরিয়া উঠিয়া ভাইটিকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গাড়ীখানাও হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিল।

অন্ধকার প্রান্তর হইতে দিবালোকসদৃশকিরণোদ্ভাসিত হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীটা পঁহুছিবামাত্র সুকুমারী ও শরৎ কিছু চমকিত হইয়া উঠিল। ক্রমে যোগেন্দ্র ও তাহার সহচর লোকটি আসিয়া সুকুমারী ও শরৎকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়গাড়ীতে যাইয়া উঠিল। কোচমান অশ্বে কশাঘাত করিল। গাড়ী চলিল। কোথায় যাইতেছে, সুকুমারী কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। বুঝিতে কৌতুহলও আর নাই। অদৃষ্টের উপর এখন তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর। একবার ভাগীরথীবারিশীকরসিক্ত নৈশ সমীরণ তাঁহার চিন্তাসন্তাপদগ্ধ দেহে সুধা সিঞ্চন করিয়া বহিয়া গেল। পুল পার হইয়া গাড়ী উত্তরাভিমুখে চলিল। একবার এক স্থানে গাড়ী থামিল ; যোগেন্দ্রের সহচর সাতকড়ি দাস নামিয়া একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিল, এবং প্রায় আধ ঘণ্টা বাদ ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী আবার উত্তরাভিমুখে চলিল। কলিকাতার সীমা পার হইয়া গাড়ী একটি প্রশস্ত উদ্যানস্থিত সুন্দর ক্ষুদ্র অট্টালিকা পার্শ্বে যাইয়া খাড়া হইল। যোগেন্দ্র ও সাতকড়ি অবতরণ করিয়া সুকুমারী ও শরৎকে একটি কক্ষে লইয়া

যাইয়া বিশ্রাম করিতে বলিল। বিশ্রামোপযোগী শয্যাদি সেখানে সমস্তই ছিল।

অতি অল্পক্ষণ পরেই প্রাভাতিক কাকলিধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একখানা গাড়ীর গড়গড় শব্দও শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া সেই অট্টালিকা পার্শ্বে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে একটি মধ্যবয়স্কা গৌরবর্ণা স্ত্রীলোক এবং এক ত্রিংশ বর্ষীয় শোভনকান্তি যুবাপুরুষ বাহির হইল। স্ত্রীলোকটি সুকুমারী যে কক্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন তথায় প্রবেশ করিল এবং যুবাপুরুষটি অট্টালিকার বারান্দায় এক চেয়ারে উপবেশন করিলেন। স্ত্রীলোকটি যাইয়াই শরৎকে কোলে করিয়া বাহিরে আনিয়া বলিল, "দেখুন দাদা বাবু, দিব্যি ছেলেটি, ঠিক যেন আমাদের ছোট দিদিবাবুর বড় খোকাবাবুর মত।" এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী শরৎকে সেই যুবাপুরুষের নিকট নামাইয়া দিল। যুবাপুরুষটি শরতের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শরতের হাত ধরিয়া তিনি সুকুমারী যে গৃহে ছিলেন তাহার দ্বার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্তা স্ত্রীলোকটিকে তৎপর সুকুমারীর আহারাদির এবং যাহা কিছু আবশ্যক সকলের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন, এবং সুকুমারীরও সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "দেখুন আপান কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না, মনে করিবেন যেন আপনার ঘর, যাহা আবশ্যক হয় বলিবেন। আপনার আহারাদির ব্যবস্থা এইখানে হইবে। আমি শরৎকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি, তাহাকে বাড়ীতে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে যুবকের দৃষ্টি একবার সুকুমারীর দৃষ্টির সহিত মিলিল। সেই শোকবিবর্দ্ধিত অতুল সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিয়া, সেই ক্লিষ্ট অথচ প্রশান্ত নয়নদ্বয়ের বিমল জ্যোতির সম্মুখীন হইয়া যুবক বিচলিত হইলেন, কথাগুলি তাড়াতাড়ি ও ভাঙ্গা স্বরে বাহির হইল এবং নয়ন নিমীলিত হইয়া গেল। সুকু-

মারী ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনয়কুমার বাবু কোথায় ?" যুবক অগ্রেই সুকুমারীকে এবিষয় জ্ঞাপন করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু সুকুমারীর সম্মুখে আসিয়া তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন,"বিনয় আমার কনিষ্ঠ, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পীড়া হেতু তাহাকে এক স্থানে আবশ্যক বশতঃ পাঠান হইয়াছে, সেখান হইতে আসিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইবে, সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই, বিনয় থাকিলেও যেমন, আমি থাকিলেও আপনার সেইরূপই যত্ন হইবে "

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর যুবক শরৎকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। স্ত্রীলোকটি বিশেষ যত্নসহকারে সুকুমারীর আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিল। সুকুমারী হবিষ্য পাক করিয়া কথঞ্চিৎ আহার করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শরৎ আহারাদি করিয়া নূতন পোষাকে সজ্জিত হইয়া যোগেন্দ্রের সহিত গাড়ীতে ফিরিয়া আসিল এবং ভগিনীর নিকট সেই যুবকদের বাড়ী ঘর, লোকজনের যত্ন আত্মীয়তার অনেক গল্প করিল এবং বলিল যে, তাহাকে পরদিন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সুকুমারী শুনিয়া অনেকটা যেন শান্ত হইলেন। বাস্তবিকই শরৎকে তৎপরদিন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে কএকদিন কাটিতে লাগিল।

সুকুমারী সেই উদ্যানবাটিকাতেই রহিলেন। শরৎ তাঁহার নিকট আহারাদি করিয়া স্কুল যায় ও ফিরিয়া আসে, ও নানাপ্রকার গল্প সল্প করে। তাহার মনের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া সুকুমারীরও চিত্ত [illegible] যেন একটু স্থির হইতে লাগিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে যুবকের উল্লেখ করিয়াছি তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া এক্ষণে আবশ্যক হইতেছে। নওয়াদা ষ্টেসনের নিকটে শ্যামলাল চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির যে এক বাড়ীর কথা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে এই যুবক সেই বাড়ীর মালিক। শ্যামলাল চৌধুরী কলিকাতার এক জন খ্যাতনামা ধনী ব্যক্তি ছিলেন। কুলির কণ্ট্রাক্টরী কার্য্য করিয়াই তাঁহার ধনাগম হয়। কুলি সংগ্রহের জন্য সকল প্রধান প্রধান জায়গায় তাঁহার একএকটি আড্ডা, ও অনেক কর্ম্মচারী থাকিত। নওয়াদায় একটি প্রধান আড্ডা ছিল। শ্যামলাল চৌধুরী এখন পরলোকগত। তাঁহার পুত্র বিনোদলাল এখন গদিতে বসিয়াছেন। উক্ত যুবকই এই বিনোদলাল। পিতার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া বিনোদলাল বাবু মানবজীবনের সম্পূর্ণরূপ চরিতার্থতা সাধনে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না।

উদ্যানবাটিকায় সুখের সকল প্রকার উপকরণই সংগ্রহ করিয়াছেন এবং দিবা রাত্রির অধিকাংশ সময়ই সেইখানে অতিবাহিত করেন। কুলির কণ্ট্রাক্টরী কাজ চলিতেছে, কিন্তু কোন তত্ত্বাবধারণ নাই। কর্ম্মচারীরা যাহা ইচ্ছা করিতেছে। পীড়ন, প্রতারণা ও নিষ্ঠুরাচরণ যে কার্য্যের অঙ্গীভূত, স্বার্থলুব্ধ, ধর্ম্মজ্ঞানহীন কর্ম্মচারীর উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হওয়ায় তাহা আরও অধিক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কর্ম্মচারীরা প্রভুর রুচানুযায়ী সুখোপকরণের আয়োজন করিয়া দিয়া আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধ করিতেছে। সাতকড়ি দাস এইরূপ একটি কর্ম্মচারী। সে ভাবিয়াছে সুকুমারীরূপ প্রীতিকর উপঢৌকন দিয়া প্রভুর বড়ই প্রিয়

পাত্র হইবে এবং যথেচ্ছ কায করিতে পারিবে। সাতকড়ি যোগেন্দ্রের মাতুলালয়ের লোক। বাল্যকাল হইতে উভয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। সাতকড়ির সহিত যোগেন্দ্র কিছুদিন কুলির আড়কাটির কাযও করিয়াছিল। উভয়ের বুদ্ধিবলে আজ সুকুমারী বিনোদ বাবুর হস্তগত। উভয়েরই কিন্তু স্বার্থের দিকে তীব্র দৃষ্টি। সাতকড়ি চায় প্রভুর পরিতোষ, যোগেন্দ্র চায় কিছু অর্থ।

একদিন বিকালে বিনোদ বাবু আপনার বৈঠকখানায় আসীন; মুখে কিছু বিরক্তির ভাব, ভ্রূ কুঞ্চিত। সাতকড়ি আসিয়া তথায় প্রণাম করিয়া বসিল। বিনোদ বাবু মুখ হইতে আলবোলার নল খসাইয়া বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "আরে তুমি ত ভাল এক মেয়েমানুষ এনে দিয়েচ, তোমার সঙ্গে যে লোকটা এসেচে সে যে আবার তার জন্য দু হাজার চারি হাজার দাবী করে। হুঃ, জঙ্গলী মেয়ে, না জানে কথা কহিতে, তার জন্যে আবার টাকা দিতে হবে, বলি কলকাতায় কি আর মেয়েমানুষ থাকে নাই?"

সাতকড়ি। হুজুর যোগেন্দ্র যে আপনার নিকট টাকা চাহিয়াছে, এ কথার আমি বিন্দুবিসর্গও জানি না। তার টাকা পাইবার কি অধিকার? যদি সে ফের এ কথা বলে, গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবেন।

বিনোদ। তাত দিবই! আমি এমনি কাঁচা লোক যে ও বেটার কথাতেই টাকা বাহির করিয়া দিব। কিন্তু দেখ মেয়েমানুষটা বড় সুবিধার নয়, মুখে একটা কথা নেই, কেবল ঘাড় গুঁজে বসে আছে।

সাতকড়ি। আজ্ঞে সে জন্য ভাবনা নাই। আপনার বাগানে যে ঝী আছে, তাহার হাতে দিন কয়েক থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে।

বি। তাহারই উপর ত ভার দিয়াছি, দেখি কি হয়, আজ বিকালে এখন বাগানে যাইব।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কঠিন পরীক্ষা।

বেলা ৪টা বাজিয়াছে। বিনোদ বাবুর উদ্যানবাটিকায় সুকুমারী ও পরিচারিকা, অপর কোন ব্যক্তি নাই। পরিচারিকা অবশ্য সাধারণ চাকরাণী নহে, সুরূপা, সুভাষিণী, সাভরণা, হাবভাবশীলা, চতুরা। পরিচারিকা সুকুমারীকে বলিল, "হাঁ গো দিদি, তুমি এখানে এসে যে এই ছোট ঘরটিতে ঢুকেচ আর কোথাও বাহির হতে চাও না। এমন ক'রে একজায়গায় মনমারা হইয়া থাকিলে আর বাঁচিবে কয় দিন, এস একবার বাহিরে দাঁড়াই।" ঘরের ভিতর অনবরত বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সুকুমারীরও প্রাণ যেন হাঁপাইতেছিল। সুকুমারী বাহিরে আসিলেন। বাহিরে সুপরিপাটী উদ্যান, স্তরে স্তরে কুসুম, নানাবর্ণের পত্ররাশি, অপূর্ব্ব শোভা; ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে। সুকুমারী কিন্তু এ সকল কিছুই দেখিলেন না। পরিচারিকা অনেক রকম কথা বলিতেছিল, তাহাও শুনিলেন না; কলের পুত্তলিবৎ কেবল পরিচারিকার অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। উদ্যানে একটু ইতস্ততঃ বেড়াইয়া পরিচারিকা সুকুমারীকে একটি স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া গেল। ঐ গৃহের সজ্জা অপূর্ব্ব সুন্দর; গৃহতল বহুমূল্য কার্পেটমণ্ডিত, দুই পার্শ্বে দুই সুঠাম সোফা, তদুপরি সুকোমল মকমলের গদি, মধ্যস্থলে সুন্দর পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ কুসুম-কোমল শয্যা; শয্যোপরি রাশি রাশি পুষ্প, পর্য্যঙ্কের চারি কোণে ফুলদানির উপর চারিটি বৃহৎ সুগন্ধি কুসুমের তোড়া, দেওয়ালে সারি সারি সুন্দর দেয়ালগিরি, তাহার মধ্যে মধ্যে এক একখানা নন্দনকাননের বিলাসপরায়ণা, মদবিভ্রান্তলোচনা, বিবসনা অঙ্গনা চিত্র, সেগুলি আবার

পুষ্পমাল্যে বেষ্টিত, গৃহের বায়ু স্নিগ্ধ ও সুগন্ধামোদিত। অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র গৃহমধ্যে যথা তথা স্থিত। সুকুমারী এই গৃহে প্রবেশ করিলে পরিচারিকা হাত ধরিয়া তাঁহাকে একটি সোফায় বসাইল। সুকুমারী কলের পুত্তলিবৎ বসিয়া গৃহের সজ্জা ও উপকরণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকা ছন্দে বন্দে অনেক প্রকারের কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

সুকুমারী কিছুরই উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার অন্তরে এক মহাতঙ্কের উদয় হইতে লাগিল। এই উদ্যানবাটিকায় অধিষ্ঠান কালে সুকুমারীর মনে সর্ব্বদাই এক প্রকার আশঙ্কা জাগরূক থাকিত। আজ সেই আশঙ্কা, এই বিলাস গৃহে প্রবেশ করিয়া, ইহার সাজসজ্জা দেখিয়া এবং পরিচারিকার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, অবয়ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু পরিত্রাণের উপায় নাই। সুকুমারী আত্মবিস্মৃতা, অর্দ্ধোন্মত্তার ন্যায় বাক্য রহিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্তমিত হইল; গ্যাসালোক হঠাৎ প্রভাসিত হইয়া বিলাসগৃহ উজ্জ্বল করিল। এ আলোকে কিন্তু সুকুমারীর হৃদয়ান্ধকার ঘনীভূত হইল। অচিরে একখানি গাড়ী আসিয়া উদ্যানগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বিনোদ লাল, বাবু মোহনবেশে গাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া হেলিতে দুলিতে বিলাস-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই একটু জড়িত স্বরে বলিলেন "এই যে এ ঘরে পদার্পণ হয়েচে, আজ আমার কি সৌভাগ্য"। এই কথা বলিয়া বিনোদ বাবু প্রফুল্লবদনে অপর সোফায় বসিলেন এবং পরিচারিকাকে কি ইসারা করিলেন। পরিচারিকা তৎপর একটি কাচের গ্লাস পূর্ণ করিয়া আনিয়া বাবুর হাতে দিল। বাবু তাহা পান করিয়া, সুগন্ধবাসিত রুমালে একবার মুখ পুঁছিয়া হাসিতে হাসিতে সুকুমারীর দিকে তাকাইয়া জড়িত স্বরে পুনরায় বলিলেন, "যদি অনুগ্রহই হইল, তবে এত মলিন বেশে কেন প্রিয়ে!

এই লও হাতে অঙ্গুরী পর।” এই বলিয়া বিনোদ বাবু স্বহস্তের বহুমূল্য অঙ্গুরী খুলিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন। সুকুমারী এতক্ষণ স্পন্দহীন, বাক্যরহিত হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল। কিন্তু বিনোদ বাবুকে উঠিতে দেখিয়া তিনি তাড়িৎ বেগে পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন, এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। বিনোদ বাবু ফাঁপরে পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ দরজায় আঘাত করিলেন এবং অবশেষে “থাক বাবা কয়দিন এমন ক’রে থাকিতে পার, আমি এমন ঢং ঢের দেখেছি” এই কথা বলিয়া গম্ভীর ভাবে যাইয়া সোফায় বসিলেন এবং খানসামাকে হুকুম করিলেন শীঘ্র কুসুমজান নাচওয়ালীকে লইয়া আসা হয়।

রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়াছে, বিনোদ বাবুর দুই একজন বন্ধু বিলাস-গৃহে সমাগত হইয়াছে। সকলেই বিভোর। কুসুমজানের কণ্ঠধ্বনি হস্তের কঙ্কণকিঙ্কিণী, চরণের নূপুরনিক্কণ, ও নানাবিধ বাদ্যধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া বিলাসগৃহ জমকাইয়া তুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাবুদের অসংযত অর্থশূন্য অট্টহাস্য গৃহ ফাটাইয়া ফেলিতেছে। সুকুমারীর এমন সময়ে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যেন নরকের মধ্যে পতিত হইয়াছেন, চারিদিকে নরকাগ্নি জ্বলিতেছে এবং নারকী পিশাচগণ কলরব করিতেছে। তাঁহার মস্তিষ্কের যেন বিকারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইল। এই সময়ে চারিজন লোক মস্‌মস্‌ করিয়া আসিয়া উদ্যানগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সকলে একবারে অবাক্ হইয়া তাহাদের মুখের দিকে তাকাইল। তিন জন পুলিশ বেশ-ধারী, অপর একজন যোগেন্দ্র। পুলিশ বেশধারীর মধ্যে একজন হেডকনষ্টবল গৃহে প্রবেশ করিয়াই বিনোদ বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন “এখানে একজন স্ত্রীলোককে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে, বাহির করিয়া দিন”।

বি। স্ত্রীলোক কয়েদ করে রেখেচি! এ কি বাবা বদরসিক পেয়েচ যে স্ত্রীলোক কয়েদ করে রাখব, এই ত বাবা স্ত্রীলোক তোমার সামনে, সেজেগুজে নাচ্‌চে।

কুসুমজান একবার হেডকনষ্টবলের দিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া, ওড়নায় মুখ চাপিয়া মৃদুমন্দ হাসিল। বিনোদ বাবুর সহচর বাবুরাও সেই সঙ্গে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পুলিসের লোক কিন্তু বাগ মানিল না। যোগেন্দ্র তাহার উপর উৎসাহ দিতে লাগিল। বিনোদ বাবু একটু থতমত খাইল। হেডকনষ্টবল বলিল, "মশায় আমাকে খানাতল্লাসী করিতে হইবে, আমি সহজে ছাড়িতে পারি না।" যোগেন্দ্র অগ্রগামী হইয়া যে ঘরে সুকুমারী ছিল সেই ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা বন্ধ দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "জমাদার সাহেব এই ঘরে।" বিনোদ বাবুর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল, হাঁ, না, কিছুই উত্তর দিতে পারে না। জমাদার সুযোগ বুঝিয়া বিনোদ বাবুকে ইসারা করিয়া দক্ষিণার্থে দক্ষিণ করতল প্রসার করিল এবং বলিল "নচেৎ মকর্দ্দমা রুজু হইবে।" বিনোদ বাবুও দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া বিনা আপত্তিতে জমাদারকে সন্তোষ করিল। সুকুমারী যোগেন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কিছু বুকে বল বাঁধিয়া দরজা খুলিলেন। অবিলম্বে যোগেন্দ্র তাঁহাকে একটি গাড়ীতে উঠাইয়া একদিকে চলিয়া গেল। বিনোদ লাল বাবুর নিকট অর্থ প্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হইয়াই যোগেন্দ্র এরূপ করিয়াছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধান লাভ।

বিনয়কুমার রোটাসগড়ে টেলিগ্রাম পাইয়া কি করিলেন আমরা এ পর্য্যন্ত কিছু জানিতে পারি নাই। যে রাত্রিতে টেলিগ্রাম পাইলেন তাহার পর দিন তিনি ইস্‌লামবাদে যোগেশ চন্দ্রের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার পরদিন বাড়ী রওনা হইলেন। বাড়ীতে পূর্ব্বেই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন; ষ্টেসনে নামিয়াই দেখিলেন একটি লোক অশ্ব লইয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। বিশেষ কার্য্য বশতঃ তাঁহাকে কামিনীপুর যাইতে হইবে, লোক মারফত এই সংবাদ বাড়ীতে দিয়া, তিনি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একবারে কামিনীপুর মুখে যাত্রা করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই কামিনীপুরে পঁহুছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই বিনয়কুমারের টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিনয়কুমার অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই শ্রীশচন্দ্রকে সুকুমারীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীশচন্দ্র আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বর্ণনা করিলেন। বিনয়কুমার নিস্তব্ধ হইয়া সমস্ত শুনিলেন; তাঁহার পদতল হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল; কিন্তু কথায় সে আবেগ প্রকাশ না করিয়া তিনি বলিলেন, "একবার গোপাল-চন্দ্রের সহিত দেখা করিতে হইবে, তাহার মুখে সব কথা শুনিতে হইবে, তাহার পর প্রতিবিধানের চিন্তা করা যাইবে।" বিনয়কুমারের ব্যগ্রতাহেতু কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া উভয় বন্ধুতে তথনই গোপাল-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রামনগর গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। বিনয়কুমারকে দেখিয়া গোপালচন্দ্র বালকবৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আছড়াইয়া পড়িলেন। বিনয় কুমার ও

মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার উন্নত ভ্রূযুগল-শোভিত নয়নদ্বয় প্রথমে আরক্তিম, পরে জলপূর্ণ লইয়া উঠিল, মুখে বাক্য আসিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে গোপাল একটু স্থির হইলেন এবং সকল ঘটনার সবিশেষ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীশচন্দ্র এ কাহিনী অনেক বার শুনিয়াছেন, তিনি বড় বিচলিত হইলেন না, কিন্তু বিনয়কুমারের হৃদয় এক এক ঘটনার বর্ণনায় নিতান্ত ব্যথিত হইতে লাগিল এবং ক্রোধে ও দুঃখে তিনি যেন এক একবার আত্মহারা হইতে লাগিলেন। তাঁহার নাম লইয়াই এই লোমহর্ষণ প্রতারণা সংঘটিত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। তিনি সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরবে পদচারণ করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে হস্ত দিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন "ভাই শ্রীশ, সুকুমারী ও শরৎকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবেই, এ অত্যাচারের দণ্ড দিতে হইবেই, এখন উপায় কি বল।" শ্রীশচন্দ্র শীঘ্র কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বিনয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে কি?" শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "পুলিশে এ অবস্থায় সংবাদ দিয়া যে বড় লাভ আছে তাহা বোধ হয় না। মিছা-মিছি একজন আসিয়া একটু গোলযোগ করিবে এবং শেষে বলিবে স্ত্রীলোকটা আপনা হইতে চলিয়া গিয়াছে। বিনয়কুমার একথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া বলিলেন "তবে এখন প্রথম কর্ত্তব্য কি?"

শ্রী। প্রথম কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করা। যদি কোনরূপ সন্ধান পাই তখন পুলিশ বা মাজিষ্ট্রেটকে অবগত করাইয়া কার্য্য করা।

বি। কিরূপে অনুসন্ধান করিবে, কোথায় অনুসন্ধান করিবে?

শ্রী। তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিরূপে বলিব? পরামর্শ করিতে হইবে। তুমি অনেক দুর হইতে আসিয়াছ, চল এখন স্নান আহার করিবে; বুদ্ধি স্থির করিয়া একটু ভাবিতে চিন্তিতে হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, বিনয়কুমার শ্রীশচন্দ্র ও গোপাল সকলে শ্রীশচন্দ্রদের বাড়ী আসিলেন। বিনয়কুমার স্নান আহার করিলেন। কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্ক স্নান আহার কালেও অনুক্ষণ শরৎসুকুমারীর অনুসন্ধানের উপায় চিন্তনে ব্যস্ত ছিল। আহারান্তে বাহিরে আসিয়া বসিয়াই তিনি বলিলেন, "আচ্ছা শ্রীশ, যোগেন্দ্র কি এ পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রীকে কি অন্য কোন আত্মীয়কে পত্রাদি লিখিবে না, এই অনুসন্ধানটা প্রথমে করিলে হয়, কোথা হইতে সে পত্র লেখে।"

গো। মহাশয়, সে কথা তাহার মা কি স্ত্রী কেহ কি প্রকাশ করিবে? তার মা যে চতুর স্ত্রীলোক; সে ঠাকুরের নৈবিদ্দি হতে জিনিষ চুরি করিয়া রাখে, পূজারি ব্রাহ্মণ তাহা টের পায় না। সেই বেটির বুদ্ধি পাইয়াই না যোগেন্দ্র এত বদমাইস হয়েচে।

বিনয়কুমার গোপালের কথা শুনিয়া দুঃখের উপরও একটু হাসিলেন। শ্রীশচন্দ্র বলিলেন "বিনয়, তুমি একটা উপায় ভাবিয়াছ বটে, চেষ্টা করিলে ফল হইতে পারে।"

বি। তাহার আত্মীয়ের কাছে অনুসন্ধান করিলে কিন্তু কুফল হইবে।

শ্রী। তাহার আত্মীয়ের কাছে কেন জিজ্ঞাসা করিব? ডাকঘরে অনুসন্ধান করিব।

বি। বেশ কথা। তবে শীঘ্র প্রস্তুত হও।

এই পরামর্শের পর বিকালে বিনয় শ্রীশ ও গোপাল তিন জনেই নবগ্রাম ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের হাটতলায় সামান্য একটি গৃহে একটি চিঠির বাক্স ঝুলিতেছে। এই নিদর্শনে বিনয়কুমার প্রভৃতি এই গৃহে যাইয়া উঠিলেন। পোষ্টমাষ্টারটি—একটি কামিজ গায়ে, বুট পায়ে নব্য ছোকরা, ইতিপূর্ব্বে এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে শ্রীশচন্দ্রদের বাড়ী যাওয়ায় তাঁহার সহিত পরিচিত ছিল; দুইটি ভদ্রলোক সহ শ্রীশচন্দ্রকে দেখিয়া কিছু ব্যস্ত হইল এবং সকলকে বসিবার জন্য অনু-

রোধ করিল। কিন্তু সকলে বসে কিসে। অতি পুরাতন একখানি তৈলাক্ত, কৃষ্ণবর্ণ তক্তাআঁটা চেয়ারও একটি ভাঙ্গা মোড়া মাত্র ডাকঘরের আস্‌বাব। পোষ্টমাষ্টার নিকটস্থ দোকান হইতে একটি চৌকী আনিবার জন্য লোক পাঠাইতেছিল, কিন্তু শ্রীশচন্দ্র নিষেধ করিয়া ডাকঘরের টেবিলের এককোণে পা ঝুলাইয়া বসিলেন, বিনয়কুমার চেয়ারখানিতে বসিলেন ও গোপালচন্দ্র মোড়ায় বসিলেন। পোষ্টমাষ্টার টেবিলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ইহাঁদের সহিত গল্পে নিযুক্ত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝনাক্‌ ঝনাক্‌ শব্দ শ্রুত হইল। পোষ্ট মাষ্টার "পশ্চিমের ডাক আসিল" বলিয়া বাহিরে আসিলেন। ঘর্ম্মাক্ত ডাকহর্করা ডাকের ব্যাগ্‌ তাহার হাতে দিয়া গাছতলায় বসিল। পোষ্টমাষ্টার ব্যাগ খুলিয়া টেবিলের উপর পত্রগুলি বাহির করিল। এই সময় শ্রীশচন্দ্র, পোষ্টমাষ্টারের সহায়তার ছলে, একখানি একখানি করিয়া সমস্ত পত্রগুলিই দেখিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই গোপালের নিকট যোগেন্দ্রর মাতার, স্ত্রীর ও শ্বশুরের নাম জানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি একখানি তাহার স্ত্রীর নামে চিঠি দেখিলেন। সেইটি হাতে তুলিয়া লক্ষ্য করিয়া যে যে ডাকঘরের মোহর আছে দেখিলেন। প্রথম মোহর দেখিলেন "নওয়াদা"। তাঁহার মুখ একটু প্রফুল্ল হইল। সে চিঠি তিনি টেবিলে ফেলিয়া দিয়া অন্য গল্প আরম্ভ করিলেন। পোষ্টমাষ্টার চিঠি সকল বিলি করিবার জন্য পেয়াদার হাতে দিল। শ্রীশের সঙ্কেত মত বিনয়কুমার ও গোপাল সকলে উঠিয়া আসিলেন। কিছু দূর আসিয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন "একটা ভুল হইয়া গিয়াছে"।

বি। কি

শ্রী। চিঠিখানা খুলিয়া একবার পড়িলে হইত।

বি। তা পড়িতে দেবে কেন? আর খুলিয়া পড়িতে গেলে আমাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া যাইতে পারিত।

শ্রী। পড়িতে দেবে না কেন, হর্করা বেটাকে কিছু দিলেই এখনি পড়িতে দেবে।

বি। আর ছিঃ তাঁয় দরকার কি। তুমি ত পোষ্ট আপিসের মোহরটা দেখিয়া লইয়াছ ?

শ্রী। এর আর ছি কি, তবেই তুমি কায উদ্ধার করেচ। হর্করা বেটা ঐ যাইতেছে নয় ? তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি আস্‌চি।

এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র হর্করার নিকট দ্রুতপদে গমন করিলেন। হর্করা শ্রীশচন্দ্রের অনুরোধ শুনিয়া প্রথমতঃ রাজি হইল না, “বাবু, আমাদের পুঁটী মাছের প্রাণ, একটু গোলমাল হইলেই মারা যাব” এইরূপ কহিয়া ওজর করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র পকেট হইতে একটী টাকা লইয়া ঝাঁ করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলেই আর কোন ওজর আপত্তি করিল না। শ্রীশচন্দ্র যোগেন্দ্রের স্ত্রীর নামে চিঠিটি সাবধানে খুলিয়া পড়িয়া লইয়া আবার বেমালুম বন্ধ করিয়া দিলেন। চিঠির ভিতরে স্থানের নাম বা তারিখ কিছুই নাই, শ্রীশচন্দ্রের কাযে লাগিতে পারে, এমন কোন সংবাদও নাই। তবে যোগেন্দ্রের বাড়ী আসিতে এখনও ও দুই তিন মাস বিলম্ব আছে এই সংবাদটি তাহাতে ছিল, এবং একজন সাতকড়ির নামের ও উল্লেখ ছিল। শ্রীশচন্দ্র বিনয়কুমার ও গোপালের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং চিঠির মর্ম্ম অবগত করাইলেন। সর্ব্বপ্রথমেই নওয়াদা যাওয়া সকলে স্থির করিলেন। কালক্ষেপ না করিয়া সেই দিনই তাঁহারা তিনজনে ষ্টেশনে গমন করিলেন, এবং যথাসময়ে গাড়ীতে উঠিলেন। গোপালচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে যেখানে যাহা হইয়াছিল, বলিতে ও দেখাইতে লাগিলেন। জংশন ষ্টেশনে শ্রীশচন্দ্র ও বিনয়কুমার উভয়ে নামিয়া ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদের নিকট সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের মধ্যে আবার নূতন আলোকে সমালোচনা-স্রোত চলিতে লাগিল। নওয়াদায় পঁহুছিয়া বিনয়কুমার প্রভৃতি ষ্টেশনের লোক-

দিগের নিকট সংবাদ লইতে লাগিলেন। কেহই কোন স্থির খবর দিতে পারে না। তবে দুই এক জন ভাসা ভাসা ভাবে কহিল যে তাহার একটি যুবক, একটি অল্পবয়স্ক সুন্দরী স্ত্রীলোক এবং একটী বালককে দেখিয়াছিল, এবং তাহারা কুলি ডিপোর নিকট কিছু দিন থাকিয়া দিন কয়েক হইল চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদে বিনয়কুমার ও শ্রীশ শিহ-রিয়া উঠিলেন। কুলি ডিপোর নাম শুনিয়াই যোগেন্দ্রের পৈশাচিক কল্পনা যেন তাঁহারা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। যেখানে কুলিডিপো আছে সেই স্থানে তাঁহারা তৎপর গমন করিলেন। সুকুমারীর তথায় অবস্থানকালে আমরা যে একটি বাঙ্গালী রমণীর পরিচয় পাইয়াছি তাহার সহিত বিনয়কুমার প্রভৃতির সাক্ষাৎ হইল। শ্রীশচন্দ্র দেখিবামাত্র সে কি প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহা বুঝিতে পারিলেন। এবং একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া শরৎ সুকুমারীর বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেইরূপ একটি স্ত্রীলোক ও বালককে সে দেখিয়াছে কি না। স্ত্রীলোকটি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যেন আকাশ হইতে পতিত হইল এবং কপালে চক্ষু তুলিয়া জীব কাটিয়া বলিল, "ওমা সে কি! তাও কি কখন হয়, আমরা সে কথা কি করে জানিব?" শ্রীশ পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন "যদি ঠিক ঠিক খপর দিতে পার, তবে আর ও দশ টাকা পুরস্কার দিব।" রমণী আমিষলোভী বিড়ালের ন্যায় টাকা কয়টির দিকে তাকাইয়া সুর বদলাইয়া বলিল, "একটি মেয়েমানুষ কয়দিন হইল এসেছিল বটে, তাহার সঙ্গে একটি ছেলেও [illegible]। আপনি যে রকম বয়স ও দেখিতে বলিতেছেন সেইরূপই বটে, কিন্তু তাহারা ত আর এখানে নাই।

শ্রী। তাহাদিগকে কে আনিয়াছিল।

স্ত্রী। তা মশাই ঠিক জানি না, তবে একটি লোক তাদের সঙ্গে ছিল, তার নাম যোগিন্ বাবু না কি যেন সকলে বলিতে লাগিল।

শ্রীশচন্দ্র উৎসাহিত হইয়া পাঁচটি টাকা স্ত্রীলোকটির হাতে দিলেন এবং পুনরায় বলিলেন "দেখ যদি তুমি সেই স্ত্রীলোক ও বালকটিকে কোথায় লইয়া গিয়াছে আমাদিগকে ঠিক করিয়া বলিতে পার তাহা হইলে তোমাকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করিব।" স্ত্রীলোকটি আঁচলের খুঁটে টাকা কয়টি বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "তা আপনারা যেথানে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন আমি বলিব না কেন, সত্য কথা বলিব, তায় দোষ কি, তাহাদিগকে কোথায় লইয়া গিয়াছে জানেন, কলিকাতার বাগবাজারে বিনোদলাল চৌধুরী নামে একজনের কুলির কারবার আছে। তাহারি কাছে লইয়া গিয়াছে। এইরূপ ত পরামর্শ হইয়াছিল জানি, তবে এখন কোথায় আছে কি না, তা কিছু জানি না।

শ্রী। ঠিক বলিতেছ এইরূপ পরামর্শ হইয়াছিল?

স্ত্রী। হাঁ, ঠিক বলিতেছি।

শ্রী। বিনোদলাল চৌধুরীর বাড়ীর ঠিকানা জান?

স্ত্রী। না বাবু, সেটি আমি বলিতে পারিনা।

শ্রীশচন্দ্র আর পাঁচটি টাকা স্ত্রীলোকের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, কথা যেন ঠিক হয়; আর যদি আরও কোন সংবাদ আমাদের দরকার হয় বলিতে হইবে।" এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র বিনয়কুমারের সন্নিকটে গিয়া সকল কথা তাঁহাকে কহিলেন, এবং সকলে নওয়াদা ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে অনুসন্ধানে কলিকাতার বিনোদলাল চৌধুরী সম্বন্ধে আরও অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার বাড়ীর ঠিকানাও জানিতে পারিলেন। শ্রীশচন্দ্র বিনয়কুমারকে বলিলেন, "ভাই, দুটো মজবুত লোক ও আর কিছু টাকা সঙ্গে লইতে হইবে। তৎপর চেষ্টা করিলে আশা হয় ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিব।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শরতের উদ্ধার।

শ্রীশচন্দ্রের পরামর্শমত বিনয়কুমার দুই জন ভোজপুরী পিয়াদা ও কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া শ্রীশচন্দ্র ও গোপালের সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং বিনোদলাল বাবুর বাড়ীও অনুসন্ধান করিয়া লইলেন। গোপালচন্দ্র পিয়াদা দুইজন লইয়া বিনোদলাল বাবুর বাড়ী হইতে কিছু দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ ও বিনয়কুমার বিনোদলাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বিনোদলাল বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া নয়ন নিমীলিত করিয়া ধূম্রপান করিতে করিতে ঝিমাইতেছিলেন; সে গৃহে আর কেহ নাই। বিনয়কুমার ও শ্রীশ তথায় উপস্থিত হইলে, রক্তজবার ন্যায় লোহিত নয়নদ্বয় উত্তোলন করিয়া বিনোদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মশায়, আপনাদের কি আবশ্যক?" শ্রীশ ও বিনয় তাঁহার সন্নিকটে বসিয়া বলিলেন, "একটা বিশেষ আবশ্যক আছে, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তবেই ত।" বিনোদ বাবু আগ্রহ সহকারে বলিলেন "কথাটা কি আগে তাই বলুন।" শ্রীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কুলির কণ্ট্রাক্টারি কায আছে না?" বিনোদ বাবু বর্দ্ধিত ঔৎসুক্যের সহিত উত্তর করিলেন, "হাঁ, আছে, বহুকাল হইতে আছে, আপনাদের কি আবশ্যক?" বিনয়কুমার বলিলেন, "আমাদের একটা সংবাদ লওয়ার আবশ্যক আছে। ইতিমধ্যে আপনাদের কোন লোক কি একটি যুবতী বিধবা স্ত্রীলোক এবং শরৎ নামে ৮, ১০ বৎসরের একটি বালককে নওয়াদা ষ্টেসন হইতে আনিয়াছিল?" বিনোদ বাবু একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না,

সে কথাই নয়, আমাদের তেমন কারবারই নয়, কে আপনাদিকে এমন কথা বলিয়াছে।" এই কথা বলিয়াই বিনোদ বাবু খানসামাকে ডাকিলেন; সে নূতন করিয়া তামাকু দিয়া গেল; বিনোদ বাবু মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর ভাবে নল ধরিয়া বসিলেন। শ্রীশচন্দ্র ও বিনয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া শ্রীশের কথা মত উভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন। ফাটকের নিকট একটি লোক জিজ্ঞাসা করিল "কি মশায়, আপনাদের বাবুর কাছে কি কায ছিল?" শ্রীশচন্দ্র লোকটির দিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি উত্তর করিল, "আমার নাম শ্রীসাতকড়ি দাস।" শ্রীশচন্দ্রের, যোগেন্দ্রের চিঠিতে সাতকড়ি নামের উল্লেখ স্মরণ হইল এবং একটু আশান্বিত হইয়া তিনি ও বিনয়কুমার সাতকড়িকে কিছু তফাতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং শরৎ সুকুমারীর বৃত্তান্ত সে কিছু জানে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সাতকড়ি প্রথমে একটু খেল খেলিল, কিন্তু শ্রীশচন্দ্র কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে সরল করিয়া লইল। যোগেন্দ্রের উপর সাতকড়ির বিলক্ষণ রাগও ছিল, কারণ যোগেন্দ্র তাহাকে একবারে ফাঁকি দিয়া, বিনোদ বাবুর অপমান করিয়া, সুকুমারীকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। অতএব যোগেন্দ্রের উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সাতকড়ির বেশ সুযোগ উপস্থিত হইল। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী রাখিয়া সাতকড়ি যোগেন্দ্রের শরৎকুমারীকে লইয়া আসার কথা সমস্ত বিবৃত করিল। কেবল বিনোদ বাবুর উদ্যানবাটিকার কথাটা চাপিয়া রাখিল, এবং বলিল যে কলিকাতায় তাহাদিগকে লইয়া আসিয়া যোগেন্দ্র শরৎকে একজন চা-বাগানের কুলির সর্দ্দারের হাতে বেচিয়া সুকুমারীকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শ্রীশ ও বিনয়কুমার বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এই সাতকড়ি যোগেন্দ্রের একজন সাহায্যকারী। কিন্তু সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া কৌশলে ও অর্থবলে সকল কথা তাহার নিকট বাহির

করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাতকড়ি শেষে এপর্য্যন্ত প্রকাশ করিল যে শিয়ালদহে গোবিন্দ সরকার নামক এক কুলি কণ্ট্রাক্টরের ডিপোতে অনুসন্ধান করিলে শরৎকে পাওয়া যাইতে পারে। যে দিন যোগেন্দ্র বিনোদ বাবুর উদ্যানবাটিকা হইতে সুকুমারীকে লইয়া পলায়, তাহার পর দিন প্রাতেই সাতকড়ি, বিনোদ বাবুর উপদেশমত শরৎকে গোবিন্দ সরকারের একজন সর্দ্দারের সহিত তাহার আড্ডায় পাঠাইয়া দেয়। কারণ এরূপ না করিলে বিনোদ বাবুর বিপদের আশঙ্কা ছিল; শরতের স্কুলে পড়া সেই দিনই শেষ হইয়াছে, এখন বন্দীর ন্যায় কুলির আড্ডায় ইতর লোকের সহিত অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছে ও কাঁদিতেছে। সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না হঠাৎ এমন কেন হইল। ভগ্নীকে দেখিতে না পাইয়া তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। অবিরাম কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দেহ শীর্ণ হইয়াছে, মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দ সরকারের আড্ডা দেখাইয়া দিবার জন্য শ্রীশ ও বিনয়কুমার সাতকড়িকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সাতকড়ি কিছুতেই সম্মত হইল না। অবশেষে বিনয়কুমার, শ্রীশ ও গোপাল অনুসন্ধান করিয়া গোবিন্দ সরকারের কুলির আড্ডায় উপস্থিত হইলেন। সেখানকার লোকেরা ত প্রথমে বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্রকে একবারে উড়াইয়া দিল, কিন্তু ইঁহারা যখন চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিলেন যে তাঁহারা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন একটি ভদ্রলোকের ছেলে এই আড্ডায় আছে, এবং তাহাকে সহজে ছাড়িয়া না দিলে তাঁহারা পুলিশ আনিয়া আড্ডা তল্লাস করাইবেন, তখন একটি লোক "বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি" বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আসুন মশায়, কে আপনাদের ছেলে আছে দেখিয়া লউন"। বিনয়কুমার প্রভৃতি তাহার অনুসরণ করিলেন। একটি চারিদিকে পাকা উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ী, তাহার মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ খাপড়ার ঘর;

সেই ঘরে সকলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পুরুষ রমণীতে, বালকে বৃদ্ধে, বাঙ্গালী সাঁওতালে প্রায় এক শত লোক এক একটি টিনের থালা ও গেলাস লইয়া আহারে বসিয়াছে। বিনয়কুমার, শ্রীশ ও গোপাল চারিদিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। গোপালের নজরেই শরৎ প্রথমে পড়িল। গোপাল "ওরে এই যে আমার ভাই রে" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দৌড়িয়া যাইয়া তাহাকে কোলে লইল। বালক শরৎও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বিনয়কুমার ও শ্রীশের চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। শরৎ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ওগো গোপাল দাদা গো, যোগেন্দ্র আমাদিকে বলিয়াছিল তুমি মরিয়া গিয়াছ।" এই কথা বলিয়া তাহার ক্রন্দনের বেগ দ্বিগুণিত হইল। গোপালও তাহাকে বক্ষস্থলে চাপিয়া ধরিয়া দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া উঠিল। শ্রীশ ও বিনয়কুমার এ কথা শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং ক্রোধে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বিনয়কুমার তৎপরে গোপাল ও শরৎকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "এখন অধিক কাতর হইবার সময় নয়, সুকুমারীকে উদ্ধার করিতে বাকী আছে। এই বলিয়া সকলে বাহিরে আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র আড্ডার কর্ম্মচারীকে বলিলেন, "তোমরা এই বালককে কোথায় কিরূপে পাইলে, ঠিক করিয়া আমাদিগকে বল, না হলে আমরা তোমাদের উপরই মোকর্দ্দমা করিব।" কর্ম্মচারী একটি খাতা খুলিয়া বলিল, "এই দেখুন না মশায়, আমাদের লেখা আছে, যোগেন্দ্র বিশ্বাস বলিয়া একজন লোক এ বালককে আমাদের আড্ডায় পঁহুছিয়া দিয়া গিয়াছে। আমরা কিছুই জান না উহাকে কোথায় কিরূপ অবস্থায় পাইয়াছে।" সাতকড়ি চতুরতা করিয়া যোগেন্দ্রের নাম লিখিয়া দিয়াছিল। বিনয়কুমার বলিলেন "শ্রীশ এখন মোকর্দ্দমার কথা রাখ, প্রথমে সুকুমারীর উদ্ধারের চেষ্টা করা যাউক; তাহার পর মোকর্দ্দমার চেষ্টা।" শরৎকে সুকুমারীর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে উদ্যানবাটীতে বাস, এবং তাহাকে স্কুলে

ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া ও তাহার প্রতি আদর যত্নের কথা প্রভৃতি সমস্ত বলিল, কিন্তু কাহাদের বাড়ীতে ছিল, কোথায় সে বাড়ী, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই বলিতে পারিল না। আরও বলিল, যেদিন সন্ধ্যার সময় সে উদ্যান বাটীতে সুকুমারীকে দেখিতে পায় নাই, তাহার পর দিন রাত্রিতে তাহাকে এই কুলির আড্ডায় আনা হইয়াছে। ইহাতে বিনয়কুমার প্রভৃতি এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন যে, যোগেন্দ্র সুকুমারীকে কোন উদ্যানবাটীতে কয়েক দিন রাখিয়া অন্যত্র লইয়া গিয়াছে। এই উদ্যানবাটী যে বিনোদলাল বাবুর এ সন্দেহ তাঁহাদের মনে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইল। কিন্তু শুদ্ধ সন্দেহে এখন ফল নাই। বিশেষতঃ ইহা নিশ্চিত বোধ হইল যে সেখানে সুকুমারী আর নাই। শ্রীশচন্দ্র পুনরায় সাতকড়ির নিকট গমন করিলেন। শরৎকে সঙ্গে লইলে সাতকড়ি পাছে দেখা না দেয় এই ভাবিয়া তিনি একা গমন করিলেন এবং সাতকড়ির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাতকড়িকে সুকুমারীর সংবাদ দিবার জন্য হাতে পায়ে ধরিয়া বিশেষ অনুনয় করিলেন, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অভয় দিলেন এবং আরও কিছু অর্থ দিলেন। সাতকড়ি টাকাগুলির প্রথমতঃ ব্যবস্থা করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি ভদ্রলোক, এত করিয়া বলিতেছেন, আমি জানিলে কি আর এ সংবাদটা আপনাকে না দিতাম? এইত বালকটীর সংবাদ আমি জানিতাম, আপনাদিগকে ঠিক ঠিক বলিয়া দিলাম, আপনারাও সেই সংবাদমত তাহাকে পাইলেন; আমাকে তেমন জুয়াচোর মনে করিবেন না। তবে এই পর্য্যন্ত আপনাকে বলিতে পারি যে যোগেন্দ্র সেই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া আসাম অঞ্চলের দিকে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে কুলি করিয়া বিক্রয় করিয়াই আসুক বা কাহারও কাছে দিয়া আসুক এইরূপ তাহার কোন মতলব আছে। কলিকাতায় সে নাই একথা নিশ্চয়।"

শ্রীশচন্দ্র ফিরিয়া যাইয়া গোপাল ও বিনয়কুমারকে সকল কথা বলিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুকুমারীর উদ্ধার।

সাতকড়ির সহিত শেষ কথা বার্ত্তার পর চতুর্থ কি পঞ্চম দিনে আমরা দেখিতে পাই ধুবড়ীতে, ব্রহ্মপুত্র তীরে, একখানি দরমার ঘরে, গোপাল, শরৎ, শ্রীশ, বিনয়কুমার সকলে বসিয়া আছেন। সকলেই বিষণ্ণ, নীরব, ক্লান্ত; গোপালের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত। শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "গোপাল দাদা, কাঁদচ কেন, দিদিকে কি পাওয়া যাবে না?" গোপালের অশ্রুধারা আরও প্রবল হইল। শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "পাওয়া যাবে রে, ভাবনা কি? গোপাল, তুমি এত কাঁদিতেছ কেন হে, কাঁদিলে কি কায হবে, চুপ কর।" গোপাল কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "আর কায, সর্ব্বনাশ যা হবার তা হইয়াছে, কোথায় বা তাহাকে খুঁজিয়া পাবেন, আর খুঁজিয়া পাইলেই বা কি, এ ত বালক শরৎ নয়, ব্রাহ্মণের ঘরের কন্যা, আর কি তার ইজ্জৎ রহিল বলুন, খুঁজিয়া পাইলেও সেই বা কি করিয়া মুখ দেখাইবে, আমরাই বা কি করিয়া মুখ দেখাইব?" বিনয়কুমার একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ওসকল ভাবনা এখন রাখ, যাহাতে তাহাকে পাওয়া যায় সে চেষ্টা যত দূর সাধ্য করা যাউক, মুখ দেখানর ভাবনা পরের কথা।" এই বলিয়া বিনয়কুমার শ্রীশচন্দ্রকে লইয়া নদী-তীরে যাইয়া বসিলেন। ব্রহ্মপুত্র বিশাল বক্ষে অসংখ্য বাণিজ্যপোত ধারণ করিয়া প্রশান্ত ভাবে প্রবাহিত। তীরবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ অনুচ্চ ভূধর-শ্রেণী তাহার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। উভয় বন্ধুতেই তীরে আসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। বিনয়কুমারের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত

হইল। শ্রীশ বলিলেন, "কি, তুমি যে গোপালকে কাঁদিতে মানা করিয়া নিজে কাঁদিতে বসিলে?" বিনয়কুমার উত্তর করিলেন, "কি বল হে, না কাঁদিয়া কি থাকা যায়, কতদুর অত্যাচার হইয়াছে বল দেখি? আর, ঐ অত্যাচার হইয়াছে আমার নামের ছল লইয়া। সকল কথা ভাব্‌লে আমার মন যেন উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠে, আর সেই পিশাচ যোগেন্দ্রটাকে যেন টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে ইচ্ছা হয়।"

শ্রী। অত্যাচার যে অতি ভয়ানক তাহার আর কথা আছে, উঃ! কল্পনাতীত! আর গোপালের মনে যে ভাবনার উদয় হইয়াছে, তাহারও বিশেষ কারণ আছে। হিন্দু সমাজ, সে বালিকাকে ফিরিয়া পাইলেও তাহার সমাজে থাকা ভার হইবে, তাহার সমস্ত জীবনের উপরই যেন একটা কালিমা পড়িয়া গেল।

বি। শ্রীশ, আমি সেজন্য চিন্তিত নই। যখন সে আমার নামে বিপদে পড়িয়াছে, সমাজ, তাহাকে ত্যাগ করিলেও আমি সর্ব্বস্ব দিয়াও তাহার উপকার করিব। আর দেখ, আমি সে বালিকাটিকে একবার মাত্র দেখিয়াছি, কিন্তু এমন একটি দেবভাব তাহার আকৃতিতে লক্ষ্য করিয়াছি যাহাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, সে বালিকা যেরূপ অবস্থাতেই পতিত হউক, আপনার চরিত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। অতএব তাহাকে পাইলে কি হইবে সে চিন্তা রাখিয়া কিরূপে তাহাকে পাওয়া যায় তাহার উপায় চিন্তা কর। খরচ পত্র যাহা হইয়াছে তা হইয়াছে, আর যত আবশ্যক আমি সমস্ত করিতে রাজি আছি।

এইরূপ দুই বন্ধুতে কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক তাঁহাদের নিকটে আসিয়া বসিলেন। বোধ হইল তিনি একজন স্থানীয় লোক। কিছুক্ষণ বসিয়া তিনি শ্রীশচন্দ্র ও বিনয়কুমারকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এখানে কি কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছেন?" বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্র তাঁহার পরিচয় লইয়া বলিলেন, "আমরা এখানে

বড় বিপদে পড়িয়াই আসিয়াছি, একটি স্ত্রীলোককে এখানে একজন জুয়াচোর প্রতারণা করিয়া আনিয়াছে, আমরা দুই দিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিতেছি কিন্তু কোন ঠিকানাই করিতে পারি নাই। আপনি স্থানীয় লোক, আপনি কি কোনরূপ সংবাদ দিতে পারেন বা কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারেন?" ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন, "মহাশয়, এরূপ অভিযোগ এখানে হামেশা শুনা যায়। কুলির আড়কাটিদের দৌরাত্ম্যে যে কত না অত্যাচার হয়! এই দিন কয়েক হইল শুনিয়াছিলাম যে একটা লোক একটি ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক আনিয়া এক মুদির দোকানে রাখিয়াছে; এবং তাহাকে খরিদ করিয়া লইবার জন্য দালাল আনাগোনা করিতেছে।" বিনয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ স্ত্রীলোকটি বলিতে পারেন?" ভদ্রলোকটি উত্তর করিল, "না মশায়, তা বলিতে পারি না।"

শ্রী। কোথায় তাহাকে রাখিয়াছিল আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিতে পারেন?

ভ। তা পারি, এখান হইতে সে স্থান আধ ক্রোশেরও কিছু উপর হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর শ্রীশ, বিনয় ও ভদ্র লোকটী সেই স্থানের উদ্দেশে গমন করিলেন। গোপাল ও শরৎ যে গৃহে বাসা লইয়াছিল সেইখানেই রহিল; ভদ্র লোকটী উদ্দেশ্য স্থানে পঁহুছিয়া যে মুদির গৃহে স্ত্রীলোকের থাকার কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র মুদিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কিছুতেই স্বীকার করিল না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, এবং কিছু টাকা কবুল করায়, এবং তাহার কোনরূপ আশঙ্কা নাই এরূপ সাহস দেওয়ায়, শেষে সে স্বীকার করিল যে "হাঁ একটী স্ত্রীলোক আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ঘরে থাকে নাই, পার্শ্বের একটী ঘরে ছিল, সে ঘর কাহার

তা সে জানে না।” স্ত্রীলোকটীর বর্ণনা যেরূপ করিল, তাহাতে সুকুমারী হওয়া খুব সম্ভব। কখন্ স্ত্রীলোকটী সেখান হইতে গিয়াছে জিজ্ঞাসা করায় মুদি বলিল “এইত মশায়, আজ সকালে শ্যামাডেরার চা-বাগানের একজন সর্দ্দার আসিয়া লইয়া গিয়াছে, যে লোকটী মেয়েমানুষটীকে আনিয়াছিল, সে শুদ্ধ সঙ্গে গিয়াছে, এখনও দর দাম চোকে নাই। বোধ হয় আজ তাকে কালিগঞ্জের কুঠিতে রাখিবে।”

শ্রী। কালিগঞ্জ এখান হইতে কতদূর হবে?

মুদি। অধিক দূর নয়, প্রায় দেড় ক্রোশ হবে, ঠিক ত্রিস্রোতার উপরেই।

বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্র একখানি পান্সী ভাড়া করিয়া তৎক্ষণাৎ কালিগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হইলেন। ত্রিস্রোতা ব্রহ্মপুত্রের একটী ক্ষুদ্র শাখা, এখন নির্ম্মল জলস্রোতে দুই কূল পূর্ণ করিয়া তর তর করিয়া প্রবাহিতা। দুই তীরে বিস্তীর্ণ হরিৎ ক্ষেত্র; তাহাতে পাট, শণ, ধান প্রভৃতি ফসল উচ্চ হইয়া নৌকা-যাত্রীদিগের দৃষ্টি রোধ করিতেছে। তাহার মধ্যে মধ্যে এক একখানি নিবিড় শ্যামল বংশরাজিবেষ্টিত কৃষকপল্লী। ত্রিস্রোতা-বক্ষে অসংখ্য প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা পাল তুলিয়া হেলিতে দুলিতে নানা কার্য্যে ছুটিতেছে, মাঝে মাঝে এক একখানি বৃহৎ মহাজনি নৌকা, ছোট হংসের মধ্যে রাজহংসের ন্যায়, পাল উচ্চ করিয়া ধীর-গমনে চলিতেছে। কুলি মজুরগণ দৈনিক কার্য্য সমাপনান্তে এক একখানি ডিঙ্গির দুই কিনারায় সারিবদ্ধ হইয়া বসিয়া সমস্বরে মহোল্লাসে তালে তালে নদীবক্ষে দাঁড় নিক্ষেপ করিতে করিতে, মনসার ভাসান বা শ্রীরাধিকার-কালাবিরহ গীতি গাহিতে গাহিতে স্রোতের অনুকূল দিকে তীরবেগে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। কূলে যে সকল কুলি স্রোতের বিপরীতে ভারি ভারি নৌকা গুণ টানিয়া অতি কষ্টে এক এক পদ অগ্রসর হইতেছে, তাহারা ইহাদিগকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে এক এক বার দেখিতেছে।

কিন্তু এ ঈর্ষায় ধৈর্য্য হারাইলে সমূহ ক্ষতি। বোঝা টানিয়া স্রোতের প্রতিকূলে গমন করিতে হইলে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ধীরে ধীরে যাইতে হইবে, স্রোতের অনুকূলস্থ ব্যক্তির উল্লাস ও দ্রুতগতি দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিলে, কেবল মনোকষ্ট ও আপন গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে অধিকতর বিলম্ব মাত্র লাভ হয়। তাই ভাবিয়াই যেন এই সকল কুলি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া আবার আপন পথে চলিতেছে। শ্রীশ ও বিনয়কুমার এই সকল দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কালিগঞ্জের কুঠির নিকটবর্ত্তী হইলেন।

ত্রিস্রোতার তীরে, এক শ্যামল সুপরিচ্ছন্ন পুষ্পোদ্যানশোভিত ক্ষেত্রে কালিগঞ্জের কুঠি অবস্থিত; ইহার এক ধারে আনদীতট-বিস্তৃত একটী প্রশস্ত [illegible]ধান ঘাট; তাহার দুই পার্শ্বে বিবিধ গঠনের টবে, বিবিধ বর্ণের পত্র ও পুষ্পবৃক্ষ সারিবদ্ধ ভাবে, স্তবকে স্তবকে সজ্জিত হইয়া ঘাটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সেই বিচিত্র পত্র পুষ্প রাশির মধ্যে, জল সন্নিকটে, ঘাটের একটী সোপানে, একটী বালিকা উপবিষ্টা। তাঁহার চরণতল ধৌত করিয়া নদীজল প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে; তাঁহার নয়নদ্বয় নিমীলিত, সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল, নিস্পন্দ; বদন বিশুষ্ক, কিন্তু প্রভান্বিত। শ্রীশচন্দ্র ও বিনয়কুমার এই ঘাটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই চমকিত হইয়া উঠিলেন। বিনয়কুমার যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রবলভাবাবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; ভাবিতে লাগিলেন, "একি! এ যে সেই বালিকাই দেখিতেছি! না, সে বালিকা নয়, এ যে পুত্তলিকাবৎ নিশ্চল; একি প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি, ঘাটের শোভাবর্দ্ধনের জন্য এখানে স্থাপিত হইয়াছে? না, তা নয়; প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তির মুখে এ স্বর্গীয় প্রভা কোথা হইতে আসিবে? এ সেই বালিকাই বটে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিনয়কুমার নৌকা তীরে লাগাইতে বলিলেন। ঠিক ঘাটে আসিয়া সেই বালিকার নিকট নৌকা

বাঁধিতে যেন সম্ভ্রম বোধ হইল। সেই জন্য ঘাট হইতে কিছু দুরে নৌকা বাঁধিতে বলিলেন। তাঁহাদের নৌকাও তীরে আসিল, আর একজন পাকড়ি-বাঁধা চাপকান-গায়ে সর্দ্দার ঘাটে আসিয়া সেই বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আর এখানে কেন, চল কুঠিতে চল।" এই কথা শুনিবামাত্র বালিকা একবারে এক বুক জলে যাইয়া দাঁড়াইল। চাপরাশি "কর কি কর কি" বলিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। বালিকা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "দেখ্ আমাকে স্পর্শ করিতে আসিবি কি এখনই আমি এই নদীবক্ষে ঝাঁপ দিব।" এদিকে নৌকা হইতে বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্র "খবরদার খবরদার" বলিতে বলিতে নৌকা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয়-কুমারের দুইজন ভোজপুরী পিয়াদাও তাঁহাদের সঙ্গে ঘাটে আসিল। চাপরাশি একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইল। গোলমাল শুনিয়া কুঠির দিক হইতে একটী লোক ছুটিয়া আসিল। চাপরাশি তাহাকে বলিল, "কি মহাশয়, কি মেয়ে মানুষ এনে দিলে, এ যে সঙ্গে সঙ্গে ফেঁসাদ।" লোকটি উত্তর করিল "কি রে বাবু তুই সাহেবের সর্দ্দার, দুটো লোক দেখে ভয় খেলি, এরা ডাকাত, মেয়েটাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া পলাইবার চেষ্টায় আছে। এ দিগে গ্রেপ্তার করিয়া সাহেবের কাছে লইয়া চল। বিনয়কুমার বিশাল নয়নে অগ্নিবর্ষণ করিয়া লোকটিকে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুই?" লোকটি সগর্ব্বে উত্তর করিল আমি যোগেন্দ্র বিশ্বাস, তোমার মুখ রাঙ্গানিতে ভয় খাই না।" যোগেন্দ্রের ভরসা ছিল সাহেবের কুঠিতে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু বিনয়-কুমার যোগেন্দ্রের উত্তর পাইবামাত্র তাহাকে সিংহের বিক্রমে আক্রমণ করিলেন, তাঁহার কেশ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া মস্তক অবনত করিয়া পৃষ্ঠদেশে কয়েকটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত প্রদান করিলেন; তাহার পর দুই গণ্ডদেশে কয়েকটি তীব্র চপেটাঘাত করিলেন; যোগেন্দ্রের মুখ দিয়া রক্ত বাহির

হইয়া গেল ; অবশেষে তাহাকে এক পদাঘাতে বহুদূরে নিক্ষেপ করিলেন। কুঠি মেরামত করিবার জন্য নিকটে একটি চুণসুরকীর চৌবাচ্চা ছিল, যোগেন্দ্র রুধিরাক্ত মুখে অচৈতন্য হইয়া সেই চৌবাচ্চায় পতিত হইল। এমন সময়ে কুঠির লোহিতমূর্ত্তি ছোট সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। চাপরাশি "হুজুর সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ডাকাতরা কুঠিতে আসিয়া খুন করিয়াছে" এই বলিয়া সাহেবের অশ্বের পার্শ্বে যোড়হস্তে দাঁড়াইল। সাহেব ধীরভাবে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া চাপরাশির মুখে সকল কথা শুনিল, বিনয়কুমারের দিকে তাকাইল, সলিলস্থা বালা সুকুমারীর দিকেও দুই এক বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, এবং অবশেষে যোগেন্দ্রকে দেখাইয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ডেখ এই আডমি টোমার কেহ হয়।" অদৃষ্টের উপর একান্ত নির্ভরশালা সুকুমারী এই বিপদেও এতক্ষণ প্রশান্ত ভাবে নির্ব্বাক্ হইয়া সলিলমধ্যে দণ্ডায়মানা ছিলেন, সাহেবের জিজ্ঞাসায় ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, "আমার কেহ হয় না, আমার গ্রামের লোক।" বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্রকে দেখাইয়া সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ইহারা টোমার কেহ হয়?" সুকুমারী উত্তর করিলেন?" "না।" সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "ইহারা টোমার গ্রামের লোক?" সুকুমারী বলিল "না।" সাহেব তখন বিনয়কুমারের দিকে তাকাইয়া বলিল, "টবে তোমাদের কি হক্ আছে আমার কুঠিতে আসিয়া এরূপ জবরদস্তী করিতে?" বিনয়কুমার তখন সাহেবকে দৃঢ়স্বরে আমুল সকল কথা বর্ণনা করিলেন। শুনিতে শুনিতে সাহেবেরও যেন ক্রোধের উদয় হইল এবং সাহেব একবার যোগেন্দ্রের দিকে তাকাইল। যোগেন্দ্র তখন চৈতন্যলাভ করিয়া, সুরকীমাখা দেহে দাঁড়াইয়া সাহেবের স্বপক্ষতার প্রতীক্ষায় যোড়হস্তে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার এ মূর্ত্তি দেখিয়া সাহেবের মনেও তীব্র ঘৃণার উদয় হইল। সাহেব তখন সলিলমধ্যে দণ্ডায়মানা সুকুমারীর দিকে

পুনরায় দৃষ্টিপাত করিল; সে পবিত্র রূপরাশি যে কখন পাশব ভাবে উপভোগ্য হইতে পারে এ আশা সুদূরপরাহত বোধ হইল। বালিকার প্রতি অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া সাহেবের মনে একটু সহানুভূতিরও উদয় হইল। সাহেব একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুরুটের পাঁশ ঝাড়িতে ঝাড়িতে অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; এবং তাহার পর চুরুটটি মুখে দিয়া বিনয়কুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবু টোমরা এ ঔরত লইয়া এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও।" যোগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "টুমি শালা বড় পাজি আছে, টুমকো লাথি মারনা বড়া আচ্ছা কাম্।" এই বলিয়া সাহেব যোগেন্দ্রকে একটি সজোরে পদাঘাত করিয়া কুঠির দিকে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্র পুনরায় সেই সুরকীর চৌবাচ্চায় পতিত হইল। বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্র ঘাটে নৌকা আনিয়া সুকুমা-রীকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সুকুমারী কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নৌকারোহণ করিলেন। যোগেন্দ্র ইত্যবসরে চৌবাচ্চা হইতে উঠিয়া সকলের অলক্ষ্যে নিকটস্থ এক পাটের ক্ষেতে যাইয়া লুকাইল।• নৌকা ছাড়িলে পর শ্রীশ ও বিনয়কুমারের মনে হইল যে যোগেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তখন আর তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না।

বিনয়কুমারের হৃদয় এরূপ আবেগপূর্ণ ছিল যে, নৌকায় তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। সুকুমারী ত ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবধি এক প্রকার মৌনাবলম্বন করিয়াই আছেন, বিশেষ করিয়া কেহ কিছু আবশ্যকীয় কথা জিজ্ঞাসা না করিলে তিনি কিছুই বলেন না। উপর্য্যুপরি বিপদের তরঙ্গাঘাতে, ঘন ঘন অভাবনীয় অবস্থা পরিবর্ত্তনে, তাঁহার মন বিশৃঙ্খল, হৃদয় শুষ্ক, ভবিষ্যদাশা নির্ম্মূলিত হইয়াছিল, কিসে কি হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না, বোধ হইতেছিল যেন এক শৃঙ্খলাহীন স্বপ্নময় স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। শ্রীশচন্দ্র

কি কথা বলিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

যথা সময়ে নৌকা ধুবড়ীতে আসিয়া পঁহুছিল। শ্রীশ ও বিনয়কুমার নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সুকুমারীকে অবতরণ করিতে বলিলেন। সুকুমারী অবতরণ করিয়া নীরবে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে ঘরে গোপাল ছিলেন তাহার নিকটে গিয়া শ্রীশ গোপালকে আহ্বান করিলেন। গোপাল শরৎকে কোলে লইয়া ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিলেন এবং সুকুমারীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে ধূলায় লুণ্ঠিত হইলেন। বালক শরৎ "দিদি গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছুটিয়া যাইয়া সুকুমারীকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিল। সুকুমারী চকিতা হরিণীর ন্যায় নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে একটু দাঁড়াইয়া জ্ঞান হারাইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। বিনয়কুমার ক্ষিপ্রতার সহিত বাহু-প্রসারণ করায় সুকুমারীকে কোন আঘাত লাগিল না। গোপাল আসিয়া তখন সুকুমারীর মস্তক অঙ্কে লইয়া বসিলেন। শ্রীশচন্দ্র জল আনিলেন; বিনয়কুমার বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর সুকুমারী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, এবং চক্ষু মেলিয়া সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিলেন এবং আস্তে আস্তে বলিলেন, "একি স্বপ্ন? আমি জাগ্রত না নিদ্রিত?" গোপাল বলিল "না দিদি, স্বপ্ন নয়, সত্য, আমি সত্যই বাঁচিয়া আছি, যোগেন্দ্র যে তোমাকে আমার মৃত্যুর কথা বলিয়াছিল, তাহ মিথ্যা প্রতারণা। উঠ দিদি, তুমি শরৎকে কোলে লও, শরৎ কাঁদিতেছে।" সুকুমারী পুনর্ব্বার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং শরৎকে কোলে টানিয়া লইয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিলেন। গোপাল ইত্যব-সরে সুকুমারীর সহিত ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সকল কথা বলিতে লাগিলেন, সুকুমারীও নিজের অভিজ্ঞাত ঘটনা সকল

পরের পর বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলেন। বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ও শরতের জন্য কত কষ্টস্বীকার ও কত অর্থব্যয় করিয়াছেন গোপোলের প্রমুখাৎ তাহা শুনিয়া সুকুমারী কৃতজ্ঞতার অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে যাইয়া প্রণতা হইলেন। বিনয়কুমার তদধিক অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন "আপনি আমার নিকট প্রণত হইতেছেন কি, আমি আপনার নিকট নিতান্ত অপরাধী, আমার নাম লইয়াই যোগেন্দ্র আপনাকে এরূপ ঘোরতর অবস্থায় পাতিত করিয়াছে, আমি জীবন দিয়াও আপনাকে উদ্ধার করিলে কিছু অধিক কায হইত না।"

এইরূপে সকলেই আপন আপন কথা খুলিয়া বলিতে লাগিল এবং যোগেন্দ্রকে একবাক্যে অভিশপ্ত করিল। স্থির হইল দেশে ফিরিয়াই যোগেন্দ্রের নামে মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হইবে. পরদিনই বাড়ী রওনা হইবার পরামর্শ হইল।

তৃতীয় খণ্ড।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহে প্রত্যাগমন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। আকাশে চাঁদ আছে, কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে ঢাকা। এই আধা আলো, আধা অন্ধকার রাত্রিতে, ভাগীরথী-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে দুই খানি ক্ষুদ্র তরী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। প্রতি নৌকায় দুইটী করিয়া মাল্লা দুইটী মনুষ্যদেহধারী কলের ন্যায় সমভাবে দেহান্দোলন করিতে করিতে সমবিরামে দাঁড় নিক্ষেপ করিয়া বাহিয়া যাইতেছে। সেই দাঁড় নিক্ষেপ ধ্বনি ভিন্ন আর কোন প্রকার শব্দ নদীবক্ষে শ্রুত হইতেছে না।

একখানি নৌকার ছাদের উপর বিনয়কুমার উপবিষ্ট। তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র নৌকার ভিতরে নিদ্রিত। অপর নৌকায় গোপালচন্দ্র, সুকুমারী ও শরৎ। সকলেই নিদ্রিত, বিনয়কুমার কেবল জাগ্রত। এই নিশীথ সময়ে নদীবক্ষের অতীব গম্ভীর ভাব; বিনয়কুমারের হৃদয়েরও তদ্রূপ। আকাশের দুই বিপরীত প্রান্তে দুইখানি কাল মেঘের অন্তরাল হইতে বিদ্যুল্লতা থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে, যেন দুই স্বর্গীয় অপ্সরা ঈর্ষান্বিত হইয়া পরস্পরকে রূপগরিমায় জয় করিবার জন্য মেঘান্তরাল হইতে বার বার আপন আপন রূপের ছটা প্রকটিত করিতেছে। বিনয়কুমারের প্রবলভাবধূমাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশেও এইরূপ থাকিয়া থাকিয়া যেন তড়িৎ প্রকাশ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মেঘগর্জ্জনও শুনা যাইতেছে এবং শান্তির মধ্যে যেন অদূরাগত বজ্রনির্ঘোষনিনাদিত দুর্দ্দিনের আশঙ্কা জাগরিত করিয়া দিতেছে।

রাত্রি যে কিরূপে কাটিয়া গেল বিনয়কুমার কিছু বুঝিতে পারিলেন না ; দেখিতে দেখিতে চারি দিকে উষালক্ষণ প্রকাশিত হইল। নৌকা দুইখানি একটী ঘাটে আসিয়া লাগিল। ঘাটে আরও কয়েকখানি নৌকা ছিল। তীরে একটী দোকানও ছিল। গোপাল নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সুকুমারী ও শরৎকে সেই দোকানের [illegible] লইয়া গেলেন। বিনয়কুমার ও শ্রীশ নৌকা হইতে নামিয়া কোন প্রকার যানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একখানি ছাপ্পরওয়ালা গরুর গাড়ী পাইলেন। এই গাড়ীখানি ভাড়া করিয়া গোপাল সুকুমারী ও শরৎকে লইয়া গৃহে যাইবে এবং বিনয়কুমার ও শ্রীশ কালনা যাইবেন, এইরূপ প্রস্তাব হইল। কালনা এখান হইতে নিকটেই। সুকুমারীদের গ্রাম রামনগরও অধিক দূর নয়। গোপাল সহস্রবার বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলেন এবং বাড়ী পঁহুছিয়াই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ব[illegible]। সুকুমারী গভীর কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিলেন। শরৎ গ্রামে ফিরিয়া যাইবে এই সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সহচরগণের উৎফুল্ল মুখ, খেলিবার স্থান, গ্রামের পথ, ঘাট, মাঠ, গাছ, নদী, পুষ্করিণী সমস্ত দলে বলে তাহার কল্পনায় প্রতিফলিত হইতে লাগিল, এবং সে চঞ্চল হইয়া মধ্যে মধ্যে গাড়ীর অগ্রে অগ্রে ছুটিতে লাগিল।

শ্রীশ ও বিনয়কুমার কালনা অভিমুখে চলিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যোগেন্দ্রের উপর মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য উকীল মোক্তারের নিকট পরামর্শ লওয়া। শ্রীশচন্দ্র বিনয়কুমারকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিনয়কুমার অন্যমনস্কভাবে, বিলম্বে উত্তর দেন। শ্রীশচন্দ্রের মনে একটু খট্‌কা লাগিল, কিন্তু খুলিয়া বিনয়-কুমারকে কিছু বলিলেন না। আজ প্রাতঃকাল হইতে চারিদিক নিবিড়

কুয়াসায় আচ্ছন্ন। সুকুমারীর গাড়ী চলিয়া যাওয়া অবধি সেই কুয়াসা যেন নিবিড়তর হইয়া বিনয়কুমারের চিত্ত আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। তিনি কর্ত্তব্যের ভার সমস্ত শ্রীশচন্দ্রের উপরই অর্পণ করিলেন।

শীঘ্রই গোপালচন্দ্রকে দিয়া মোকর্দ্দমা দায়ের করা হইবে এইরূপ স্থির করিয়া কালনা হইতে উভয়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরিলেন। কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে, গোপালের বিলম্ব দেখিয়া বিনয়কুমার তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইবার মানস করিলেন, পরে স্থির করিলেন নিজেই গোপালদের বাড়ী যাইবেন। কিন্তু গোপালদের গ্রামসন্নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদের বাড়ী যাইতে এবার তাঁহার পদ অগ্রসর হইল না। তিনি বরাবর শ্রীশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গোপালকে তথায় আনাইয়া সকলে একত্রে কালনায় আসিয়া যোগেন্দ্রের নামে মোকর্দ্দমা রুজু করিলেন। যোগেন্দ্র কিন্তু ফেরার। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। তাহার পর পাঁচ ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু যোগেন্দ্রের কোন সন্ধানই মিলিল না।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমাগ্নি-প্রজ্বলন।

ইতিমধ্যে বিনয়কুমারের অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহার যে পূর্ণ মনোবিকার উপস্থিত, তাহা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার সেই সদাপ্রসন্ন মুখকান্তি মলিন হইল, উদ্দাম উৎফুল্লতা তিরোহিত হইল, উদ্বেগহীন উৎসাহ, একাগ্র কার্য্যতৎপরতা, সহৃদয় আলাপপ্রিয়তা, নির্লিপ্ত মধুর হাস্য, সকলই যেন বিলুপ্ত হইল। তিনি কেবল নির্জ্জনে নিরালয়ে বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকেন বা ভ্রমণ করেন। সকলেই এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; এবং ক্রমে এ পরিবর্ত্তনের কারণও সকলে অনুমান করিতে লাগিল। বিনয়কুমারের [illegible] অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন নাই। বিনয়কুমারও এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটিয়া আপনার হৃদয়ের ভাব কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আর থাকিতে পারেন না; হৃদয়ের আবেগ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিবার প্রয়াসে শেষে হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। একদিন সন্ধ্যাকালে, তাঁহার সেই শৈশব হৃদয়ের গভীর ভাবোদ্দীপক উন্নতশীর্ষতালবৃক্ষশোভিত দীর্ঘিকা-ঘাটে বসিয়া ভাবিতে [illegible]তে তিনি স্থির করিলেন যে তরঙ্গ তুফানময় বন্যাস্রোত তাঁহার অন্তরে উথলিয়া উঠিতেছে, তাহাকে আর ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিবেন না। তাহার দ্বার খুলিয়া দিবেন এবং সে জন্য যদি তাঁহাকে সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হয়, তাহাতেও তিনি প্রস্তুত হইবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি বাড়ী আসিলেন এবং কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিলেন :—

ভাই শ্রীশ,

তোমার নিকট একটা কথা এত দিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। ভাবিতাম মনের ভাব মনেই বিলীন করিব। কিন্তু দেখিলাম তাহা সম্ভব নয়। এ ভাব জলের বিম্ব নয়; এ যে দেখিতেছি আগ্নেয় গিরির আভ্যন্তরীণ উত্তাপের ন্যায় আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বুঝি বা এই তাপেই আমার হৃদয় মন, আশা উদ্যম সকলই ছিন্ন ভিন্ন ভস্মীভূত হয়।

কালিগঞ্জের সাহেবের বাঙ্গলার নীচে, ত্রিস্রোতার ঘাটে, সেই যে মূর্ত্তি দেখিলাম, সেই বিচিত্র পুষ্পবৃক্ষরাশির মধ্যে আসীনা, স্রোতবিধৌত-চরণা, ধ্যানমগ্না মূর্ত্তি, তাহা আর ভুলিতে পারিতেছি না। সে মূর্ত্তি আমার চিত্তপটে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সে কি মানবী মূর্ত্তি না দেবী মূর্ত্তি! অহো, সে বদনমণ্ডলের কি স্বর্গীয় পবিত্র জ্যোতিঃ! আবার পাপের প্রতি তাহার কি তীব্র কটাক্ষ! যখন সে মূর্ত্তি আকণ্ঠ জলে ঝাঁপ দিয়া স্পর্শনোদ্যত পিশাচের দিকে ভ্রূকুটী করিয়া চাহিল, তখন মনে হইল যেন সমূর্ত্ত পুণ্য পাপের প্রতি রোষানল বর্ষণ করিতে করিতে আপনি তাহা হইতে দূরবর্ত্তী হইতেছে। শ্রীশ, মনে করিও না আমি হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিতে চেষ্টা করি নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারিলাম না। দেখিতেছি সেই দেবী মূর্ত্তির আমাকে চির উপাসক হইতে হইবে। কিন্তু সন্দেহ, আমার উপাসনা কি গ্রাহ্য হইবে? এই সন্দেহে আমার হৃদয় অতীব অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তুমি শারীরিক কেমন আছ? পার যদি শীঘ্র আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবে।

তোমার বিনয়।

শ্রীশচন্দ্র বিনয়কুমারের পত্র পাইয়া চিন্তিত হইলেন, কিন্তু বাহ্যতঃ

একবার হাসিয়া বলিলেন, যাহা মনে মনে ঠাহরিয়াছিলাম তাহা ত ঠিক। কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনয়কুমারের পত্রের উত্তর দিলেন :—

ভায়া বিনয়,

বলি বড় যে ফিলজফার হইয়া সকলকে উপদেশ দিতে। গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে। সেই কালেই ত বলেছিলাম, ভায়া, বিবাহটা কর। তুফানে পড়িবার আগেই নঙ্গর ফেলিবার ব্যবস্থাটা করিলে কি আর বিপদে পড়িতে হয়?

বিনয়, তোমাকে আমি জানি। ভাষা কথায়, হাসি তামাসায়, তোমার সহিত কোন ফল হইবে না। একটু তর্ক করিতে হইবে। তাও ত অনেক বার করিয়াছি; কিন্তু আবার তাহাই করিতে হইবে। তোমার মনোবিকার যে আমি বুঝিতে পারি নাই এমন নহে। বুঝিতে সবই পারি। সুকুমারীকে পাওয়ার পর হইতেই তোমাকে আর এক বার মাত্র কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব পাওয়া যায় নাই। প্রথম বার ত কথা শুনিতেই পাইলে না; দ্বিতীয় বার কেবল "অ্যাঁ" করিলে, তৃতীয় বার জিজ্ঞাসায় তবে উত্তর দিলে। বুঝিয়াও কিন্তু কিছু বলিতে সাহস করি নাই, ভাবিতাম কি জানি তোমরা পণ্ডিত মানুষ, তোমাদের হৃদয়বৃত্তির ক্রিয়া সূক্ষ্ম, বিচিত্র, নিগূঢ়, আমাদের মত মোটামুটি লোকের অবোধগম্য। কিন্তু এখন দেখিতেছি সরু মোটা সবই সমান; যা বুঝেছিলাম তা সত্য। তবে এতটা যে হবে তা ভাবি নাই।

তুমি ত বাল্যবিবাহের বিরোধী। কিন্তু বল দেখি ভাই, বাল্যে বিবাহ হইলে কি আর এ বিপদে পড়িতে? এক বার মন একটু মজবুত বাঁধনে বাঁধা পড়িলে আর ভাসে না। যে মূর্ত্তি দেখিয়া মজিয়াছ, অমন শত মূর্ত্তি দেখিলেও শ্রীশচন্দ্রের মন আর মাতে না। সে যাউক, এখন ত আর বালক নও, এখন কেন বিবাহ কর না? শুনিয়াছি তোমার

পিতা, তোমার বিবাহ দিতে অনেক দিন হইতে উৎসুক আছেন। তবে কেন বিবাহ কর না?

সংসার ব্যাপার চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। কথাটা দেখিতেছি ঠিক। তোমারই কাছে উপদেশ শুনিতাম, আজ আবার আমি উপদেশ দিতেছি তোমাকে! তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক; তুমি কি না ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা কন্যার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া আত্মসংযম হারাইতে বসিয়াছ? ছিঃ!

বিষে বিষক্ষয়। শীঘ্র বিবাহ কর, আর এক মূর্ত্তি আসিয়া এ মূর্ত্তির আসন গ্রহণ করিবে।

তুমি শুনিয়া থাকিবে আমি প্রায় এক মাসেরও উপর হইল গ্রামের কায ছাড়িয়া দিয়া কালনায় একটী কারবারে যোগ দিয়াছি। সেই জন্য আমি তৎপর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। অল্প দিনের মধ্যেই সাক্ষাৎ হইবে। তোমার শ্রীশ।

বিনয়কুমার শ্রীশচন্দ্রের পত্রখানি একবার মাত্র পাঠ করিয়া একটু বিরক্তির সহিত মুড়িলেন এবং কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া শ্রীশচন্দ্রকে আর একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার সারাংশ এই:—

বিজ্ঞবর শ্রীশ,

* * * * * তোমার পত্র পাঠে পরিতৃপ্ত হইলাম না, সত্বর একবার দর্শন দিলে বাধিত হইব।

তোমার বিনয়।

শ্রীশচন্দ্র উত্তর দিলেন,

প্রেমিকপ্রবর,

সপ্তাহেক ধৈর্য্য ধর, সাক্ষাৎ হইবে। * * * *

তোমার শ্রীশ।

এই পত্র লেখালেখির কয়েকদিন পরেই শ্রীশচন্দ্র বাড়ী আসিলেন। আমাদের বহু দিন পূর্ব্বে একবার মাত্র পরিচিতা শ্রীশচন্দ্রের পত্নী সদা-প্রফুল্লা সরোজবালাকে পাঠকের স্মরণ হইবে ? তিনি মাসাধিক কাল অনভ্যস্তপূর্ব্ব বিরহযন্ত্রণায় অতীব কাতরা ছিলেন, আজ মহোল্লাসিতা ; আনন্দে চরণ টলটল ; নয়ন চঞ্চল ; অধরে হাসি ঢাকিতে পারিতেছেন না বলিয়া অবগুণ্ঠন দীর্ঘ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ আনন্দ বড় ক্ষণ-স্থায়ী হইল। শ্রীশচন্দ্র এক রাত্রি মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া বিনয়কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। প্রাতঃকালে সরোজ-বালা গৃহপ্রাঙ্গণ সম্মার্জ্জনে নিযুক্তা, কিন্তু নয়ন অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে কেবল শ্রীশচন্দ্রেরই অনুসরণ করিতেছে। গৃহমধ্যে শ্রীশচন্দ্রকে স্থানা-ন্তরগমনোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখিয়া সরোজবালা সম্মা-র্জ্জনীহস্তেই গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সহাস্য মুখে মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজই আবার এ বেশ কেন ? কোথাও যেতে হবে নাকি ?" শ্রীশচন্দ্র একটু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন "সংবাদ আসিয়াছে একটা দরকারী কাজে আজই আমাকে কালনা ফিরিয়া যাইতে হবে।" সরোজবালার প্রফুল্ল মুখ যেন সহসা মেঘে ঢাকা পড়িল ; বলিলেন, "না, তা কেন হবে, তামাসা করিতেছ।" শ্রীশচন্দ্র সরোজ-বালার বিষণ্ণতা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "কালনা যাওয়ার কথাটা তামাসা বটে, কিন্তু এক জায়গায় যেতে হবে।" এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ও বিনয়কুমারের মধ্যে যে পত্র লেখালেখি হইয়াছিল তাহা সমস্ত সরোজ-বালার হাতে দিলেন। সরোজ পড়িয়া বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপারটা কি, ভাল বুঝিলাম না, মুখে খুলিয়া বল।" শ্রীশচন্দ্র তখন সকল কথা বলিলেন।

সরোজবালা শুনিয়া বলিলেন, "হা কপাল! দুই বন্ধুতে মিলে মেয়ে-টিকে উদ্ধার করে শেষে বুঝি এই, 'তুফানে ভাসাভাসি'!" শ্রীশচন্দ্র

বলিলেন, "দুই জনকেই জড়াও কেন, যে ভেসেচে তারই কথা বল।"

স। একজন যখন ভেসেছে, আর একজনের ভাসিতেই বা বাধা কি? স্রোত কিছু প্রখর দেখিতেছি। যে ভেসেছে তাহার উদ্ধার করিতে যাইয়া তুমিও বুঝি বা ভাস।

শ্রী। যদি ভাসি, তাতেই বা ভাবনা কি, স্রোত কমিলে যখন তীরে লাগিব, তোমার হাতের যন্ত্রটা দিয়া অঙ্গের ময়লা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া ঘরে তুলিয়া লইবে।

সরোজবালা হস্তস্থিত সম্মার্জ্জনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সলজ্জভাবে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে আলনার উপর হইতে একখানি নিজের বস্ত্র ও একখানি শ্রীশচন্দ্রের বস্ত্র লইয়া দৃঢ়গ্রন্থিসম্বদ্ধ করিলেন ও শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "এখন যাও, আর কোন ভয় রাখি না, যে শক্ত বাঁধন দিয়াছি, আর তুফানে ভাসিবে না।"

শ্রীশচন্দ্র অতৃপ্ত লোচনে কিছুক্ষণ সরোজবালার প্রেমবিকসিত সজলনয়নপলাশশোভিত মুখ-কমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন। সমস্ত রাস্তা সরোজবালার প্রেমের গর্ব্বে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিতে লাগিল। বিনয়কুমার যে এ পর্য্যন্ত এরূপ প্রেমের আস্বাদন পায় নাই, এবং পাইলে যে এমন বিপদে পড়িতে হইত না, এই ভাবিয়া তাঁহার দুঃখ হইতে লাগিল। কি বলিয়া তিনি বিনয়কুমারকে বুঝাইবেন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি বিনয়কুমারদের গ্রামাভিমুখে চলিলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়-পত্র।

শ্রীশচন্দ্র বিনয়কুমারের সহিত কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন, তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক যুক্তি দেখাইলেন। কিন্তু সে সকল যুক্তি স্রোতের মুখে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীশচন্দ্র হতাশ হইয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

বিনয়কুমারের মনোভাব নানা দিক হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর বেগশালী হইতে লাগিল। শেষে তিনি স্থির করিলেন কাহারও সহিত আর পরামর্শাদি না করিয়া একবারে সুকুমারীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন। কিন্তু তাহা করিবেন কিরূপে? লোক দ্বারা, না স্বয়ং সুকুমারীর নিকট যাইয়া, না পত্র দ্বারা? অনেক চিন্তার পর শেষ উপায়ই স্থির করিলেন। তখন পত্র লিখিতে বসিলেন। হাতে কলম তুলিতেই কিন্তু তাঁহার হাত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত দেহে যেন উষ্ণ স্বেদপ্রবাহ ছুটিল! কি লিখিবেন, সুকুমারীকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন "প্রিয়তমে সুকুমারি" বলিয়া, "তুমি" বলিয়া, সম্বোধন করেন; কিন্তু যেন তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, চিন্তা করিতে লাগিলেন, এরূপ সম্বোধনে তাঁহার কি অধিকার, ইহাতে যদি সুকুমারী তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন। এইরূপ ভাবিয়া পত্র লেখার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং স্থির করিলেন যে একজন লোকই সুকুমারীর নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু কাহাকে পাঠাইবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তখন আবার ভাবি-লেন নিজেই একবার শ্রীশচন্দ্রের সহিত দেখা করিবার ছলে সুকুমারীদের

বাড়ী যান। এ চিন্তায় মুখ উৎফুল্ল হইল, হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। পুনরায় ভাবিলেন, সুকুমারীদের বাড়ী যাইতে তাঁহার কি অধিকার, এবং যাইলে সুকুমারী যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করেন। এই সকল চিন্তায় তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে আবার স্থির করিলেন যে, প্রথমে পত্র লেখাই সকল অপেক্ষা প্রশস্ত যুক্তি। তখন নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন।

শ্রীমতী সুকুমারী দেবী

সমীপেষু—

আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানি না, হৃদয় যেরূপ সম্বোধন করিতে চায়, প্রাণ যেরূপ সম্বোধনে পরিতৃপ্ত হয়, সেরূপ সম্বোধনে সাহসী হইতে পারি না। আপনি দেবী, যথার্থই সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্না মূর্ত্তিমতী-পুণ্যস্বরূপা স্বর্গীয়া দেবী; আপনার প্রসাদ লাভ বিনা কেমন করিয়া আমি আপনাকে আমার হৃদয়ের ঈপ্সিত ভাবে সম্বোধন করিতে পারি। তবে এখন আমার যেরূপ অবস্থা তাহাতে আপনার নিকট আত্মগোপন করা আর সম্ভব নয়। যে দিন আপনাকে কালিগঞ্জের নদীতীরে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে আপনি আমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, সেইদিন হইতে আমি আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে আপনারই সেই দিব্য মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছি। এখন আমার এই ভিক্ষা যেন এই ধ্যানে অধিকার প্রাপ্ত হই, যেন এই জীবন উপহার দিয়া আপনার তুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ হই।

আপনি হয় ত এই পত্র পাইয়া কত বিরক্ত হইবেন, ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবাকে এরূপ পত্র লেখা নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া আমাকে তিরস্কার করিবেন। অতএব যে কারণে আমি এরূপ কার্য্য করিতে সাহসী হইয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলি। আপনি অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন। দেশাচার বিরুদ্ধ হইলেও আপনার মত বিধবার পুনর্বিবাহ

শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। এরূপ বিবাহ অন্যায় বা অধর্ম্ম নহে। যদি আমি আপনার প্রসাদ লাভে সমর্থ হই, তবে আপনার সহিত এইরূপ শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া কৃতার্থ হই, এবং আমার যাহা কিছু সকলই আপনার পরিতোষসাধনে নিয়োজিত করিয়া জীবন সার্থক করি।

অধিক লিখিতে সাহসী হইলাম না, আমার হৃদয় মধ্যে যে কি তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, তাহা দেখাইতে পারিলাম না। যদি সময় হয় ত দেখাইব।

শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র খানি ডাকে পাঠাইয়া বিনয়কুমার প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যুত্তর প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় অতি উৎকণ্ঠিতভাবে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।
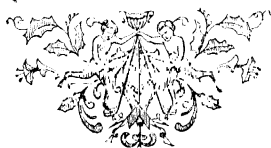
উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়-পত্রের পরিণাম।

ফাল্গুন মাসের দিবা, মধ্যাহ্ণ অতীত হইয়াছে। রামনগর গ্রামে, সুকুমারী আপনাদের বাড়ীর বাহির দরজা বন্ধ করিয়া, বারান্দায়, পরিহিত মলিন বসনখানির অঞ্চল বিছাইয়া, একাকিনী শায়িতা। শরচ্চন্দ্র আহারান্তে খেলাইতে গিয়াছে; বাড়ীটি নিস্তব্ধ, কেবল প্রাঙ্গণের প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষে একটী কাক বিশ্রাম করিতে করিতে নানা প্রকার রঙ্গভঙ্গের সহিত ডাকিতেছে ও আপনার সুমিষ্ট রবে আপনিই মোহিত হইতেছে। দুরের আম্র কানন হইতে দুই একটী কোকিলের ও প্যাপিয়ার রবও মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছে। রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, এবং দক্ষিণা বাতাসও প্রমত্তভাবে কখন পথের ধূলি, কখন বা শুষ্ক বৃক্ষপত্র উড়াইয়া তেজে বহিতেছে। সুকুমারী তাঁহার পশমরাশির ন্যায় কোমল, সুকৃষ্ণ সুন্দর কেশরাশি তাচ্ছিল্যের সহিত রৌদ্রে বিস্তৃত করিয়া শয়িতা আছেন। বায়ুহিল্লোলে তাহা মধ্যে মধ্যে ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। তাঁহার ললাট ও মুখমণ্ডল ঘর্ম্মবিন্দুতে আপ্লুত। উৎপাটিতা, তপনতাপিতা, ধূলিলিপ্তা, সরসী-প্রান্তস্থা সপুষ্প মৃণাললতিকার ন্যায় তিনি পতিতা আছেন। এমন সময়ে একজন লোক বাহিরের দরজায় ধাক্কা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে কে আছ গো?" সুকুমারী তৎপর উঠিয়া যাইয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। ডাক-হরকরা তাঁহার হাতে এক খানি চিঠি দিয়া চলিয়া গেল।

সুকুমারী বড় কোথাও হইতে চিঠি পান না। আজ এই পত্র পাইয়া উৎসুক হইলেন, তাহাতে ইহা আবার অপরিচিত হস্তের লেখা। তিনি

গৃহমধ্যে গিয়া আগ্রহের সহিত পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হৃদয় গুড় গুড় করিয়া উঠিল, তিনি চক্ষু মুদিয়া বসিয়া পড়িলেন। সমস্ত অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল, এবং শ্বাস যেন অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিবার পর, চক্ষু মেলিলেন ; সেই পত্রের উপর আবার দৃষ্টি পড়িল। এখন যেন হৃদয়ে একটু দৃঢ়তা আসিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, আরক্তিম নয়নযুগল হইতে অগ্নি বর্ষণ করিয়া, আপন মনে বলিলেন, "ছিঃ; সংসার এমন; বিনয়কুমার বাবু এমন? এই কি জগতের উপকার করা? বিনয় বাবু কি এই আশাতেই আমার উপকার করিয়াছেন? ধিক্ তাঁহার উপকার করায়! আমি কি তাঁর উপকারের প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, আমি কি মরিতে জানিতাম না? আবার নিজের পাপ ইচ্ছা ঢাকিবার জন্য লিখিয়াছেন কি আমাকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করিবে! বিবাহ! কি আশ্চর্য্য! আমি কি হাড়ি ডোম না চণ্ডাল? আমি ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, আমার বিবাহ? আমার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, ঘর কন্না, সবই হইয়াছিল, অদৃষ্টের দোষে না হয় কিছুই ভোগ করিতে পাই নাই, সবই গিয়াছে। তা ব'লে আমার আবার বিবাহ? কি অসম্ভব কথা! বিনয়কুমার বাবু শুনেছিলাম, জ্ঞানবান্ লোক; কেমন করিয়া তবে এমন অসম্ভব কথা বলিলেন? একি চাতুরীর জাল নয়, প্রলোভনের কুহক নয়? ছিঃ ছিঃ, কি ঘৃণার কথা, কি লজ্জার কথা! যাহাকে দেবতুল্য সদাশয় ভাবিয়াছিলাম, তাহার এই কায?" এই বলিয়া সুকুমারী পত্রখানা হাতে লইয়া ক্রোধত্বরান্বিত-পদে রান্না-ঘরের দিকে গমন করিলেন এবং তাহা সহস্র টুকরা করিয়া চুলার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। পত্র অবিলম্বে ভস্মে পরিণত হইল; সুকুমারীর ক্রোধানলও কিছু যেন শান্ত হইল। তখন তিনি অপর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মেজের উপর শয়ন করত হস্তে মুখ লুকাইয়া

নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন, অশ্রুপ্রবাহে গৃহতল সিক্ত হইল। এই-রূপ কাঁদিতে কাঁদিতে একবার চমকিত ভাবে উঠিয়া বসিলেন এবং বিহ্বল চিত্তে কতক্ষণ কি ভাবিলেন; তাহার পর আপন মনে একটী বাক্স খুলিয়া অনেক জিনিষ-পাতি উট্‌কাইয়া একখানি কাগজ বাহির করিলেন। কাগজ খানি পড়িতে পড়িতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল, হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল, অধর ও নাসিকাগ্রভাগ কম্পিত ও স্ফুরিত হইতে লাগিল; এক একবার সমস্ত অন্ধকার দেখিয়া কাগজখণ্ড হইতে নয়ন উত্তোলন করিয়া অধোবদনে কাঁদিতে লাগি-লেন; অশ্রুধারা নিঃশেষিত হইলে আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সে যে অফুরন্ত প্রস্রবণ; আবার হু হু করিয়া জল আসিল, আবার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঠ শেষ করিয়া সুকুমারী অর্দ্ধোন্মত্তার ন্যায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। গভীর মর্ম্মযাতনার বিকাশ-চিহ্ন তাঁহার মুখমণ্ডলে লক্ষিত হইতে লাগিল। এই ভাবে কিছু-ক্ষণ কাটিলে সেই কাগজখণ্ডখানি বক্ষে ধারণ করিয়া কিছু যেন শান্ত ভাবে হস্তদ্বারা মুখ আবরণ করত মেজের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন।

এই কাগজখানি কি? ইহা সুকুমারীর স্বামীর পত্র, তাঁহার স্বামীর সর্ব্বপ্রথম ও শেষ পত্র। বিবাহের পর সুকুমারী এক মাস কাল শ্বশুরা-লয়ে বাস করেন। বিয়ের ক'নে সচরাচর দশ দিনের অধিক শ্বশুর-বাড়ীতে থাকে না। কিন্তু সুকুমারীর শাশুড়ীর এই এক মাত্র বধূ। বিশেষতঃ বালিকা সুকুমারীর সেই মোমের পুতুলটির মত সুকোমল টুক্‌টুকে ফুটফুটে মূর্ত্তিটি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এত স্নেহার্দ্র হইয়াছিল, যে দশ দিন বাদেই তাহাকে বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে তিনি পারেন নাই; বেয়ানের নিকট অনেক জেদবজেদ করিয়া তাহাকে এক মাস কাল রাখিয়াছিলেন। সুকমারীর স্বামী সুধীন্দ্রনাথ, তখন বিংশতি

বর্ষীয় যুবক, কলেজে পড়েন। সুধীন্দ্রকে পাঁচ বৎসরের লইয়া তাঁহার মাতা বিধবা হন। সংসারে তখন তাঁহার এক রুগ্ন দেবর ভিন্ন আর কেহই থাকে নাই। শিশু সুধীন্দ্রটিকে লইয়া, তাহারই মুখ তাকাইয়া, নানা প্রকার ভবিষ্যতের আশা গড়িতে ভাঙ্গিতে তাঁহার মাতা এত দিন জীবন কাটাইয়াছিলেন। সকল আশার প্রধান আশা "সুধীর বিয়ে দিয়ে বউ লয়ে ঘর করিবেন" আজ ফলবতী। তাঁ[illegible] কি আর আনন্দের সীমা ছিল? তিনি নিজ হাতে সুকুমারী[illegible] খাওয়াইতেন, মাথাইতেন, মাথা বাঁধিয়া দিতেন, মুখ পুঁছাইয়া দিতেন এবং বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া কোলে লইয়া প্রতিবেশীদের বাড়ী বেড়াইতে যাইতেন ও সুকুমারীর কত সুখ্যাতি করিতেন; বলিতেন, "বউটি আমার লক্ষ্মী, সদাই হাসিমুখী, বাপের বাড়ীর জন্য যদি একবার কাঁদাকাটা আছে, আর এরই মধ্যে ঘরের জিনিষপাতিতে যত্ন কত।" সুকুমারীও, তখন একাদশ বর্ষীয়া বালিকা, শাশুড়ীর স্নেহে যত্নে, এতই মুগ্ধা হইয়াছিল যে, সেই কয়দিনের মধ্যে বাস্তবিকই তাঁহাকে আপনার জননীর ন্যায় বিবেচনা করিত। বিবাহের আট দশ দিন পরেই সুধীন্দ্রনাথের ছুটী [illegible]ল এবং তিনি পাঠস্থানে চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বরাত্রে সুকু[illegible] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমার জন্য পূজার ছুটীর সময় কি আ[illegible]?" সুকুমারী অনেকবার জিজ্ঞাসিতা হইলেও কোন উত্তর দেয়[illegible] নিতান্ত জেদের পর বলিয়াছিল "একখানি ভাল কেতাব ও কিছু [illegible]গজ কলম আনিও।" সুধীন্দ্র এবার পাঠস্থানে যাইয়া বড় পাঠে মন দিতে পারেন নাই, অধিক সময়েই অন্যমনস্ক থাকিতেন এবং সহাধ্যায়ীরা প্রায়ই বিদ্রূপ করিয়া বলিত "কি রে রাঙ্গা বউ পেয়ে যে মাথা ঘুরিয়া গেল।" পূজার ছুটীতে সুধীন্দ্র শ্বশুরবাড়ী আসিলেন; সুকুমারীর প্রার্থিত পুস্তক ও কাগজ কলম ত আনিয়াই ছিলেন, অধিকন্তু অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর সখের খেলনা প্রভৃতিও আনিয়াছিলেন। নূতন শ্বশুরবাড়ীর

সকল প্রকার আদর যত্ন ভোগ করিয়া, আট দশ দিন পরে সুধীন্দ্র বিমর্ষমনে স্বগৃহে ফিরিলেন। ইহার কিছু দিন পরে সুধীন্দ্র সুকুমারীকে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি এই ঃ—

প্রিয়তমে সুকুমারি, তোমাদের বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি আমার মন এরূপ উদাস হইয়াছে যে, আর কোন কাযই করিতে পারিতেছি না। মন যেন আর কোথাও নাই কেবল তোমার কাছে, কোন কাযই করিতে চায় না, কেবল চায় তোমার সহিত খেলা করিতে। সেই যে এক দিন, তোমার তুলসীতলার খেলা ঘরে পুতুলের সভা সাজান ছিল, আমি সেটি লুকিয়ে ভাঙ্গিয়া দিই, আর তুমি শরৎ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ভাবিয়া, তাহার উপর রাগ করিয়া ঠোঁঠ ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছিলে, তোমার সেই সময়ের সেই ঠোঁট ফুলান মুখখানি আর ডবডবে চোক্ দুটি মনে পড়িলে আমি সব ভুলিয়া যাই, প্রাণ আকুল হইয়া উঠে তোমাকে দেখিবার জন্য।

তুমি শারীরিক কেমন আছ শীঘ্র লিখিবে। শরৎ কেমন আছে? আমি শারীরিক ভাল আছি। আবার কবে ছুটী হবে, সেই দিন গণিয়াই কেবল দিন কাটাইতেছি। এবার ছুটীতে তোমার জন্য কি লইয়া যাইব লিখিবে। তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী

সুধীন্দ্র।

এই পত্র লেখার অল্প দিন পরেই সুধীন্দ্র হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মাতা তাঁহার শোকে কাতর হইয়া অতি শীঘ্রই মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার দেবর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং সুকুমারীর শ্বশুর-কুল নির্ম্মূল। লক্ষ্মীরূপিণী সুকুমারীর অদৃষ্ট যে এত মন্দ তা কে জানিত?

আজ আমরা সুকুমারীকে যে একখানি কাগজ পড়িতে দেখিলাম

তাহা এই পত্র। আজ ইহার প্রতি অক্ষর অগ্নিময় স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া তীব্র যাতনানলে সুকুমারীর হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারীর চিত্তে এক প্রকার প্রবল অভিমানেরও উদয় হইতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, "আমি ত সকল বিপদ সহ্য করিয়া, মনকে এক প্রকার শান্ত করিয়াছিলাম, কে আমার সে শান্তি ভাঙ্গিয়া দিল, কে আমার নির্ব্বাপিত অগ্নি জ্বালাইয়া দিল, কে আমার দুঃখের নদী আবার প্রবাহিত করিল, কেন সে আমার এমন অনিষ্ট করিতে সাহসী হইল? হে জীবিতনাথ, হে দেব, তুমি ত এখন স্বর্গস্থ, হতভাগিনী আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, এ অপমানের প্রতিকার করিবার জন্য কি কিছু করিবে না? কেন তুমি তবে আমাকে একাকিনী ফেলিয়া চলিয়া গেলে?

সুধীন্দ্র! তুমি বালিকা সুকুমারীর খেলাঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার ঠোঁটফুলান মুখটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলে। আজ তুমি যুবতী সুকুমারীর সংসারের আসল ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া পলাইয়া যাওয়ায়, তাহার তপ্তোচ্ছ্বাসপূর্ণ, স্ফুরিতাধর, আবেগরক্তিম মুখমণ্ডলে যে অপূর্ব্ব অভিমান, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ও অগাধ গাম্ভীর্য্য শোভা পাইতেছে, তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ? যদি পাও, তবে তুমি যেখানে থাক, তোমার আত্মা নিশ্চয়ই ইহাতে স্তম্ভিত ও চিরবিমুগ্ধ হইয়া থাকিবে।

উপর্য্যুক্তরূপ চিন্তার ভারে সুকুমারীর হৃদয় ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিল। তিনি সেই ক্লান্তি বশতঃ মাটিতে শুইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে জীবনকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, কেন তিনি স্বামীর সহমরণ করেন নাই, কেনই বা সে নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আত্মহত্যা করেন নাই, এরূপ জীবন রাখিয়া আর ফল কি? এখনও কি আত্মহত্যা করিলে ভাল হয় না?

ঠিক এই সময়ে প্রাঙ্গণে বালক শরৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি,

দিদি, বড় তেষ্টা পেয়েচে, শিগ্‌গির এক গেলাস জল দাও।" এই শব্দ কর্ণে পঁহুছিবামাত্র সুকুমারী যেন এক জগৎ হইতে অপর জগতে সহসা নীত হইলেন, এবং তৎপর উঠিয়া বসিলেন। বালক শরৎ রৌদ্রে ছুটাছুটী করিয়া মুখটি লাল করিয়া আসিয়া ভগিনীর সম্মুখে দাঁড়াইল এবং সুকুমারীকে দেখিবামাত্র বলিল, "দিদি, তুমি কি কাঁদ্‌ছিলে ?" "না ভাই, কাঁদ্‌ব কেন ?" বলিয়া সুকুমারী অঞ্চলে একবার চক্ষু মুছিয়া শরৎকে কোলে লইলেন এবং একটি চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মুখখানা রৌদ্রে সিন্দূর করেচিস্ যে ভাই; কোথায় গিয়েছিলি ?" শরৎ তৎপর উত্তর করিল, "প্রমোদ, ভূষণ, অবিনাশ আমরা সবাই মিলে আজ তিনটে খেজুর গাছ কেটে মাতি খেয়ে এসেচি।" এই কথা শুনিতে শুনিতে শরতের হাতের একটি রক্তাক্ত ক্ষতস্থানে সুকুমারীর নজর পড়িল; কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি হয়েচে রে, রক্তে যে নদী বয়ে গেচে ?" শরৎ সুকুমারীর কাতরতা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "ও একটা কাঁটা ফুটে গিয়েছিল, এখন শিগ্‌গির আমাকে জল দাও।" সুকুমারী ভ্রাতাকে এক গেলাস জল দিয়া একটু ন্যাকড়া ভিজাইয়া তাহা ক্ষতস্থানে বাঁধিতে লাগিলেন। যাহার অঙ্গে ক্ষত, সে অনুভব না করিলেও সুকুমারীর হৃদয় এই ক্ষতের বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। তিনি নিজের দুঃখ কিয়ৎক্ষণের জন্যও সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলেন। শরৎ কিন্তু এই ন্যাকড়া বাঁধা রূপে প্রক্রিয়ার বিলম্বে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তাহাদের সে দিনের কার্য্যতালিকার মধ্যে প্রধান একটা কার্য্য এখনও বাকি ছিল। ওপাড়ার বাগানে কচি কচি আম ধরিয়াছে। তাহা পাড়িয়া ভূষণদের বাড়ীতে ছেঁচিয়া খাইতে হইবে এইরূপ পরামর্শ কয়েক বন্ধুতে প্রাতঃকালে আঁটিয়া রাখিয়াছে। শরৎ পাছে পিছে পড়ে এই আশঙ্কায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, এবং ক্ষতস্থানে কাপড় বাঁধা শেষ হইবা মাত্র সবলে বারাণ্ডা হইতে উঠানে একটী লম্ফ প্রদান করিল।

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কোথায় যাবি?" শরৎ ছুটিতে ছুটিতে বলিল, "ও পাড়ায়।" সুকুমারী বলিলেন, "ও পাড়ায় যাস্ ত কালি সেক্‌রাকে একবার এখনই ডেকে দিয়ে যাস্ ত ভাই, বলিস্ যে একটু ভারি দরকারি কায আছে। লক্ষ্মী দাদা আমার, যেন ভুলিস্ না।"

তাহার পর সুকুমারী বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ শরতের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ও ভাবিতে লাগিলেন "ভাইকে একাকী ফেলিয়া আত্মহত্যা! তাহা মহাপাপ!"

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ কালীচরণ স্বর্ণকার সুকুমারীদের বাড়ী আসিল। সুকুমারী বলিল, "সেকরা জ্যেঠা, আমাকে একটি কবজের মাচুলি শীঘ্র গড়িয়া দিতে হবে।" কালীচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "সোণার না তামার?"

সু। সোণার।

কা। বেশ ত, দাও না মা, কতটুকু সোণা দেবে; যখন বলিবে তখনই গড়িয়া দিব।

সু। আজই গড়িয়া দিলে ভাল হয়; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে বসিয়া গড়িতে হবে।

কা। এই ত মা আমাকে অবিশ্বাস কর্‌লি তোর বাপ আমাকে না ওজন করিয়াই ভাল ভাল সোণা ফেলিয়া দিত।

সু। না সেকরা জ্যেঠা, সেজন্য নয়; কবজখানি আমি বাহিরে দিতে পারিব না, সেই জন্য বাড়ীতে ব'সে গড়িতে বলছি

কা। তা বেশ ত, এখনি আমি, বাড়ীতে বসেই গড়ে দিব। একটি মাচুলি হবে ত, তা ভরি খানেক সোণা লাগিবে।

এই বলিয়া কালীচরণ যন্ত্রাদি আনিতে গৃহে গেল। মনে মনে ভাবিতেছিল মেয়েটার সম্মুখে গড়িলেই বা ও কি টের পাবে, এক ভরির মধ্যে কোন্ না আধ ভরি গাপ করিতে পারিব।

সেই দিনই সুকুমারী স্বামীর সেই যত্নরক্ষিত পত্রখানি স্বর্ণপে

মোড়াইয়া কবজস্বরূপ কণ্ঠে ধারণ করিলেন। সন্ধ্যার সময় ঠাকুর প্রণাম কালে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, ধর্ম্মে অক্ষুন্ন মতি দাও।" প্রথমানুরাগ-বিকশিতবদন সুধীন্দ্রনাথের মূর্ত্তিটি এই সময়ে দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইল। তিনি স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "দেব, তুমি স্বর্গস্থ হইলেও, তোমার এই প্রেমপ্রফুল্লমূর্ত্তি যেন জীবনান্ত পর্য্যন্ত হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, প্রাণ মন যেন তোমারই চরণে বিক্রীত থাকে; কিন্তু নাথ, আশীর্ব্বাদ কর, যতই কেন বিপদে পতিত হই না, দেহের শক্তি যেন ভাইটির কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি, সংসারে ভাই থাকিতে, ভাইএর দুঃখ থাকিতে আত্মহত্যা করা পাপ, ইহা যেন কখন বিস্মৃত না হই।"

সুকুমারী যখন এইরূপ প্রার্থনা করিতেছিলেন, শরৎও ঠাকুর ঘরে আসিয়া টিপ করিয়া একটি প্রণাম করিল। সুকুমারী প্রার্থনানন্তর শরৎকে কোলে লইয়া স্নেহমধুর সম্ভাষণ করিতে করিতে তাহাকে সান্ধ্য আহারীয় দিতে চলিয়া গেলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগেন্দ্রের মকর্দ্দমা।

বিনয়কুমার সুকুমারীর নিকট হইতে কোন পত্রের উত্তর না পাইয়া অতীব অধীর হইয়া উঠিলেন। যদি সুকুমারী সে পত্র পাইয়া না থাকে, এইরূপ ভাবিয়া আবার একখানি পত্র লিখিলেন। সুকুমারী সেখানিকেও পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন, কোন জবাব দিলেন না। বিনয়কুমার এবার হতাশ হইলেন। শ্রীশচন্দ্র আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বিনয় সকল কথা তাঁহাকে বলি-লেন, সুকুমারীকে দুইবার চিঠি লিখিয়াও কোন জবাব পান নাই তাহা বলিলেন, যে সুকুমারীর জন্য তাঁহার প্রাণ এত ব্যাকুল, সেই সুকুমারী তাঁহাকে এতটা তাচ্ছিল্য করিয়াছে এই কথা বলিতে বলিতে তিনি হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, শ্রীশচন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রীশচন্দ্র বিনয়কুমারের অবস্থা দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন, কখনও বা স্নেহের স্বরে, কখনও বা ভর্ৎসনার ভাবে তাঁহাকে এই বাতুলোচিত দুর্ব্বলতা পরিহার করাইবার জন্য নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এদিকে যোগেন্দ্র বিশ্বাস এত দিনের গুপ্তবাসের পর এই সময়ে দেশে ফিরিল; এবং আদালতে উপস্থিত হইয়া এক দরখাস্ত দিল "এত দিন সে কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে ছিল, বাড়ীতে আসিয়া শুনিল যে কি মিথ্যা মকর্দ্দমায় তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, অতএব সে আদালতে হাজির হইতেছে, তাহার নিকট ধার্য্য দিনে উপ-

স্থিত হইবার জন্য যথোচিত জমানত লওয়া হউক।" প্রর্থনা মঞ্জুর হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বিচারালয়ে মকর্দ্দমা উঠিয়াছে। আসামীর কাটরায় যোগেন্দ্র করযোড়ে দীনভাবে দণ্ডায়মান; তাহার নয়নদ্বয় বিচারকের উপর স্থিরন্যস্ত এবং সামান্য মাত্র সুবিধা পাইলেই কাতরতাব্যঞ্জক দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সহানুভূতির উদ্রেক করিতে ব্যস্ত। বাদীর তরফের প্রমাণ শেষ হইলে বিচারক আসামীকে প্রশ্ন করিলেন,

"তুমি সুকুমারীর গ্রামের লোক?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তুমি সুকুমারী ও তাহার ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক বাহির করিয়া লইয়া যাইয়া তাহাদিগকে প্রথমতঃ নওয়াদ, তৎপরে কলিকাতা এবং তৎপরে আসামে লইয়া গিয়াছিলে?"

"হুজুর! গ্রামের লোকে কি কখন এমন কায করিতে পারে? আমাকে কি গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া মুখ দেখাইতে হইবে না, এমন কায কি কখন ঢাকা থাকে? আর আমি ত ন্যাংটা৷লোক নই, যে একটা মেয়েমানুষ লয়ে একবারে গ্রাম ছেড়ে পলাব। এমন কায আমি কখন করি নাই।"

"তবে তোমার নামে এরূপ নালিশ হইল কেন?"

"কারণ আমি ভাল করিতে গিয়াছিলাম, কাল কলি ত। হুজুর, এই যে গোপাল, এ সুকুমারীর ভাই নহে, সম্পর্কে কিছুই নহে, এই সুকুমারীর সর্ব্বনাশ করেছে। এই যে বিনয় বাবু, ইনি একজন বড় জমীদারের ছেলে, অবিবাহিত। ইনি কিছুদিন হইতে আমাদের গ্রামে যাতায়াত করেন; গোপাল সুকুমারীদের ঘরে ইঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিত। তাহাতে গ্রামের সকল লোকেই গোপালের উপর রুষ্ট হয়। আমার গ্রামে কিছু প্রভুত্ব আছে, আমি গোপালকে একঘরে

করিবার চেষ্টা করি। তখন সে সুকুমারীকে লইয়া এক রাত্রিতে পালাইয়া যাইয়া বিনয়কুমারের নিকট উপস্থিত হয়। ইহার কিছুদিন পরে আমি কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে যাই, সেই সময় আমার নামে মিথ্যা নালিস করিয়া আমাকে অপমান করাইবার জন্য গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করায়। বিনয়কুমার সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, সুকুমারীকে গোপালের সাহায্যে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়ায় দেশময় দুর্ণাম প্রচার হইয়া যায়, তখন সাহেবি মেজাজ ধরিয়া বলে যে সে সুকুমারীকে বিদ্যাসাগরী মতে বিবাহ করিবে। এ কথা সত্য কিনা হুজুর হইতে একবার বিনয়কুমারকেই জিজ্ঞাসা করা হউক। বিনয়কুমার যদি অস্বীকার করে আমি উহার বাপকে পর্য্যন্ত সাক্ষী মানিব।”

বিনয়কুমার বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলেন। যোগেন্দ্রের জবাব শুনিতে শুনিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন অগ্নিসিঞ্চন বোধ হইতেছিল। তিনি রক্তাভমূর্ত্তি হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান ছিলেন, মধ্যে মধ্যে পদতল হইতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এইরূপ অবস্থায় বিচারক কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বিনয়বাবু, এ কথা কি সত্য না কি ?”

বিনয়কুমার কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিলেন, “এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, তবে আমি যে সুকুমারীকে বিধবা-বিবাহের মতে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম তাহা সত্য।”

যোগেন্দ্র সংবাদ সংগ্রহে বড় দক্ষ। রামনগর গ্রামে প্রথম আগমনকালে আম্রকাননে বিনয়কুমার যে দুইটি নীচজাতীয়া বালিকাকে পয়সা দিয়া তাহাদের কলহ ভঞ্জন করিয়া দেন ও আর একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে একটি মুদ্রা দেন, যোগেন্দ্র তাহাদের দ্বারায় প্রমাণ করিল যে, বিনয়কুমার রাত্রিকালে সে গ্রামে আসিতেন। তাহাদিগকে টাকা দেওয়ার কথা বিনয়কুমার স্বীকার পাইলেন।

বাদীর পক্ষে যোগেন্দ্রের সহিত সুকুমারীকে পাইবার প্রধান সাক্ষী ছিল কালীগঞ্জের সাহেব। কিন্তু মোকর্দ্দমার সময় সে সাহেব কালী-গঞ্জের কায ছাড়িয়া যে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় নাই। কলিকাতার বিনোদলাল বাবুর সম্পর্কীয় সকল লোকে যোগেন্দ্রের সহিত সুকুমারীকে দেখা একবারে অস্বীকার করে; কারণ তাহাদের নিজের ভয় ছিল। সুতরাং বিচারক অবস্থাদৃষ্টে যোগেন্দ্রের জবাবই অধিকতর সম্ভবপর বিবেচনা করিয়া তাহাকে বেকসুর খালাস দিলেন।

বিনয়কুমার মর্ম্মাহত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। সংসারের এ এক নূতন চিত্র দেখিয়া অতীব দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন।

কোন কোন সংবাদপত্রে যোগেন্দ্রের ন্যায় এ হেন নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তি-কেও ফৌজদারী মকৰ্দ্দমায় আসামী হওয়ার অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা অবলম্বনে দেশের ফৌজদারী বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতৃবিয়োগ।

যোগেন্দ্রের মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পর আজ প্রায় দুই মাস হইল। প্রকৃতি মাতা নব বসন্তের নব সাজে সজ্জিতা, তাঁহার নবানুরাগ, নবানন্দ চারিদিকে প্রসূন হাসিতে বিকসিত;. দক্ষিণানিল সে আনন্দবারতা স্কন্ধে লইয়া অধীরভাবে কোলাহল করিতে করিতে সুখীর সুখ-সদন, দুঃখীয় দুঃখাগার, রাজার প্রাসাদ, গরীবের কুটীর সকল স্থানেই ছুটিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা আগত প্রায়। এমন সময়ে বিনয়কুমার তাঁহাদের বৈঠকখানার এক কুঠরীতে একাকী অধোবদনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সে দিব্য শ্রী একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, অলক্তকবর্ণ মসিমলিন হইয়াছে, সতেজ সুগোল গঠন অস্থিসার হইয়াছে, সুচিক্কণ সুবিন্যস্ত কেশরাশি রুক্ষ ও অযথা বিন্যস্ত হইয়া মলিন মুখের মলিনতা আরও বৃদ্ধি করিতেছে।

শুদ্ধ যে বিনয়কুমারেরই এইরূপ মলিন ভাব তাহা নহে; তাঁহাদের সমগ্র বাড়ীটির এইরূপ মলিন নিরানন্দ ভাব। যে বৈঠকখানা সর্ব্বদা সজীবভাবে হাসিতে থাকিত, তাহা আজি নির্জ্জন নিরানন্দময়। আজ সে ফরাস বিছানা বিস্তৃত নাই; ঝাড় বাতি লণ্ঠনের আলোক[illegible] নাই, সুবাসিত তামাকুর মেঘবর্ণ ধূম্রকুণ্ডল উদ্গীরণকারী বাঁধা হুঁকার মধুর গুড় গুড় শব্দ মিশ্রিত মধুর সান্ধ্য আলাপ নাই। যেখানকার যে জিনিষ সেখানে আর সেটি নাই। ফরাস বিছানার গালিচা, সতরঞ্চি প্রাঙ্গণে যথা তথা পতিত রহিয়াছে, কোথাও বা একখানা চেয়ার পদহীন হইয়া লুণ্ঠিত হইতেছে, কোথাও একটা টেবিল ধূলি-

ধূসরিত হইয়া নিষ্প্রয়োজনে পড়িয়া আছে। সকলই যেন শূন্য, সকল ই যেন বিশৃঙ্খল। বাতাস টা যেন সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া হা হা শব্দে শূন্য হাসি হাসিতে হাসিতে করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছে।

কেন এ পরিবর্ত্তন? বিনয়কুমারের মানসিক বিকারের কারণ ত আমরা অবগত আছি। কিন্তু তাহার উপর আবার অতি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বিনয়কুমারের পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক দিন হইল শ্রাদ্ধাদি অতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধের গোলমালে এত দিন বাড়ীর শূন্যভাব কেহ অনুভব করে নাই; এখন যেন সেই ভাব বিকট আকার ধারণ করিয়া সেই বাড়ীটিকে হা-হুতাশময় একটি অতীব ক্লেশকর রূপ প্রদান করিয়াছে।

আজ প্রাতঃকালে বিনয়কুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র বিনয়-কুমারকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া, বিষয় আশয়ের ভার লইয়া উৎ-সাহের সহিত সাংসারিক কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া স্বয়ং কার্য্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। যত দিন যোগেশচন্দ্র বাড়ীতে ছিলেন তত দিন বিনয়কুমারেরও যেন বুকে বল ছিল; আজ তিনি চলিয়া যাওয়ায় বিনয়কুমার আপনাকে নিতান্ত নিঃসহায় বোধ করিতেছেন; সংসার অতি ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কুৎসা, গ্লানি, শোক তাপ, নিরাশা, ভয়, ইহারা সকলেই যেন এক একটি রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভ্রূকুটীপূর্ব্বক মুখব্যাদান করিতে করিতে তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এইরূপ অবস্থায় বিনয়কুমার বৈঠকখানার কুঠরীতে একাকী বসিয়া আছেন। কখনও বা তাঁহার মনে চিন্তার পর চিন্তা, ভাবনার পর ভাবনার স্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে, কখনও বা সে মন স্রোত-হীন গতিহীন জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ভাব ধারণ করিতেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিল। একবার একটি বংশীধ্বনি গ্রামের এক প্রান্ত হইতে বায়ু-

হিল্লোলে দুলিতে দুলিতে, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া বিনয়-কুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিনয়কুমার চমকিত হইয়া উঠিলেন। এই বংশীধ্বনিতে একটি পূর্ব্বপরিচিত সুখময়, আনন্দময় রাজ্যের স্মৃতি তাঁহার মনে জাগরিত হইয়া উঠিল; অনুভব করিতে লাগিলেন যেন এক দিন তিনিও সেই আনন্দময় আশাময় উচ্ছ্বাসময় রাজ্যের অন্তর্গত ছিলেন, এখন কিন্তু সে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া নিরাশা নিরুদ্যমময় অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। আত্মসুখমগ্ন হাল্‌কাহৃদয় বংশীধ্বনি তাঁহার এ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া, তাঁহার কর্ণের নিকট যাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যেন বলিতে লাগিল "দেখ্ আমি, কেমন সুখী, কেমন মনের সুখে বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া, আকাশে খেলা করিয়া বেড়াইতেছি। আমি যে জগতে থাকি সেখানে সকলেই এমনি সুখী, সকলেই হাসে, নাচে, খেলায়। আর তোর সকলই দুঃখ। তোর দুঃখ দেখিয়া আমার হাসি পাইতেছে। এই বলিয়া বংশীধ্বনি যেন পলাইয়া গেল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই বিনয়কুমারদের বাড়ী হইতে হৃদ্‌বিদারক করুণ রোদনধ্বনি শ্রুত হইল। তাহা একবারে বিনয়কুমারের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। যে স্বপ্নরাজ্যে তাঁহার মন বিচরণ করিতেছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন ইহা তাঁহার মাতার ক্রন্দন ধ্বনি, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

তাঁহার মাতা বারাণ্ডার এক প্রান্তে পতিত হইয়া রোদন করি-তেছেন; শয্যাশূন্য স্নিগ্ধ গৃহতলে বক্ষ রাখিয়াছেন, উপরে স্নিগ্ধ বাতাস বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু তথাচ হৃদয়ের অগ্নির তাপে সকলই তাঁহাকে অসহনীয় বোধ হইতেছে। বিনয়কুমার ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন, এবং তাঁহার ললাটে ও চক্ষুর উপর হস্তার্পণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা চুপ কর।" তাঁহার হস্ত মাতার উষ্ণ নয়নবারিতে সিক্ত হইল। বিনয়কুমারের করস্পর্শে ও কথা শ্রবণে কথঞ্চিৎ শান্ত

হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু তাঁহার অশ্রুবিপ্লুত কাতরতাব্যঞ্জক মুখ দর্শন করিয়া বিনয়কুমারের নয়নে অশ্রু ঝরিল। মাতা পুত্রে কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া নয়নাসার বর্ষণ করিলেন। পরে মাতা বিনয়কুমারের পৃষ্ঠদেশে স্নেহভরে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি কোঁদো না।"

বিনয়কুমার বলিলেন, "তুমি যদি দিবারাত্রি কাঁদিতে থাক, আমি না কাঁদিয়া কি করিয়া থাকি বল দেখি মা।"

মাতা বলিলেন, "আমি ত বাবা তোমাদের মুখ চেয়ে আর কাঁদি না, আজ যোগেশ চলিয়া যাওয়ায় সব যেন শূন্য দেখিতেছি, প্রাণের ভিতর হইতে কি যেন ঠেলিয়া উঠিতেছে, না কাঁদিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না। আহা! যোগেশের মেয়েটা সর্ব্বদা কাছে থাকিত, বউমাও সংসারের সব দেখিত শুনিত, ঘুরিয়া বেড়াইত, তবু যেন একটু আনমনা হইয়া থাকিতাম।"

বি। মা তোমাকে দাদার কাছেই কিছু দিনের জন্য চল রাখিয়া আসি। স্থান পরিবর্ত্তনে তবু অনেকটা মনের পরিবর্ত্তন হইবে, আর সেখান হইতে কাশী নিকটে, মধ্যে মধ্যে কাশী যাওয়াও হইবে। দাদাও আমাকে তাই বলিয়া গিয়াছেন।

মা। তা না হয় কিছুদিন সেখানে রহিলাম, কিন্তু এ ঘর বাড়ী, এ সোণার সংসার যে কত কষ্টে পাতিয়াছি। এ সব ছাড়িয়া বাবা বিদেশে আমার যে প্রাণের যাতনা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

বি। কিছুদিন পরে আবার আসিলেই চলিবে। আমার এখন মনের অবস্থা এমন নয় যে বিষয় কার্য্য করি। আমারও ইচ্ছা কিছুদিন অন্য স্থানে থাকি।

মা! তুমি বাবা বিষয়কর্ম্ম না দেখিলে যে সব ছারখার হইবে। যোগেশ সেখানেও অনেক টাকা ছড়াইয়াছে, যে সব ফেলিয়া ত আর আসিতে পারে না, এখন তুমি এখানে না দেখিলে চলিবে কেন। কেন

বাবা মন উড়ো উড়ো করে এদেশে ও দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ? এইবার বিবাহ কর, সংসারে মন দাও। দেখ তুমি বিবাহ না করায় তাঁর এই শেষকালটায় যে কিরূপ মনকষ্ট হইয়াছিল তা তিনি নাকি ভারিত্বাই লোক ছিলেন তোমার কাছে কখন খুলিয়া বলেন নাই। তাহা শুনিলে তুমি নিশ্চয়ই এতদিন বিবাহ করিতে। তা বাবা, তুমি যদি আর না বিবাহ কর, আমিও কিন্তু তা হলে বাঁচিব না। তুমি রাজার ছেলে, আমার চাঁদের মত রূপ, সোণার লক্ষ্মী বউ বিয়ে দিয়ে ঘরে আনিব, তা না কোথায় এক পোড়াকপালী বিধবাকে বিয়ে করিবার খেয়াল করিলে ? আমার শিবতুল্য ছেলের মনে যে এমন সর্ব্বনেশে খেয়াল তুলিয়া দিয়াছ তাহার সর্ব্বনাশ হউক।

বিনয়কুমার নীরবে রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

মাতা আবার বলিলেন, "যদি তুমি বাবা শীঘ্র বিবাহ করিয়া ঘরবাসী না হও, জানিবে যে পথে তিনি গিয়াছেন, সেই পথে আমিও শীঘ্রই যাইব।" বিনয়কুমার ধীরে ধীরে বলিলেন "মা, আমি ঘরবাসী হইব না কেন, ঘরেই ত আছি, ঘরেই থাকিব, সর্ব্বদা তোমার কাছেই থাকিব, তোমার সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব, কিন্তু বিবাহ নাইবা করিলাম মা, আমার বিবাহ করিতে আর একবারেই ইচ্ছা যাইতেছে না।"

মা। তাই কি হয় বাবা, তুমি আমার দুধের ছেলে, কি হয়েচে যে তুমি বিবাহ করিবে না। সংসার তবে আর কিজন্য। এই যোগেশের মেয়েটিও কাছে থাকিলে প্রাণটা কত শীতল থাকিত। যদি আমাকে বাঁচিতে হয় ত কেবল তোমার বেটার মুখ দেখিবার জন্য ; তা নইলে ত আমার এই মুহূর্ত্তে মরিলেই মঙ্গল।

বি। আচ্ছা মা আমি যদি তোমার মেয়ে ছেলে হতাম আর অল্প বয়সে বিধবা হতাম, তা হলে কেমন করে মনে সান্ত্বনা দিতে ? তাই কেন মনে কর না।

মা। তুমি আমার সোণার পুত, অমূল্যরতন, কেন আমি এমন ভাব্‌তে যাব?

মাতাপুত্রে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা বিনয়কুমারের ঠাকরুণদিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও লোকনাথ বাবুর মৃত্যুর কথা পাড়িয়া অনেক দুঃখ করিলেন ও কাঁদিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের শোকবৃত্তান্তেরও অনেক উল্লেখ করিলেন ও তীব্র ধারায় অশ্রুত্যাগ করিলেন, লোকনাথ বাবুদের সংসারের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন, এবং বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী অনেক সুপরমর্শ দিলেন। অতঃপর বিনয়কুমারের মাতার কি কার্য্যোপ-লক্ষে সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার আবশ্যক হইল। তিনি শোকে এতদূর কাতর ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিলেন যে, উঠিতে যাইয়াই ঘুরিয়া পড়িলেন। বিমলা দিদি তাঁহাকে ধরিয়া যথাস্থানে পঁহুছিয়া দিয়া বিনয় কুমারের নিকট আসিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসিলেন। একটি টিক্‌টিকি ঠিক এই সময়ে টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল। বিমলাদিদি অঙ্গুলিদ্বারা মাটিতে তিনবার সেই শব্দের প্রতিধ্বনি করিয়া, মুখে ঔদাস্য ব্যঞ্জক স্বরে তিনবার হরিনাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বিনয় তোমরা যে পশ্চিম যাইবার পরামর্শ করিয়াছ, তা আমি বলি কি যে কোন প্রকারে মনটাকে বুঝাইয়া, মাকেও বুঝাইয়া সুঝাইয়া বাড়ীতেই আরও কিছুদিন থাকিলে হয় না, এই বিপদের পর সকলে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইলে বাড়ীটার দিকে যে একবারে তাকান যাইবে না, আর সকলই যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। ভগবানের মার, এতে ত আর কিছু হাত নাই ভাই, আবার সবই করিতে হবে, সবই দেখিতে শুনিতে হইবে, ক্ষুদ্‌ কণাটিও পর্য্যন্ত দেখিয়া লইতে হইবে। ভগবান শোক দেন বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া কাঁদিতে দেন কৈ? যে কায কাল করিছিলাম আজও আবার চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সেই কাযই

করিতে হইবে, মুখে অন্নের গ্রাস তুলিতে হইবে। শোকের ভোগ ভুগিতে, দেখিতে, জানিতে ত আর আমার কিছু বাকী নাই। তাই বলিতেছি, এ ঘরকন্না, বিষয় আশয় ছাড়িয়া যদি সকলে চলিয়া যাও, তাহা হইলে ত ভূত নাচিতে থাকিবে, যে যে দিকে পাইবে আপন আপন ইষ্টসিদ্ধি করিয়া লইবে।

"বিমলাদিদি যা বলিলে সত্য বটে, কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে কিছু দিনের জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করিলে মনটা যেন একটু শীঘ্র শান্ত হইতে পারে। মা যে বিদেশে অধিকদিন থাকিতে পারিবেন তাহা বোধ হয় না, তবে একবার তাঁহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইলে এবং কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান দিয়া ঘুরাইয়া আনিলে এই তীব্র কষ্টের সময় যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া কিছুদিন কাটিতে পারে।

বিমলা। দেখ ভাই যাহা ভাল বিবেচনা কর, আমি মেয়েমানুষ কি বুঝিব বল।

এই সময় একটি ভদ্রবেশধারী লোক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বিনয়-কুমার ও বিমলা দিদির সম্মুখস্থ হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক দাঁড়াইল। বিমলা দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন "কে গো নবদ্বীপ নাকি ?" উত্তর হইল "হাঁ দিদিঠাকরুণ আমি নবদ্বীপ।" সকলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। এই লোকটি বিনয়কুমারের পিতার একজন গ্রামস্থ কর্ম্মচারী, নাম নবদ্বীপ সরকার, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া নবদ্বীপ বলিল, "শুনিলাম ছোট বাবু নাকি মা ঠাকরুণকে লইয়া শীঘ্রই পশ্চিম যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ?" বিমলা দিদি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "হাঁ, তাই ত বলিতেছে।

নব। আমি ত সেরূপ উপদেশ দিই না। ছোটবাবু আমাদের বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক, কর্ত্তামহাশয় যেমন কাযকর্ম্ম করিতেন, উনিও সেইরূপই করিবেন। এখন উনি দেখিয়া শুনিয়া কাগজ পত্র বুঝিয়া

লউন এই আমাদের ইচ্ছা। তবে মাঠাকরুণ যদি অত্যন্ত কাতর হয়েন, তবে না হয় কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে গেলেন। কাজ কর্ম্মের কোন ত্রুটি হবে না, আমরা পূর্ব্বে যেমন যত্নের সহিত কাজ করিতাম, এখন বরং তাহা অপেক্ষা অধিক যত্নের সহিত করিব। তাহা হইলে কত দিনে যাওয়া হইবে?

বিনয় কুমার গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "এখনও দিন স্থির হয় নাই। কাল তোমাদের সহিত আমি এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিব।"

"যে আজ্ঞে, এখন তবে প্রণাম হই" এই বলিয়া নবদ্বীপ চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল "দিনটা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল, তবে দেখিতেছি, বিমলা ঠাকরুণের মন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে, মেয়েটা সাতটা পুরুষের বুদ্ধি ধরে, বুঝিবা মত উল্টাইয়া দেয়। আর তাতেই না কি। যদিই ছোট বাবু কাগজ পত্র দেখিতে চান, দেখিবেন। পাঁচটাই পাশ কর আর সাতটাই পাশ কর, জমিদারী কাজের ফের বুঝিতে এখন অনেক দেরী। আর যে সকল আদায়ী টাকা এখনও হিসাবে উঠে নাই, তার আর কি করিবে।

নবদ্বীপ চলিয়া যাইলে বিনয়কুমার এবং বিমলা দিদির মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল। সে কথাবার্ত্তা বিনয়কুমারের বিবাহ সম্বন্ধে। বিমলা দিদি বলিলেন "দেখ বিনয়, তোমাকে অনেক বার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি যে তুমি বিবাহ কর; তুমি আর যত চেষ্টাই কর না কেন, তোমার মা, তুমি বিবাহ না করিলে, কিছুতেই সান্ত্বনা পাইবে না।" বিনয়কুমার উত্তর করিলেন, "বিমলা দিদি তোমার কাছেত আমার মনের অবস্থা কিছুই অজানিত নাই, তবে আর তুমি কেন আমাকে একথা বলিতেছ।"

বিমলা। তোমার মনের অবস্থা ত সব জানি। তুমি বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে যে সব শাস্ত্রের কথা বলিয়াছিলে তাহাও এক প্রকার

বুঝিয়াছি। যাহারা অত্যন্ত অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহ যদি চলন হয় ত আমার বিবেচনায় ভালই হয়। কিন্তু একটা কথা আমার মনে লাগে। দেখ, ছেলের বিবাহ দিবার সময় মা বাপে সুলক্ষণা মেয়ে পাইবার জন্য কত না অনুসন্ধান করে। ঠিকুজী কুষ্টী লইয়া কত না গণ্ডগোল বাধায়। এমন অবস্থায় কে বল দেখি বিধবা কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়া রাজি হবে। বিধবা হইলেই ত সাধারণের মনে মেয়েটির সুলক্ষণ সম্বন্ধে সন্দেহ হবে। এ দেশে যদি বর এসে বিবাহ না হয়ে ফিরে যায়, সে মেয়েকে দুপোড়া মেয়ে বলিয়া আর কেহ বিবাহ করিতে চায় না। বিবাহের পর বিধবা হলে তাহার পুনরায় বিবাহ কত অসম্ভব ভাব দেখি। তবে যে পুরুষের অন্য কন্যা জুটিতেছে না, সে এরূপ মেয়েকে, রেওয়াজ থাকিলে, বিবাহ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু তোমার মতন যে পাত্রে কন্যা দিবার জন্য হাজার হাজার লোকে আসিয়া মাথা কুটিতেছে, তাহার মা বাপ কেমন করিয়া বল দেখি বিধবা কন্যা পছন্দ করিবে! আর দরকারই বা কি?

বিনয়। বিমলা দিদি, যদি শুদ্ধ দরকার অদরকারের কথা হইত তাহা হইলে তুমি যা বলিলে তা ঠিক। কিন্তু এ ত সে কথা নয়, এ যে হৃদয়ের অতি গভীরতম প্রদেশের কথা। সে যা হউক বিমলা দিদি, যদি আমি আমার হৃদয়কে বদলাইতে পারিতাম, মনকে ফিরাইতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আমি পিতা মাতার মনে লেশ মাত্র ক্লেশ দিতে ইচ্ছুক হইতাম। তবে এই পর্যন্ত মনকে দমন করিয়াছি যে আমি বিবাহের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। এখন আমার মনে সর্ব্বদা এই কথা জাগিতেছে যে যদি একজন অজ্ঞানা বালিকা বিধবা চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে একজন জ্ঞানাভিমানী পুরুষ চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া কেন না জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইবে?

বিমলা। ভাই বলিতেছ বটে, কিন্তু মেয়েতে পুরুষে অনেক তফাৎ। মেয়ের পক্ষে যে নিয়ম খাটে, পুরুষের পক্ষেও যে সে নিয়ম খাটিবে তাহা ত বোধ হয় না।

বিনয়কুমারের মাতা এই সময়ে প্রত্যাগমন করিলেন। বিনয়কুমার ও বিমলা দিদির কথাবার্ত্তা আজিকার মত বন্ধ হইল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নবানুরাগ।

বৈশাখ মাসের শেষ ভাগ। বিনয়কুমার তাঁহার মাতাকে লইয়া কিছুদিন হইতে কাশীতে আছেন। একদিন বিকালে তিনি কাশী রেলওয়ে ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিলেন; প্লাটফর্মে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন, কখন বা অলস ঔদাস্যের সহিত দেওয়ালের উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা কোন অত্যদ্ভুত বিজ্ঞাপন পাঠ করিতেছেন, কখন বা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ কার্য্যতৎপর লোক সকলের গতিবিধি দেখিতেছেন। এমন সময়ে, একটি স্ফুটনোন্মুখযৌবনা অসামান্যরূপ-লাবণ্যসম্পন্না বালিকা এক পঞ্চমবর্ষীয় চঞ্চল শিশুর হস্ত ধরিয়া, তাহার বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে, বিনয়কুমারের সম্মুখ দিয়া, স্ত্রীলোকদিগের বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিল। বালিকার বয়স ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশের মধ্যে। উৎসব দিন অপেক্ষা উৎসবের পূর্ব্বাহ্নে মোহিনী আশার উন্মাদকতা যেমন অধিক অনুভূত হয়, প্রাপ্তসুখ অপেক্ষা যেমন সন্নিকটবর্ত্তী সুখের আকাঙ্ক্ষায় অধিক তীব্রতা থাকে, প্রায়োন্মেষিত-যৌবনা বালিকার প্রতি অঙ্গে সেইরূপ উন্মাদকারী, সেইরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনকারী ভাব বর্ত্তমান। বালিকার বালিকাসুলভ চঞ্চলতা ও সরলতা এখনও বিদূরিত না হইলেও, তাহাতে রমণীসুলভ যৌবনাভিমানের পূর্ব্বাভাস ও তজ্জনিত ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও সলজ্জতা বেশ লক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বালিকা বিনয়কুমারের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। একবার বিনয়কুমারের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল, কিন্তু তখনই লজ্জায় নয়ন নিমীলিত হইল। বিমর্ষ বিনয়কুমারের হঠাৎ

মনে হইল যেন কোন সুদূর আনন্দরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সে রাজ্যের একটু বাতাস অঞ্চল দ্বারা তাঁহার অঙ্গে লাগাইয়া চলিয়া গেল। তিনি বালিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন; দেখিলেন বায়ুহিল্লোলে তাহার লম্বিত বেণী পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছে; সুঠাম ললাট পার্শ্বে চূর্ণ কুন্তলরাজি খেলিতেছে, আকর্ণায়ত লোচন কিছু কুঞ্চিত হওয়ায় ঈষন্মুক্ত পদ্ম-কোরকের ন্যায় শোভা পাইতেছে; সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল আরও বঙ্কিম ভাব গ্রহণ করিয়াছে। বসন ইতস্ততঃ উড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে বালিকা বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিল। চঞ্চল শিশুকে সেই গৃহ মধ্যে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। সে অচিরেই বাহিরে আসিল এবং একখানি ধাবমান ইঞ্জিন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "দিদি, দেখসে একটা গাড়ীর কাটা মাথা ছুটিতেছে।" বালিকা তৎক্ষণাৎ বহিরে আসিয়া বলিল "সতীশ আর বাহিরে যেওনা, বড় ধূলা উড়িতেছে। তোমাকে ত সব দেখাইয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া বালিকা বালকের হস্ত ধরিয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল। বিনয়কুমার এবার ও বালিকাকে অতৃপ্ত নয়নে দেখিলেন। একটি প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষ এই সময়ে বিশ্রাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিনয়কুমার যে বেঞ্চে বসিয়াছিলেন তদুপরি বসিলেন। উভয়েই পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ পরস্পরের দিকে দৃষ্টি করার পর ভদ্রলোকটি কিছু বিস্মিতভাবে বিনয়কুমার বাবুকে বলিলেন "আমাকে কি চিন্তে পারেন? আপনি এখানে কিরূপে?" বিনয়কুমার উত্তর করিলেন "আজ্ঞে হেঁ, চিন্তে পারিয়াছি" আমি কয়েক দিন হইল মাতাঠাকুরণীর সহিত কাশী আসিয়াছি, আজি ষ্টেশন দিয়া বেড়াইতে আসিয়াছি, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" ভদ্র-লোকটি উত্তর দিলেন "আমি এবং হরনাথ বাবু সপরিবারে আজ দেশ হইতে আসিলাম, কয়েক দিন কাশীতে থাকিব এইরূপ উদ্দেশ্য আছে।" বিনয়কুমার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কোন ট্রেণে আসিয়া-

ছেন।" ভদ্রলোকটি বলিলেন "৩টার ট্রেণে, আমাদের ইচ্ছা আছে দুইখানা পানসি ভাড়া করিয়া গঙ্গাদিয়া কাশীতে যাইয়া পঁহুছিব। গঙ্গা-বক্ষ হইতে কাশীর দৃশ্য অতি সুন্দর, হরনাথ বাবুর এবং তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েদের সেই জন্য নৌকা করিয়া যাইতে বড় সাধ। হরনাথ বাবু নিজেই নৌকা ভাড়া করিতে গিয়াছেন। এখনও ফেরেন নাই, সেই জন্য আমাদের বিলম্ব হইতেছে।"

যে হরিপুরের হরনাথ বাবুর কন্যার সহিত বিনয়কুমারের বিবাহের সম্বন্ধ হয়, এ সেই হরনাথ বাবু এবং যে ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে লইয়া তিনি বিনয়কুমারের পিতার নিকট বিবাহের কথা স্থির করিতে যান, এ সেই ভদ্রলোকটি। উপর্য্যুক্ত কথাবার্ত্তার পর বিনয়কুমার বাবু ও ভদ্রলোকটি কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ভদ্রলোকটি বলিলেন "মহাশয় আপনার পিতার মৃত্যু সংবাদে আমরা যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না, শুদ্ধ আমরা কেন দেশের সকল লোক দুঃখিত। সেরূপ সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী অথচ সদাশয় এবং দয়াবান জমীদার কি আজ কাল দেখা যায়। গরীব ধনী সকলে তাঁহার বিয়োগে সমান দুঃখিত।" বিনয়কুমারের চক্ষু পিতার স্মৃতির উদ্দীপনায় ছলছল করিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন "মহাশয় আমরা শুনিয়াছি আপনি এখনও বিবাহ করেন নাই। হরনাথ বাবু আপনার পিতার সুনাম শ্রবণে এবং আপনার নিজের সদ্গুণে এতদুর মুগ্ধ যে তিনিও এ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে পর্য্যন্ত না আপনার বিবাহ হইবে, তিনিও কন্যাকে অবিবাহিত রাখিবেন। মেয়েটি বিবাহযোগ্য বয়স প্রায় অতিক্রম করিতেছে, কিন্তু আপনাকে দেখিয়া তাঁহার আর অন্য পাত্র পছন্দ হইতেছে না। আর আপনার তুল্য পাত্র আর কোথায় পাইবেন। আপনারও এইবার বিবাহ করা উচিত। আমরা শুনিয়াছিলাম যে আপনি নাকি বিধবা বিবাহের উদ্যোগী হইয়া-

ছিলেন। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, ও সকল ভদ্র সমাজে কখন চলন হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ত আর কসুর করেন নাই, চলন হইলে এত দিন হইয়া যাইত। আর ছোট লোকের সমাজে ত চলনই আছে। আমাদের ভদ্রসমাজ যে ছোটলোকের সমাজে পরিণত হবে এরূপ কখন আশা করা যায় না এবং করাও উচিত নয়। সে যাহাই হউক, আপনি ও সব খেয়াল ছাড়ুন এবং বিবাহ করুন।

বিনয়কুমার বাবু কিছু উত্তর করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের কাশীতে বাসা কোথায়? বিনয়কুমার উত্তর করিলেন "দশাশ্বমেধের ঘাটের সন্নিকটে"। ভদ্রলোকটি বলিলেন "আমরাও ত সেই খানে যাব, তবে আপনি আমাদের সঙ্গে নৌকাতে চলুন না, দুই খানা নৌকা ভাড়া হইবে, বেশ সুবিধা হইবে, আর এ সময় গঙ্গা দিয়া যাইতে বড় আনন্দ হইবে"।

বিনয়কুমার সম্মত হইলেন; বলিলেন, "আমার কোন আপত্তি নাই।" হরনাথ বাবু নৌকা ভাড়া করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিনয়কুমার কে দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও বিশেষ আনান্দতও হইলেন, অনেক কথা বার্ত্তা হইল। তখন সকলে যাইয়া নৌকায় উঠিলেন। হরনাথ বাবু, উল্লিখিত ভদ্রলোকটি, বিনয়কুমার বাবু ভৃত্যাদিসহ একখানি পান্‌সিতে উঠিলেন, এবং স্ত্রীলোকগণ অপর পান্‌সিতে উঠিলেন। যখন নৌকা ছাড়িল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। শুক্লপক্ষের রাত্রি; সন্ধ্যা হইতে না হইতেই চন্দ্রমা নীলাকাশে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইল; অসংখ্য তরণীতাড়িত কাশীতলবাহিনীর নির্ম্মল পবিত্র সলিলে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, জ্যোৎস্নাধৌত তরঙ্গশিরে অগণ্য হীরকখণ্ড জ্বলিতে লাগিল, কাশীধামের শ্বেত সৌধমালা শুভ্র কৌমুদীরাশিতে হাসিয়া উঠিল, দেবালয়োত্থিত সান্ধ্য আরতির শঙ্খ

ঘণ্টা কাঁসর ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। এই অপূর্ব্ব ভাবোদ্বোধক সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে বিমর্ষ বিনয়কুমারের হৃদয়ে আজ এক প্রকার নূতন বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল, কঠোর শীতের পর তিনি যেন আজ নব-বসন্তের মলয় হিল্লোল অনুভব করিতে লাগিলেন। দুই খানি পান্‌সি পাশাপাশি হইয়া হেলিতে দুলিতে মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল। যেখানিতে বিনয়কুমার ছিলেন, সেখানে প্রধান কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল হরেন্দ্র বাবুর কন্যার রূপ গুণ সুশীলতা সম্বন্ধে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে হরেন্দ্র বাবু কন্যার বিবাহে কিরূপ সাধ মিটাইয়া খরচ পত্র করিবেন, কি কি অলঙ্কার এখন হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না। অপর নৌকা খানিতে তাঁহার সেই অনূঢ়া কন্যা শিশু ভ্রাতার সহিত ক্রীড়া ও কথাবার্ত্তা কহিতেছে। বিনয়কুমারের নয়নদ্বয় আজ নিতান্ত অবাধ্য হইয়া সহস্র কথাবার্ত্তার মধ্যেও সেই বালিকার দিকে সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল "এ বালিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি জ্যোৎস্নাতেই নির্ম্মিত? নহিলে জ্যোৎস্নার সহিত এত মিলিয়া যাইবে কেন, এরূপ স্নিগ্ধ আভা নির্গত হইবে কেন; ইহার কণ্ঠধ্বনি কি বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় কৌশলে বাঁধা, নহিলে স্বর এত মিষ্ট হইবে কেন? চন্দ্রকরোজ্জ্বল স্বচ্ছ গঙ্গাসলিলের ন্যায় ইহার নয়নদ্বয়ের কি শীতল পবিত্র জ্যোতিঃ! বালিকা কি আমাকে দেখিতেছে? না, আমাকে দেখিবে কেন? না, ঐ যে দেখিতেছে, ভাইটিকে আদর করিয়া চুম্বন করিবার সময় ঐ যে সলজ্জভাবে আমার দিকে এক একবার তাকাইতেছে।"

এইরূপ সুখময়, আবেশময়, স্বপ্নময় চিন্তায় বিনয়কুমারের সময় অতিবাহিত হইল। নৌকা দুইখানি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া লাগিল। সকলে অবতরণ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

হরেন্দ্রনাথ বাবু বাসায় গিয়া গৃহিণীকে সহাস্যবদনে বলিলেন

“দেখিলে কেমন জামাই পছন্দ করিয়াছি”। গৃহিণী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন “শুধু পছন্দ করিলে আর কি হইবে, কাজে হয় তবেই না। তুমি যেমন গো, একটি পাত্রের আশা করিয়া আর কোথাও চেষ্টা করিলে না, মেয়ে অরক্ষিণী হয়ে উঠলো, এখন যদি ও পাত্রে বিয়ে না হয়, তবে উপায় কি বল দেখি।” হরেন্দ্র বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন “তোমার অত ভাবনা কেন, আর বিবাহ না হয়ে যায় কোথা, এ পরীর বাচ্ছা মেয়ে, একবার নিজের চক্ষে দেখে বিবাহে অসম্মত হয় এমন কোন্ পাত্র আছে”? গৃহিণী একটু হাসিয়া সগৌরবে সন্নিকটস্থা নিদ্রিতা কন্যার দিকে তাকাইলেন ও স্নেহভরে তাহার মুখাবরণকারী কেশগুচ্ছ হস্তে করিয়া সরাইয়া দিলেন।

বিনয়কুমারের মাতা বিনয়কুমারের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে তিনি আজ অধিক মনোযোগের সহিত শুনিলেন। ইহাতে বিনয়কুমারের মাতা যেন কিছু আশ্বস্তা হইলেন।

বিনয়কুমারের সে রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। বহুদিন পরে আজ সুখকল্পনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইল; ভাবিতে লাগিলেন, যে অপূর্ব্ব-মাধুরী রাশি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলেই তাহা পাইতে পারেন, তাঁহার পিতা মাতা সেই লাবণ্যপূর্ণ কন্যারত্নের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত। বিবাহ না করায় পিতা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, মাতা সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ। মাতাকে সন্তোষ করিবার জন্যও যদি তিনি বিবাহ করেন, তাঁহার ভবিষ্যৎজীবন কি সুখময় হইবে না?

এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আবার সুকুমারীর কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন “আমি যে সুকুমারীকে ভালবাসি বলিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছিলাম, এই কি আমার ভালবাসা,? আমি ত তবে নিশ্চয়ই কপটহৃদয়, আমি ত এরূপ প্রস্তাবে নিশ্চয়ই

ঘণ্টা কাঁসর ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। এই অপূর্ব্ব ভাবোন্মাদক সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে বিমর্ষ বিনয়কুমারের হৃদয়ে আজ এক প্রকার নূতন বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল, কঠোর শীতের পর তিনি যেন আজ নব-বসন্তের মলয় হিল্লোল অনুভব করিতে লাগিলেন। দুই খানি পান্‌সি পাশাপাশি হইয়া হেলিতে দুলিতে মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল! যেখা-নিতে বিনয়কুমার ছিলেন, সেখানে প্রধান কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল হরেন্দ্র বাবুর কন্যার রূপ গুণ সুশীলতা সম্বন্ধে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে হরেন্দ্র বাবু কন্যার বিবাহে কিরূপ সাধ মিটাইয়া খরচ পত্র করিবেন, কি কি অলঙ্কার এখন হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না। অপর নৌকা খানিতে তাঁহার সেই অনূঢ়া কন্যা শিশু ভ্রাতার সহিত ক্রীড়া ও কথাবার্ত্তা করিতেছে। বিনয়কুমারের নয়নদ্বয় আজ নিতান্ত অবাধ্য হইয়া সহস্র কথাবার্ত্তার মধ্যেও সেই বালিকার দিকে সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল "এ বালিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি জ্যোৎস্নাতেই নির্ম্মিত? নহিলে জ্যোৎস্নার সহিত এত মিলিয়া যাইবে কেন, এরূপ স্নিগ্ধ আভা নির্গত হইবে কেন; ইহার কণ্ঠধ্বনি কি বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় কৌশলে বাঁধা, নহিলে স্বর এত মিষ্ট হইবে কেন? চন্দ্রকরোজ্জ্বল স্বচ্ছ গঙ্গাসলিলের ন্যায় ইহার নয়নদ্বয়ে কি শীতল পবিত্র জ্যোতিঃ! বালিকা কি আমাকে দেখিতেছে? না, আমাকে দেখিবে কেন? না, ঐ যে দেখিতেছে, ভাইটিকে আদর করিয়া চুম্বন করিবার সময় ঐ যে সলজ্জভাবে আমার দিকে এক একবার তাকাইতেছে।"

এইরূপ সুখময়, আবেশময়, স্বপ্নময় চিন্তায় বিনয়কুমারের সময় অতিবাহিত হইল। নৌকা দুইখানি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া লাগিল। সকলে অবতরণ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

হরেন্দ্রনাথ বাবু বাসায় গিয়া গৃহিণীকে সহাস্যবদনে বলিলেন

"দেখিলে কেমন জামাই পছন্দ করিয়াছি"। গৃহিণী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন "শুধু পছন্দ করিলে আর কি হইবে, কাজে হয় তবেই না। তুমি যেমন গো, একটি পাত্রের আশা করিয়া আর কোথাও চেষ্টা করিলে না, মেয়ে অরক্ষিণী হয়ে উঠলো, এখন যদি ও পাত্রে বিয়ে না হয়, তবে উপায় কি বল দেখি।" হরেন্দ্র বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন "তোমার অত ভাবনা কেন, আর বিবাহ না হয়ে যায় কোথা, এ পরীর বাচ্ছা মেয়ে, একবার নিজের চক্ষে দেখে বিবাহে অসম্মত হয় এমন কোন্ পাত্র আছে"? গৃহিণী একটু হাসিয়া সগৌরবে সন্নিকটস্থা নিদ্রিতা কন্যার দিকে তাকাইলেন ও স্নেহভরে তাহার মুখাবরণকারী কেশগুচ্ছ হস্তে করিয়া সরাইয়া দিলেন।

বিনয়কুমারের মাতা বিনয়কুমারের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে তিনি আজ অধিক মনোযোগের সহিত শুনিলেন। ইহাতে বিনয়কুমারের মাতা যেন কিছু আশ্বস্তঃ হইলেন।

বিনয়কুমারের সে রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। বহুদিন পরে আজ সুখকল্পনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইল; ভাবিতে লাগিলেন, যে অপূর্ব্ব-মাধুরী রাশি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলেই তাহা পাইতে পারেন, তাঁহার পিতা মাতা সেই লাবণ্যপূর্ণ কন্যারত্নের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত। বিবাহ না করায় পিতা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, মাতা সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ; মাতাকে সন্তোষ করিবার জন্যও যদি তিনি বিবাহ করেন, তাঁহার ভবিষ্যৎজীবন কি সুখময় হইবে না?

এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আবার সুকুমারীর কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন "আমি যে সুকুমারীকে ভালবাসি বলিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছিলাম, এই কি আমার ভালবাসা,? আমি ত তবে নিশ্চয়ই কপটহৃদয়, আমি ত এরূপ প্রস্তাবে নিশ্চয়ই

সুকুমারীর অপমান করিয়াছি। সুকুমারীর জন্য কি আমার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের ভাব জন্মে নাই? আমি কি তাহার কেবল রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়াছিলাম? না, তা নহে। এখনও যে সুকুমারীর স্মৃতি মনে উদয় হইবামাত্র হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। তবে কেন এই নূতন বালিকাকে দেখিয়া আমার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল? সুকুমারীকে পাইবার আশা না থাকার জন্য কি? প্রেমে আসঙ্গলিপ্সা বলবতী করে সত্য। কিন্তু সে আসঙ্গলিপ্সা ত আত্মসুখের জন্য। এই আত্ম-সুখাশাবর্জ্জিত প্রেম কি হৃদয়ের উচ্চস্থান অধিকার করে না? সুকুমারীকে কি সেই উচ্চস্থানে বসাইয়া এই বালিকার প্রতি আমি অনুরক্ত হইতে পারি না? এই নবানুরাগ, কি আমার সুকুমারী প্রেমের অথবা সুকুমারিভক্তির বিরোধী হইবে?

এইরূপ মানসিক আন্দোলনে বিনয়কুমারের রাত্রি অতিবাহিত হইল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

পরদিন প্রাতঃকালে বিনয়কুমার তাহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের নিকট হইতে এই মর্ম্মে তারের সংবাদ পাইলেন—"পার যদি শীঘ্র কালনায় আসিয়া আমার সহিত দেখা কর, আমি বিপদাপন্ন।"

বিনয়কুমার বড় চিন্তিত হইলেন, এবং সত্বর মাতা সহ কাশী হইতে যাত্রা করিলেন। মাতাকে ভ্রাতা যোগেশচন্দ্রের নিকট রাখিয়া তিনি ত্বরায় কালনায় উপস্থিত হইলেন।

পাঠকের স্মরণ হইবে শ্রীশচন্দ্র কিছু দিন পূর্ব্বে কালনায় একটি মহাজনী কারবারে যোগ দিয়াছিলেন। সেই কারবারে তিনি বুদ্ধিবলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আশাতীত লাভ করেন, এবং গঙ্গাতীরে একটি রমণীয় উদ্যান সহ উৎকৃষ্ট অট্টালিকা খরিদ করিয়া বিরহবিমুখা সদাপ্রফুল্লা প্রেমবিহ্বলা হাস্যময়ী সরোজবালাকে তথায় আনয়ন করেন। সরোজবালা আসিয়া গৃহ সাজাইতে মনোনিবেশ করেন। খাট পালঙ্ক, আলনা আলমারী, বাক্স সিন্ধুক, চেয়ার টেবিল, তশবীর দেওয়লগিরি, ঝাড়লণ্ঠন, গালিচা তুলিচা প্রভৃতি নানা প্রকার নূতন রুচির অনুমোদিত দেশী বিলাতী দ্রব্যে ঘর পূর্ণ হইল। সরোজবালার খাইবার মাখিবার অবসর নাই, সেই সকল জিনিষ যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে দিন রাত ব্যস্ত। এ কাযের ভার সরোজবালা অপর কাহারও উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, অপর কাহারও সাজান তাঁহার পছন্দ হইত না। অনেক সুবিধা অসুবিধা ভাবিয়া, অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া, বিচার করিয়া তিনি ঘর সাজাইতেন। কায শীঘ্র ফুরাইতও না। আজ যে জিনিষটি যেখানে

রাখিয়াছেন, কাল একটু খুঁত বাহির হইলেই, সামান্য অসুবিধা বোধ হইলেই অমনি সেটি সরাইয়া অন্য স্থানে রাখিতেন। এইরূপে তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। একদিন শ্রীশচন্দ্র কতকগুলি দেশী বিলাতী, আধুনিক পৌরাণিক, চিত্রপট আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সরোজবালা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ ঘরে কোনটি রাখিব বল।" শ্রীশচন্দ্র তাড়াতাড়ি কয়েক খানা খুব জাঁকজমকওয়ালা ছবি উঠাইয়া বলিলেন, "এই কয়েক খানা শয়ন ঘরে রাখিবে।" ইহার মধ্যে দুই খানা হাবভাবশীলা কেশবিন্যাস কারিণী রমণীমূর্ত্তিও ছিল। সরোজবালা কিছু বলিলেন না, শ্রীশচন্দ্রের প্রতি একবার ভ্রূকুটি কটাক্ষ করিয়া একটু হাসিলেন। শ্রীশচন্দ্র বুঝিলেন তাঁহার পছন্দ সরোজবালার পছন্দ সই হইল না, কিন্তু আর কিছু না বলিয়া স্বকার্য্যে চলিয়া গেলেন। সরোজবালা তখন আপনার পছন্দসই ছবি বাছিলেন। শয়নকক্ষে মস্তকের দিকে রাখিলেন দিব্য এক হরগৌরী মূর্ত্তি, হরের অর্দ্ধাঙ্গে গৌরী প্রেম বিকসিত বদনে লজ্জানিমীলিত নেত্রে বসিয়া আছেন, সম্মুখে রাখিলেন রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি, রাধিকা কৃষ্ণের বাঁশরী কাড়িয়া লইয়া তাঁহার দিকে কৃত্রিম কোপকটাক্ষপাত করিতেছেন, কৃষ্ণ মিনতি করিয়া বাঁশরী ফিরিয়া চাহিতেছেন, দক্ষিণ পার্শ্বের দেওয়ালে রাখিলেন রাধিকার মানভঙ্গ চিত্র এবং বাম পার্শ্বের দেওয়ালে অন্নপূর্ণার নিকট ভিখারী শিবের অন্নভিক্ষার চিত্র।

সন্ধ্যার সময় শ্রীশচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া শয়নকক্ষের চিত্রগুলি দেখিয়া মনে মনে সরোজবালার বিচার শক্তির প্রশংসা করিলেন এবং হাসিয়া সরোজবালাকে বলিলেন "বাছিয়া বাছিয়া রমণীপ্রাধান্যের চিত্রগুলি পছন্দ করা হইয়াছে, তা এ অধীনকে আর চিত্র দ্বারা সে শিক্ষা দিতে হইবে না।" সরোজবালা উত্তর করিলেন রমণী প্রাধান্য বই পুরুষ প্রাধান্যের আবার ছবি আছে নাকি?

শ্রী। সে কি ?

স। কৈ এত যে ছবি আনিয়াছ তাহার মধ্যে পুরুষ প্রাধান্যের ছবি একখানা খুজিয়া বাহির কর দেখি ?

শ্রী। পুরুষের কি তবে প্রাধান্য নাই বলিতে চাও ?

স। থাকে যদি সে গায়ের জোরে, তার কি আবার চিত্র তুলিতে আছে ? যে পোড়াকপালে চিত্রকর এমন চিত্র তুলিবে, তাহার তুলিতে আগুন। কোমলের কাছে কঠোর পরাজিত, সেই না দেখিতে সুন্দর ! কঠোরের কাছে কোমল দলিত, সেত বিভৎস চিত্র। এই দেখ মানভঞ্জনের কত বর্ণনা, কত রকমের চিত্র ! রমণী পুরুষের পায়ে ধরে এমন চিত্র কখন দেখিয়াছ ? সে পুরুষই বা কেমন বর্ব্বর।

এই বলিতে বলিতে সরোজবালা শ্রীশচন্দ্রের চিবুক টিপিয়া দিলেন। শ্রীশ সরোজবালাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন "তবে এ বর্ব্বর কি এখনও সভ্য হয় নাই ?

সরোজবালা লজ্জায় নয়ন নিমীলন করিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন এখন আমার পছন্দ ছবি দুখানা কি করিলে, ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ না কি ?

স। কেন ? ভাঙ্গিব কেন ?

শ্রী। তবে দাও, আমি সে দুখানা বৈঠক খানায় রাখিব।

স। মেয়ের চিত্র বৈঠক খানায় ? সুপুরুষের চিত্র কি মেলে না ?

শ্রী। তোমার ভয় হইতেছে নাকি ?

স। আমার ভয় হউক আর নাই হউক, তোমারা যে জলিয়া সারা হবে।

শ্রী। চিত্র দুখানার উপরও এত দ্বেষ। সে গুলোত আর জিয়ন্ত নয়। তুমি কি সে দুখানা আগুনে জ্বালাবে ?

স। আগুনে জ্বালাব কেন, এই দেখ।

এই বলিয়া সরোজবালা শ্রীশচন্দ্রের হস্ত ধরিয়া নিজের বেশ গৃহে লইয়া গেলেন, এবং সেই দুই খানি রমণীচিত্র দেখাইয়া বলিলেন "এই দেখ রমণীর গৃহে রমণীর চিত্র থাকিবে, এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ; তেমনি পুরুষের ঘরে পুরুষের চিত্র থাকিবে, সেখানে রমণীর প্রবেশ নিষেধ।

শ্রী। সত্যি নাকি ? আমি যে তবে প্রবেশ করিলাম, এখন উপায় ?

সরোজবালা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন "তা হুকুম পাইলে কোন দোষ নাই।"

এইরূপ চিত্রপট সংস্থাপন হইতে উদ্যানের বৃক্ষ রোপণ পর্য্যন্ত গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য সরোজবালা স্বহস্তে করিতেন অথবা পর্য্যবেক্ষণাধীনে সম্পন্ন করাইতেন। সোদ্যান গৃহটি ও অল্পদিনের মধ্যে সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা ও আরামের আদর্শ নিকেতন হইল। শ্রীশচন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহার গৃহে বেড়াইতে আসিয়া ইহার শোভা ও ব্যবস্থাপারিপাট্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। শ্রীশচন্দ্রও সেই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু সকাশে সরোজ বালার প্রাণ ভরিয়া প্রশংসা করিতেন। এইরূপ শোভা সৌন্দর্য্যময় নিকেতনে পতি সঙ্গে বাস অপেক্ষা সরোজবালায় ও সাং[illegible]রক সুখের উচ্চাদর্শ আর কিছু থাকে নাই।

কিন্তু বিধির বিধান অতি নিগূঢ়, সুখের চরম হইলেই অনেক সময়ে বিপৎপাতের সূচনা হয়। অতি পরিশ্রমের পর সরোজবালার একদিন জ্বর হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই জ্বর বৃদ্ধি পাইয়া পীড়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না, কিন্তু পীড়ারও উপশম হইল না। এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রীশচন্দ্র সজলনয়নে ম্লানবদনে সরোজবালার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, সরোজবালা সঙ্কেতে পিপাসা জানাইল,একজন দাসী একটু জল

লইয়া তাঁহার মুখের কাছে ধরিল, সরোজ জলপান না করিয়া শ্রীশচন্দ্রের দিকে সতৃষ্ণ ভাবে তাকাইল। শ্রীশচন্দ্র তখন জলগেলাসটি নিজে ধরিলেন। সরোজবালা একটু পান করিয়া শ্রীশচন্দ্রের অঙ্কোপরি মস্তক স্থাপন করিলেন এবং যেন একটু সুস্থ হইয়া স্বামীর মুখের দিকে স্থির-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন এই ভাবে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির্গত হইল, সরোজবালা সুখের নিকেতন সাজাইয়া রাখিয়া তাহা ভোগ না করিয়া জন্মের মত ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর দেখিলেন সেই অপূর্ব্ব শোভাময় গৃহ বিকট রাক্ষসীর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার দিকে কটমট্ করিয়া চাহিয়া আছে। তিনি সেখানে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিলেন, এবং শোকের প্রথম কয়দিন বৃক্ষতলেই অতিবাহিত করিলেন।

সরোজবালার মৃত্যুর পর, অসহ্য মানসিক কষ্টের সময় শ্রীশচন্দ্র বিনয়কুমারকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ করেন। যখন বিনয়কুমার আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন শ্রীশচন্দ্র বৃক্ষতলাশ্রয়ে। বন্ধু দর্শনে তাঁহার শোকের উৎস উদ্বেলিত হইল, পুরাতন স্মৃতি জাগরিত হইতে লাগিল, তিনি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বিনয়কুমারেরও খর-ধারে অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল। তিনি বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমশঃ সান্ত্বনাও দিতে লাগিলেন। দুই এক দিন পরে বিনয়কুমার শ্রীশচন্দ্রকে কিছু দিনের জন্য কালনা হইতে গ্রামে লইয়া গেলেন।

চতুর্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুতে বন্ধুতে।

ইতিপূর্ব্বে বিনয়কুমারের চিন্তাস্রোত যে নূতন ধারায় প্রবাহিত হইতেছিল, এই দারুণ শোকাবহ ঘটনায় তাহার গতি ফিরিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এ কি, যে সংসারের সুখাশা আমার মনে কয় দিন হইতে ধিকি ধিকি করিয়া উদ্দীপিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কি এত অসার? এতই অস্থায়ী ও চঞ্চল? শ্রীশের অপেক্ষা এ সুখ কাহার ভাগ্যে অধিক ঘটে? আহা কি প্রেমময়ী স্ত্রীই শ্রীশ পাইয়াছিল, কি নিপুণা ও কার্য্যদক্ষা। এক স্ত্রী হইতে শ্রীশ সংসারের সকল সুখ, সকল আরাম সকল সুবিধা ভোগ করিয়াছে। আহা সেই বাল্যসহচরী, যৌবনসখী স্ত্রী কি সহসাই শ্রীশ হারাইল। শ্রীশের কি হৃদয়বিদারক কষ্টই না হইতেছে! এরূপ অস্থায়ী সুখের জন্য তবে আমি আমার হৃদয়কে কেন মুগ্ধ হইতে দিই? সুকুমারীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়া হৃদয়কে এক প্রকার বাঁধিয়া ছিলাম, সেই বাঁধনই কেন না অটুট রাখি। সুকুমারী বালিকা হইয়াও যদি ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর শাসন বক্ষ পাতিয়া লইতে পারে, আমি পুরুষ হইয়া, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভিমান রাখিয়া যদি তাহা না পারি, তবে কি লজ্জার বিষয় নহে। সুকুমারী যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, আর আমি সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব? ছিঃ কি দুর্ব্বলতা, কেন এরূপ ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিয়াছি, কেন সেই বালিকাকে দেখিয়া হৃদয়কে মুগ্ধ হইতে দিয়াছি, কেন চিরবিদূরিত সুখ-কল্পনাকে হৃদয়ে পুনর্জাগরিত হইতে দিয়াছি? আর এই ত সুখের পরিণাম? আমি যদি বিবাহ করি, সংসারসুখে মত্ত হই, কে জানে আমারও

ভাগ্যে এইরূপ না ঘটিতে পারে ? তবে আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম— "কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিব, সুখ কল্পনা আর মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে দিব না।"

সরোজবালা শ্রীশচন্দ্রের সহিত বাল্যে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তদবধি তাঁহার জীবন মধুময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কি গভীর প্রেমের স্রোতে দুইটি জীবন একটানায় ভাসিয়া যাইতেছিল। কত আমোদ আহ্লাদে, কত কৌতুক তামাসায়, কত উৎসব আনন্দে সে প্রেমের তরঙ্গ উছলিয়া উঠিত। সেই সকলের স্মৃতি বন্যার ন্যায় আজ শ্রীশচন্দ্রের হৃদয় মন প্লাবিত করিতে লাগিল। পূর্ব্ব সুখের পরিমাণ ও গভীরতা আজ কেবল দুঃখের পরিমাণ ও গভীরতাবর্দ্ধক হইল। যদি এরূপ না হইত, তাহা হইলে অনেক হতভাগ্যের জীবনেও সুখ দুঃখের জমা খরচ করিলে হয় ত সুখের ভাগ অধিক হইত। পুত্রের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি জনক জননীর বাস্তবিক সুখের দিন। কিন্তু সেই পুত্র যখন জনক জননীকে কাঁদাইয়া তাঁহাদের অগ্রেই ইহলোক ত্যাগ করেন, সেই সকল সুখের দিন কেবল শোকের গভীরতা বৃদ্ধি করে, জনক জননী তখন বিবাহাদি উৎসব কালীন ভুঞ্জীত বাস্তবিক সুখ ভুলিয়া যাইয়া সেরূপ পুত্রের অজন্ম বা শৈশব মৃত্যুই অধিক বাঞ্ছনাযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। শ্রীশচন্দ্রও আজ ভাবিতে লাগিলেন "আমি যদি বিবাহ না করিতাম, তাহা হইলে ত আর আমাকে এ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না, এরূপ সমস্ত শূন্য দেখিতে হইত না। আমি বিনয়কুমারের সহিত তর্ক করিতে করিতে অনেক সময় তাহাকে বিবাহ না করার জন্য দোষ দিয়াছি, এখন দেখিতেছি বিনয়কুমার বিবাহ না করিয়া ত ভালই করিয়াছে, বিনয়কুমারই ত সুবিবেচক, আমিই ত ভ্রান্ত, আমি যে সুখকে সংসারের সার বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছি, যাহাতে এতদিন ডুবিয়াছিলাম, তাহাত বাস্তবিকই

কিছু নয়, কেবল মোহজাল। ধর্ম্মোপদেশকের সংসার নিন্দায় আমি বিরক্ত হইতাম, তাহাদের উপদেশ উপহাস করিতাম ; এখন দেখিতেছি তাহাদের কথাই ত ঠিক। বিনয় প্রকৃতই জ্ঞানী, এ বিপদে তাহার উপরই নির্ভর করা উচিত।”

সরোজবালার মৃত্যুর পর এক দিন উপরিবর্ণিত মানসিক অবস্থায় উভয় বন্ধুতে বেড়াইতে বাহির হইলেন। তখন কালনা হইতে উভয়েই শ্রীশচন্দ্রদের গ্রামে আসিয়াছেন। পথে উভয়েই নীরব ও অধোবদন ; ক্রমে গ্রামপ্রান্তস্থ একটি পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইয়া এক অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। অস্তগমনোন্মুখী, সূর্য্যের লোহিতাভ কিরণচ্ছটায় প্রান্তরস্থ হরিদ্রাজি মনোহর উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছে, অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়া লম্বিত হইয়া পুষ্করিণীর মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এবং সুকৃষ্ণ সলিলরাশিকে আরও কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছে ; পুষ্করিণীতীর জনমানবশূন্য, কেবল কয়েকটি বক ধীরে ধীরে চারি ধারে বিচরণ করিতেছে ; বায়ু মৃদুমন্দ বহিতেছে, অশ্বত্থপত্র ঝির ঝির করিয়া দুলিতেছে। প্রকৃতির বাহ্যিক শোভায় কিন্তু বন্ধুদ্বয়ের কোন মনোযোগই নাই। শ্রীশচন্দ্র বসিয়াই একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শূন্যভাবে চারি দিকে তাকাইলেন, তাহার পর বিনয়কুমারের এক স্কন্ধে হস্ত ও মস্তক রাখিয়া বলিলেন, “ভাই বিনয়, আমি তোমার নিকট অপরাধী।” বিনয় চমকিত হইয়া শ্রীশচন্দ্রের দিকে তাকাইলেন। শ্রীশচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, “ভাই, আমি তোমাকে নিতান্ত সংসারানভিজ্ঞ বিবেচনা করিতাম, তোমাকে কত উপহাস করিতাম, এখন দেখিতেছি তুমিই প্রকৃত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তোমাকে আমি বিবাহ করিতে উপদেশ দিতাম এবং তুমি রাজি না হইলে তোমাকে নিতান্ত খেয়ালপ্রিয় অনভিজ্ঞ লোক বিবেচনা করিতাম। এ দোষ আমার মার্জ্জনা করিবে, আমিই দেখিতেছি নিতান্ত ভ্রান্ত ও মূঢ়, তোমারই

উপর এখন আমার সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস, বল ভাই, কিসে মন শান্ত হয়।"

বিনয়কুমার উত্তর করিলেন, "ভাই, অভিজ্ঞতার কথা ছাড়িয়া দাও, এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সংসারে কে আছে যে সকল বিপদ এড়াইয়া চলিতে পারে? তুমি যেরূপ বিপদে পড়িয়াছ, এ কি কোন প্রকার অভিজ্ঞতা-বলে কেহ এড়াইতে পারে? তোমার অবশ্য এখন মনে হইতেছে যে, বিবাহ না করাই অভিজ্ঞতার কায। প্রকৃতপক্ষে তাহা বটে কি না, ঠিক বলিতে পারি না। তবে আমি যে এতদিন বিবাহ করি নাই তাহা যে কখন বিবাহ করিব না এরূপ উদ্দেশ্য হইতে তাহা ত আর নহে। তবে আর তুমি আমাকে বিজ্ঞ বল কোন্ হিসাবে। আমার ত বিশ্বাস তুমি, বাস্তবিকই আমা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক সংসারাভিজ্ঞ। তবে সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ ভগবানের হাত। তিনি কৃপা করিলে নিতান্ত অহম্মুখও পরম সুখী হয়, আর তিনি বিমুখ হইলে পরম অভিজ্ঞ ব্যক্তিও ঘোর দুঃখে জীবন কাটায়।"

শ্রী। সংসারে সুখের এই অনিশ্চয়তা দেখিয়া সংসারী হইতে প্রবৃত্ত না হওয়া কি বিজ্ঞতার কায নহে? আমি সেই জন্যই তোমাকে বিজ্ঞ বলিতেছি।

বি। সংসারী হইতে প্রবৃত্ত না হওয়া বিজ্ঞতা কেন, অতি উচ্চ চিত্তের কার্য্য; কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার ভ্রম আছে। আমি কি বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে প্রয়াসী হই নাই? তবে ঘটনাক্রমে বিবাহ হইল না বলিয়াই বৈরাগী বা যাহা ইচ্ছা হয় বল। ইহাতে বিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। আর শ্রীশ, তোমাকে আমি আমার আজকালকার মানসিক অবস্থা কিছু বলি নাই, এ পর্য্যন্ত বলিবার অবসর পাই নাই। সুকুমারীর আশা যখন ছাড়িতে হইল, তখন মন কিছু দিনের জন্য নিতান্ত উদাস হইয়া গিয়াছিল, সংসার সমস্তই শূন্য

ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর অন্য এক সুরে মনকে বাঁধিলাম, সুকুমারীর চরিত্র-মাহাত্ম্য, তাঁহার সংসার-সুখে তাচ্ছিল্য ও ব্রহ্মচর্য্যে সুদৃঢ় অনুরাগ দেখিয়া, হৃদয়ে এক নূতন বলের আবির্ভাব হইল; ভাবিলাম, সুকুমারী রমণী হইয়াও যদি এরূপ মানসিক বলের অধিকারিণী হয়, তবে আমি পুরুষ হইয়া কি সে বল দেখাইতে পারিব না, যদি শত শত রমণী অকালবৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া যাবজ্জীবন পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে পারে, তবে একজন জ্ঞানাভিমানী, শিক্ষাভিমানী পুরুষ কি তাহা পারিবে না? প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হইলাম, মন শান্ত হইল। পিতামাতা বন্ধুবান্ধব সকলেই বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি স্থিরচিত্ত হইয়া রহিলাম। আমার বিবাহের জন্য কন্যাও স্থির হইয়াছিল—সুরূপা, সুশিক্ষিতা, সৎকুলজাতা। কন্যার আত্মীয়বর্গ ত উপরোধ অনুরোধের পরিসীমা রাখিল না। এমন কি আমার বিবাহ হয় নাই বলিয়া তাহারা এখনও সে কন্যাকে অবিবাহিত রাখিয়াছে। ঘটনাচক্রে যখন আমি কাশীতে মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া গিয়াছিলাম, একদিন রেলওয়ে ষ্টেসনে সেই বালিকাকে দেখি; এবং তাঁহার আত্মীয়দের অনুরোধে এক নৌকায় তাঁহাদের সহিত ষ্টেশন হইতে কাশীতে যাই। মানুষের মন দুর্ব্বল। সেই বালিকার [illegible] সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম, রূপের লালসা, দাম্পত্য সুখের পিপাসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল; বিশেষতঃ সেই বালিকার পিতা মাতা যে তাহাকে আমাকেই অর্পণ করিবার জন্য এত দিন রাখিয়াছে, এই ঘটনায় আমার মনে তাহার প্রতি হঠাৎ এক প্রকার মমত্বভাব জন্মাইল। এই মানসিক দ্বন্দ্বে আমি এত দূর বিচলিত হইলাম যে, অবশেষে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পরিহার করিয়া সেই বালিকাকে বিবাহ করাই স্থির করিলাম। মাতাঠাকুরাণীর অনুরোধও আমাকে এইরূপে মীমাংসায় উৎসাহিত করিল। এই মানসিক পরিবর্ত্তন আমি কিন্তু মনে

মনেই রাখিয়াছিলাম, তোমার নিকট এই প্রথম প্রকাশ করিতেছি। এমনি বিধিচক্র যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার অল্প সময় পরেই আমি তোমার টেলিগ্রাম পাইলাম। তখন কিন্তু তোমার এরূপ কোন বিপদের আশঙ্কা মনে উদয় হয় নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম তোমার কোন বৈষয়িক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। রাস্তায় মনে মনে ভাবিতে-ছিলাম যে, তুমি আমার এই মানসিক পরিবর্ত্তন অবগত হইলে ইহার ষোল আনা অনুমোদন করিবে; নানারূপ উপহাস বিদ্রূপেরও আশঙ্কা করিতেছিলাম। কিন্তু তোমার উপস্থিত বিপদ দেখিয়া মনুষ্যজীবনের সুখ দুঃখের এক নূতন অভিজ্ঞান জন্মিল,—সংসারের সুখ অসার, অনিত্য প্রভৃতি কথাগুলো এত দিন কথা মাত্রই ছিল, এখন তাহার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিলাম। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার হৃদয়ে নবাঙ্কুরিত সুখলালসা একবারেই শুখাইয়া গিয়াছে, আমি বিবাহ করি-বার বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছি, আমার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা আবার সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, আমি সেই মতই কার্য্য করিব।"

শ্রীশচন্দ্র বিনয়কুমারের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ছুটিতে লাগিল। তাহার পর বলিলেন, "বিনয়, আমি ত আর সংসারে থাকিব না; আর আমি সংসা-রের প্রায় সর্ব্বোচ্চ সুখের আস্বাদন পাইয়াছি; আস্বাদন পাইয়া যখন বঞ্চিত হইলাম, তখন আর আমার সংসারের দিকে কোন আকর্ষণই থাকিবে না। কিন্তু আমার দুঃখ দেখিয়া যদি ভাই তোমার নবাঙ্কুরিত সুখাকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইব। ভগ-বান্ তোমাকে সুখী করিতে পারেন। আমি বলি তুমি বিবাহ কর।"

বি। ভাই শ্রীশ, আর আমাকে ও কথা বলিও না; আমি যেরূপ মনকে দৃঢ় করিয়াছি, তাহাতে আর যে ইহা টলিবে এরূপ বিবেচনা হয় না। তবে সকলই ভগবানের ইচ্ছা।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর উভয় বন্ধুতে অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। শ্রীশ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভাই, তবে এখন আমাদের উপায়, আমাদের সময় কিসে ব্যাপৃত থাকে ?

বি। আমার বিবেচনায় কিছু দিন দেশভ্রমণে কাটান উচিত।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দেশভ্রমণ ও দীক্ষা।

বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্র সত্বর দেশভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

শ্রীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই বিনয়, যাইব কোথায়, কোথায় যাইলে প্রাণ একটু শীতল হইবে? বড় বড় সহর বাজারে ত আর যাইতে ইচ্ছা করে না, মানুষের বৈষয়িক ব্যাপার দেখিয়া ত আর এ সাংসারিক আগুনে দগ্ধ প্রাণে কোন আরাম পাওয়া যাইবে না।"

বি। পুরাতন ঐতিহাসিক সহর সকল দেখিতে যাই চল।

শ্রী। (একটু ভাবিয়া) ইতিহাসের স্মৃতি ত মনে ধোঁয়া ধোঁয়া হইয়া গিয়াছে, কোন বিশেষ বিষয় জানিবারও কৌতূহল নাই। মনের এরূপ অবস্থায় পুরাতন ঐতিহাসিক সহরে বেড়াইতে যাইয়া বিস্ময় বৃত্তির সামান্য একটু চরিতার্থতা ভিন্ন আর যে কিছু বিশেষ লাভ আছে তা ত বোধ হয় না। পুরাতন কীর্ত্তিরাশির ভগ্নস্তূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে ভাবিলাম, "আহা, কি সুন্দরই ছিল, এখন কি হইয়াছে।" একজন স্থানীয় পথিককে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় সে যাহা তাহা একটা মনগড়া বা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিল, তাহাই সম্বল করিয়া গৃহে ফিরিলাম। এরূপ ঐতিহাসিক সহর দর্শনে লাভ কি?

বি। তা ঠিক বলিয়াছ; আচ্ছা, তীর্থস্থান দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয়?

শ্রী। আপত্তি নাই; তবে ইহাও ভাই বলি, যাঁহারা সরল ভক্তি-চালিত হইয়া তীর্থস্থানে যান, তাঁহারা যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করেন, সেরূপ আমার পাইবার কোন আশা নাই। আমাদের ত ভাই শিক্ষা, দীক্ষা, বিশ্বাস সেরূপ নয়। তবে বলিতে পারি না তীর্থস্থানে প্রাণ কিরূপে শীতল হইবে।

বি। দেখ ভাই, প্রাণের শীতলতা বাহিরের কারণ অপেক্ষা ভিতরের কারণেই অধিক নির্ভর করে। যদি তুমি প্রাণের আগুন নিবাইবার জন্য মানসিক চেষ্টা না কর, তবে হিমালয়ের তুষারশীতল সুগভীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও অহরহ জ্বলিতে থাকিবে। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মানসিক চেষ্টার অনেক সহায়তা করে। চল আমরা প্রথমেই হরিদ্বার যাই। তাহাতে তীর্থ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন উভয়ই হইবে। বিশেষতঃ শুনিয়াছি অনেক প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসী হরিদ্বার অঞ্চলে থাকেন। এরূপ লোকের সঙ্গলাভে আমাদের উপস্থিত মানসিক অবস্থায় অনেক উপকার হইবে। আমরা অনেক সময়ে মনুষ্য অপেক্ষা প্রকৃতির উপর অধিক নির্ভর করিতে চাই। সত্য বটে অনেক সময়ে প্রস্তরখণ্ডও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে, বৃক্ষপত্র কথা কয়, পুষ্প হাসে, তটিনী করুণ গীতি গায়, কিন্তু প্রকৃত মানুষের মুখ দিয়া প্রকৃতি মাতা যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় কথা কন সেরূপ আর কোন বস্তু দ্বারা নয়।"

এই কথাবার্ত্তার পর উভয় বন্ধুতে হরিদ্বার অঞ্চলে যাওয়াই স্থির করিলেন, এবং পরামর্শ অচিরেই কার্য্যে পরিণত হইল।

সংসারে যখন সুসময় থাকে, সৌভাগ্যের মলয়হিল্লোল সুমধুর বহিতে থাকে, সুখের পর সুখের তরঙ্গ উঠিতে থাকে, তখন লোকে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনকে পাগলের কার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকে এবং তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সংসারের জালা ঝঞ্ঝাটে, শোকসন্তাপে, দুঃখ-নৈরাশ্যে, হিংসা দ্বেষে, অসত্যতা অকৃতজ্ঞতায় মন উত্যক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়, তখনই মানুষ বুঝিতে পারে সন্ন্যাসাশ্রম কি এবং কেন ইহা মানব সমাজে আবহমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্র সংসারে বিরক্ত হইয়া, শোক দুঃখ নৈরাশ্যে ভগ্নহৃদয় হইয়া আজ হরিদ্বার আসিয়াছেন ; তাঁহারা সেইজন্যই স্থানমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিলেন ; তথাকার নৈসর্গিক ধীর স্থির শান্তিময়

শোভা তাঁহাদের বিদগ্ধ চিত্তকে স্নিগ্ধ করিল। তাঁহারা হরিদ্বার ও তাহার নিকট ও নাতিদূরবর্ত্তী স্থান সকল দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখনও পর্ব্বতোপরি ভ্রমণে, কখন উত্তুঙ্গ তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গের সূর্য্যকিরণ-প্রতিফলিত শোভা দর্শনে, কখন ঘনশ্যামল উপত্যকাবাহিনী স্রোতস্বিনীর পবিত্র সলিলে স্নানে, কখন বা গিরিকন্দর-বাসী সাধু সন্ন্যাসিগণের সহিত, অথবা নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত যাত্রীগণের সহিত আলাপনে তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের সংসার বিস্মৃতি ও শান্তিপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সেই সন্ন্যাসিগণের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহাদের পথ অবলম্বনে স্পৃহা জন্মিতে লাগিল। তীব্র শোক ও নৈরাশ্যের পর তাঁহাদের নিশ্চিন্ত জীবন বড় সুখময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তাঁহারা সন্ন্যাসাবলম্বনে স্থির সঙ্কল্প হইলেন।

এক দিন প্রাতঃকালে উভয় বন্ধুতে জাহ্নবীর সুপবিত্র মূল ধারায় স্নানানন্তর পূতচিত্তে ভগবানের ধ্যান করিয়া একটি গিরিপথে ভ্রমণ করিতে গেলেন। কিছু দূর যাইয়া তাঁহারা এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যময় স্থানে উপনীত হইলেন; সেটি দুই অত্যুচ্চ গিরিমালার সঙ্গমস্থান; তাহার শীর্ষস্থল হইতে এক মধুর কল্লোলিনী নির্ঝরিণী ভূধরাঙ্গে রজত-ধারা বিকীর্ণ করিয়া একটি সমতল স্থলে পতিত হইতেছে; উৎক্ষিপ্ত ফেনকণা ও বারিশীকররাশি ব্যাপ্ত হওয়ায় সে স্থান কুজ্ঝটিকাময় বোধ হইতেছে; নির্ঝরিণীর দুই পার্শ্বে বিবিধ লতিকাজড়িত অত্যুচ্চ নিবিড় বিটপিশ্রেণী নির্ঝরিণীর সৌন্দর্য্যের সাক্ষী স্বরূপ অচলভাবে দণ্ডায়মান আছে। শ্রীশচন্দ্র ও বিনয়কুমার এস্থলে উপস্থিত হইয়া পুলকপূর্ণ কলেবরে দুই শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন এবং বিস্ময় বিভোর চিত্তে নির্ঝরিণীর উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; সেই নিবিড় নির্জ্জন গিরিজঙ্গলের মধ্যে আর কোন শব্দ নাই, কেবল সেই নির্ঝরিণীর সলিলপ্রপাতের অবিরাম কল্লোল; বিনয়কুমার ও

শ্রীশ মুগ্ধ হইয়া সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; থাকিতে থাকিতে দেখিতে পাইলেন এক অপূর্ব্বকান্তি দীর্ঘকায় যতিবেশধারী মহাপুরুষ নির্ঝরিণীর পার্শ্বস্থ তরুরাজির অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তিতে এরূপ সম্মানোদ্রেককারী ভাব বর্ত্তমান, যে তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে শ্রীশচন্দ্র ও বিনয়কুমার আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। যতিবেশধারী পুরুষ সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" বিনয়কুমার সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, "আমরা দুইটি হতভাগ্য সংসারবিরক্ত ভ্রমণকারী, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের জন্য ইচ্ছুক, এ পর্য্যন্ত অভিমত গুরু পাই নাই, বোধ করি ভগবান্ কৃপা করিয়া আজ এ অভাব মোচন করিলেন।

মহাপুরুষ। দেখিতেছি তোমরা দুইটি নবীন যুবক, তোমরা সংসার-বিরক্ত?

বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্র উভয়েই উত্তর করিলেন, "মহাত্মন্! আমরা প্রকৃতই সংসার-বিরক্ত।" মহাপুরুষ মৃদু হাস্য করিয়া তাঁহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং স্নেহভরে উভয় বন্ধুর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আইস আমার সঙ্গে।" মহাপুরুষ যে পথে নামিয়াছিলেন আবার সেই পথে পর্ব্বতোপরি উঠিতে লাগিলেন। বন্ধুদ্বয় তাঁহার অনুসরণ করিলেন। নির্ঝরিণীর মূলদেশ-সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড গুহায় মহাপুরুষের আশ্রম; এক বহিরাগত সুবিস্তৃত শিলাখণ্ড ছাদস্বরূপ হইয়া গুহার সম্মুখস্থ স্থানটিকে অতি সুন্দর আশ্রয়যোগ্য করিয়াছে; তাহার সম্মুখে অনেকটুকু সমতল ভূমি; তাহা নানাবিধ পার্ব্বতীয় তরু লতা পুষ্পে সজ্জিত; পরিচিত বৃক্ষের মধ্যে কেবল কয়েকটি বিল্ববৃক্ষ আছে। মধ্যে মধ্যে এক এক খানি আসন বা শয্যাযোগ্য মসৃণ শিলাখণ্ড। এ স্থানের শোভা অনির্ব্বচনীয়। এক দিকে দৃষ্টি

করিলে, কেবল বহুবিধ বনরাজিশোভিত, নিম্ন হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর পর্ব্বতমালা তরঙ্গমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, এবং এই গিরিতরঙ্গমালার ক্রোড়ে প্রকৃতিমাতার স্নেহধারাশোভিত বিশাল বক্ষ স্বরূপ, অসংখ্যতটিনীবিরাজিত স্নিগ্ধ শ্যামল সমতল ভূমি যেন কোন ভিন্ন জগতের ন্যায় অসীম প্রসারী হইয়া পতিত রহিয়াছে। অপর দিকে দৃষ্টি করিলে উচ্চ হইতে উচ্চতর তুষার-মণ্ডিত গিরিরাজি মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে এবং সেই গিরিতরঙ্গের শেষ সীমায় সর্ব্বদৃষ্টিরোধকারী অভ্রভেদী পর্ব্বতরাজ চিরহিমানীমণ্ডিতশিরে রবিকর প্রতিফলিত করিয়া গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান ;—যেন দেবাদিদেব মহাদেব আপনার বিরাটরূপ সেই তুষারধবল শুভ্র মূর্ত্তিতে প্রকট করতঃ অনন্ত সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া ধীর নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রকৃতি-দেবীর অনন্ত খেলা দর্শন করিতেছেন।

মহাপুরুষ বন্ধুদ্বয়কে এই স্থানে লইয়া সস্নেহভাবে দুই শিলাখণ্ডে বসিতে বলিলেন। এবং নিজেও তাঁহাদের সম্মুখে এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন। তাহার পর বন্ধুদ্বয়ের মুখে তাঁহাদের নিজ নিজ বৃত্তান্ত, তাঁহাদের সংসার-বৈরাগ্যের কারণ সমস্ত শুনিলেন। শুনিয়া স্নেহময় মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "বৎসদ্বয়, আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিই, তোমরা সংসারে ফিরিয়া যাও, উভয়ে আবার বিবাহ কর, গৃহধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সংসার প্রতিপালন কর, তোমরা সুখী হইবে।"

শ্রীশচন্দ্র ও বিনয়কুমার অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন, তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল ; ভাবিলেন, মহাপুরুষ তাঁহাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসাশ্রমের অনুপযুক্ত ভাবিয়াছেন, এবং সেইজন্যই এরূপ উপদেশ দিতেছেন। বিনয়কুমার ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্রের চিত্তপটে সংসারের দগ্ধ চিত্র সমুদিত হইয়া যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিষসিঞ্চিত করিতে লাগিল।

মহাপুরুষ উভয়ের মুখেই ক্লেশব্যঞ্জক ভাব দৃষ্টি করিয়া আবার বলিলেন, "দেখ, তোমরা সংসার ত্যাগ করিতে চাহ, কেন না তোমরা সংসারের সুখ পাইলে না, অভিলষিত পূর্ণ হইল না। কিন্তু দেখ, সকল আশ্রমেই এক এক অভিলষিত উদ্দেশ্য আছে। সন্ন্যাসাশ্রমের যে উদ্দেশ্য তাহা সংসারিকের সুখ অপেক্ষা কিছু স্বল্পায়াসলভ্য নহে এবং নিজায়ত্বও নহে, তাহাতেও পদে পদে ভগ্নমনোরথ হইতে হয়। যদি তোমরা তাহাতেও ভগ্নমনোরথ হও, তখন কি করিবে, তখন কোথায় যাইবে, আবার ত তখন ভগ্নহৃদয়ের বিষময় যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে ?"

বন্ধুদ্বয় নীরবে বিষন্নভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, যেন সকল দিকে শান্তির আশায় বঞ্চিত ভাবিয়া, অতি কাতর ভাবে, মহাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রভো, আমরা অতি দীন, নিরাশ্রয়, সংসারের ঝঞ্ঝাবাত প্রহারে বিনষ্টপ্রায় ; আমাদের এ দগ্ধ হৃদয়ে কি কিছুতেই আর শান্তির আশা নাই ? প্রভো, ভাগ্যবলে আমরা আজ আপনার শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করিয়াছি, আমরা এ আশ্রয় আর ত্যাগ করিব না, প্রভু আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দিউন।"

মহাপুরুষ দেখিলেন, উভয়বন্ধুর নয়নে বারিধারা বিগলিত। [illegible]ন সান্ত্বনাসূচক বাক্যে বলিলেন, "অধীর হইও না, তোমরা সুলক্ষণাক্রান্ত যুবক, ভগবান তোমাদের হাতে কিছু কাজ করাইয়া লইতে চান, এবং তোমরা তাহা করিবে, ও করিয়া কৃতার্থ হইবে এবং শান্তি পাইবে। তোমরা এই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি কর।"

বন্ধুদ্বয় প্রণত হইয়া মহাপুরুষের চরণরজঃ গ্রহণ করিলেন। মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাদের থাকিবার স্থান ও নিয়মাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্র সেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি প্রতিপালন

করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ও মহাপুরুষের উপদেশাদি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে মহাপুরুষ দুই বন্ধুকে দীক্ষিত করিলেন। অতি রমণীয় প্রাতঃকাল; বালারুণের কনককিরণজাল হিমাচলের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিফলিত হওয়ায় হিমানীস্তূপ হেমস্তূপবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। স্থানে স্থানে নানা বর্ণের নানাবিধ কুসুম বিকসিত হওয়ায় ভূধরগাত্র যেন সুকোমল বহুমূল্য কার্পেটাবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে; স্নিগ্ধ প্রভাত সমীরণ তাহাদের সুগন্ধ বহন করিয়া, গিরিবনরাজি ধীরে কাঁপাইয়া, মহাপুরুষের আশ্রমটিকে স্বর্গের ন্যায় সুগন্ধামোদিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই রমণীয় প্রাতঃকালে দুই বন্ধুতে অবিরামকল্লোলিনী নির্ঝরিণীর সর্ব্বারামপ্রদ সলিলে স্নান করিয়া পূতচিত্তে মহাপুরুষের নিকট দীক্ষিত হইলেন।

বন্ধুদ্বয়ের আজ অপার আনন্দ। তাঁহারা হৃদয়ে নূতন বল পাইয়াছেন, ত্রিলোক স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত দেখিতেছেন, প্রতি সমীরণ-স্পর্শে ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্পর্শ অনুভব করিতেছেন এবং উৎসাহ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে. বিনয়কুমার আজ একটি নিভৃত স্থানে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাঁহার জীবনের কয়েকটি দিনের কথা ও ভাব আজ হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। সে তিনটি দিন—এক দিন, যে দিন তিনি শৈশবে আপনাদের দীর্ঘিকা ঘাটে, সায়ংকালে বসিয়া এক অত্যুচ্চ তালবৃক্ষের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ভগবানের সর্ব্বাভিভবকারী অতিমহান্ সত্ত্বার অনুভূতি করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। আর এক দিন, যে দিন তিনি অত্যদ্ভুত স্বপ্নদর্শন করিয়া বিমুগ্ধ ও বিচলিত হইয়াছিলেন; আর এক দিন, যে দিন তিনি রোটাসগড়ে ভাবসমাধি-মগ্ন হইয়া ভগবতীর অভয়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার

পর সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে এই কয় পবিত্র দিনের ভাব ও স্মৃতি যেন তাঁহার হৃদয়ে ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছিল। আজ মহাপুরুষপ্রসাদে নবমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় সেই ভস্ম অপসারিত হইল, আবার পূর্ব্বের অগ্নি স্বীয় তেজে জলিয়া উঠিল। যে তিনটি দিনকে তিনি জীবনের তিনটি স্তম্ভস্বরূপ ভাবিয়াছিলেন, আজিকার দিনটি চতুর্থ স্তম্ভস্বরূপ হইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল, এবং এই স্তম্ভচতুষ্টয়ের উপর তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন স্থাপন করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরে নিভৃত স্থান হইতে উঠিয়া বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত প্রফুল্লমনে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন।

দীক্ষার কয়েক দিন পরে মহাপুরুষ বন্ধুদ্বয়কে সম্মুখে ডাকিয়া এক দিন বলিলেন, "দেখ, তোমাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছি, তাহাতে কর্ম্মবিহীন হইয়া এ স্থানে অধিক দিন অবস্থান, তোমাদের পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত নহে। তোমারা সংসার-বিরাগী হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বনের জন্য এ স্থানে আসিয়াছিলে। এখন তোমরা বুঝিয়াছ যে কর্ম্মত্যাগ প্রকৃত সন্ন্যাস নহে, কর্ম্মফলাশাত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। স্বার্থাভিসন্ধিবিযুক্ত হইয়া, আপনাকে ভগবানের নিয়োজিত যন্ত্রস্বরূপ ভাবিয়া, ফলাফলের জন্য তাঁহার ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া, ধীরভাবে কার্য্য সম্পাদনই প্রকৃষ্ট সন্ন্যাস। ভগবানের আদেশ কর্ম্ম করিতেই হইবে। শান্তিই যে বাঞ্ছনীয়, চাঞ্চল্য যে ত্যাজ্য, কে বলিল? চাঞ্চল্যের উপর বিরক্ত হইয়া যে শান্তি অন্বেষণ, তাহা যুক্ত নহে, এবং সে শান্তি শান্তিই নয়। চাঞ্চল্যের মধ্যে যে শান্তি তাহাই প্রকৃত শান্তি। এই সদাচঞ্চল বিশ্বের পাতা ও প্রসবিতা ভগবান্ সেইরূপ শান্তিরই আদর্শ। যদি সেরূপ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া কঠিন হয়, তবে তাহা বাস্তবিকই অতি কঠিন কার্য্য, তাহা সহজ করিবার কোন উপায় নাই। সে শান্তি অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না, কৌশল করিয়া মেলে না। সে শান্তি কেবল স্ব-স্ব-ধর্ম্ম-

প্রণোদিত কর্ত্তব্যসম্পাদনরূপ ভগবানের আদেশ পালনেই পাওয়া যায়। অনেক মহাপুরুষ লোকনিবাস ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মহাপ্রেম হৃদয়ে ধরিয়া, মহাতথ্য সকল অবগত হইবার জন্যই সেরূপ করেন। তাঁহারা লোকগুরু। কিন্তু সে প্রেম, সে ক্ষমতা যাহার নাই, তাহাদের সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা কেবল ভ্রান্তি অথবা ক্ষীণচিত্ততা বশতঃ। আমি সেরূপ সন্ন্যাসাশ্রম একবারে অনাবশ্যক বলি না। সংসারের ভগ্নমনোরথ ক্ষীণচিত্ত লোকের একটা অবলম্বন থাকা উচিত; এই সন্ন্যাসাশ্রম সেই অবলম্বন; ইহা তাহাদের পক্ষে একটি দ্বিতীয় সঙ্কীর্ণ সংসার। কিন্তু সে সঙ্কীর্ণ পন্থা তোমাদের পক্ষে নিতান্ত অযুক্ত। তোমরা কর্ম্মঠ উৎসাহশীল যুবক। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের হাতে ভগবানের অনেক কার্য্য সাধিত হউক। শ্রীশ, শোক একবারে ভুলিয়া যাও, বিনয়, ভগ্নাশাজনিত দুঃখ একবারে বিস্মৃত হও। তোমরা আর বিবাহ করিতে চাও না। নাই বা করিলে; বিবাহ না করিলেও ত সংসারে অনেক কার্য্য আছে। আর এরূপ অবস্থায় সংসারই ত তোমাদের প্রকৃত শক্তিপরীক্ষার স্থল। অতএব প্রফুল্লমনে সংসারের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হও। মহৎ কার্য্যের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিও না, বৃথা কথায় সময় অতিবাহিত করিও না। জীবনের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র কার্য্যগুলিকে তাচ্ছিল্য করিও না। সেগুলি যথোচিত ভাবে সম্পাদনই জীবনের মহাব্রত। তাহা করিতে পারিলে বড় কার্য্যের অবকাশ আপনা হইতেই আসিবে। ঐ দেখ সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমি বিশাল বক্ষঃ বিস্তার করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে! শান্তি, মুক্তি ভুলিয়া যাও। মুক্তি অনেক দূরের কথা। আশীর্ব্বাদ করি, জন্ম জন্ম এই পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া অগ্রসর হইতে

থাক। প্রস্তুত হও, ভগবান সখা হইয়া তোমাদের সহায়তা করিবেন।

বন্ধুদ্বয় সজল নয়নে গুরুদেবের উৎসাহোজ্জ্বল গম্ভীর বদনের দিকে একবার চাহিয়া তাঁহার নির্দ্দেশিত নিম্নস্থ সমতল ভূমির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" ভারতভূমি অসংখ্য প্রাণী বক্ষে ধরিয়া বাস্তবিকই যেন জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে স্নেহ মধুর আহ্বান করিতেছেন।

বন্ধুদ্বয় ভক্তিভরে গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরিশিষ্ট।

ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনী।

যখন আমরা জীবনের সদাসঙ্গী আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ও সদাদৃষ্ট পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, নদনদী প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়া পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে, কাল প্রবাহের একই ধারায় ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাই, তখন আমরা সেই কাল কি অসীম প্রভাবে, কি অশ্রান্ত গতিতে আমাদের মধ্যে অনুক্ষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে থাকে তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু যদি ঘটনা বশতঃ একবার কোন বিভিন্ন ধারায় তাড়িত হইয়া আবার সেই পূর্ব্বপরিচিতগণের সাক্ষাৎ লাভ করি, তখনই পরস্পরের মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া চমকিত হই, ও প্রকৃতরূপে কালমাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। ঐ দেখ বিদেশপ্রত্যাগত বালক স্বহস্তরোপিত ক্ষুদ্র তরুটিকে শাখাকাণ্ড-সমন্বিত সুবৃহৎ বৃক্ষে পরিণত দেখিয়া কত আনন্দিত; স্নেহপালিত ক্ষুদ্র সারমেয় শিশুটিকে বলিষ্ঠ ও বৃহদাকার দেখিয়া কত পুলকিত; শ্বশুরালয়-প্রত্যাগতা বালিকা শিশু সহোদরটিকে দুরন্ত বালকে পরিণত দেখিয়া কত উল্লাসিতা; বিরহক্লিষ্ট প্রবাসী যুবক গৃহপ্রত্যাগত হইয়া বালিকা পত্নীকে তরঙ্গভঙ্গময়ী কূলপ্লাবনী প্রাবৃট্‌প্রবাহিনীর ন্যায় পূর্ণাবয়বা লাবণ্যলীলাপূর্ণা যৌবনশ্রীসমুজ্জ্বলা দেখিয়া কত আনন্দিত। আজ যে

সহাস্য বদন সুন্দর যুবককে দেখিতেছ, কিছুকাল পরে হঠাৎ তাহাকে চিন্তাজীর্ণ শুষ্ক, জরাপলিতগ্রস্ত দেখিয়া কত বিস্মিত হইবে। আজ যে বন্ধু তোমার সমপথাবলম্বী, সমভাবানুপ্রাণিত, কিছু দিন পরে তাহাকে পদস্খলিত, বিপথানুসারী, ও বিপদমগ্ন দেখিয়া কত মর্ম্মাহত হইবে। যে বালিকাযুগল সাধের ক্রীড়াগৃহে আজ একাত্মা হইয়া আনন্দে খেলা করিতেছে, দশ বৎসর পরে হয়ত একজন সর্ব্ব-সৌভাগ্যশালিনী পতি-প্রণয়িণী গৃহিণী ও জননী, অপরা সর্ব্বসুখবঞ্চিতা ঘৃণিতা, উৎপীড়িতা আশ্রয়হীনা বিধবা; একজন হয় ত পুণ্যশালিনী ও সর্ব্বজনপূজিতা, অপরা বিপথগামিনী ও কুলকলঙ্কিনী।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে ঘটনাস্রোতের সহিত ভাসিয়া আসিয়াছি, তাহার পর, অর্থাৎ বিনয়কুমার ও শ্রীশচন্দ্রের দীক্ষার পর দশাধিক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পাঠক এখন কি সেই স্রোতবিতাড়িত ব্যক্তিগণের ভাগ্যচক্র কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইল জানিতে কৌতূহল বোধ করেন? কোন্ চিত্র দেখিতে চান? সেই হতভাগিনী সুখপ্রলোভিতা প্রতারিতা, সমাজশৃঙ্খলারূপ সুদৃঢ় শৈলে নিষ্পেষিত, সমাজ কলঙ্কের সুগভীর কূপে নিপতিতা বিনোদিনীকে দেখিতে কৌতূহল বোধ করেন? তবে দেখুন।

কলিকাতারূপ মহারণ্যের এক নিবিড় পল্লীমধ্যে ক্ষুদ্র একখানি দ্বিতল গৃহ। তাহার সিঁড়িদ্বারের চৌকাটের উপর নিম্নস্থ সোপানে পা ঝুলাইয়া, বস্ত্রাবৃত বদন অবনতভাবে জানুর মধ্যে লুকাইয়া, একটি ক্লিষ্টা, ক্ষীণা, বিষণ্ণা, ম্রিয়মাণা রমণী বসিয়া আছে। ঐ দেখ রমণী মস্তক উঠাইয়া একবার অশ্রুপ্লাবিত লোহিত লোচনদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া আকাশের দিকে উদাসভাবে চাহিয়া একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। এই না বিনোদিনী? গৃহখানি খাট পালঙ্ক, উত্তম শয্যা উপাধান, বিচিত্র

চিত্রপট, উজ্জ্বল পানপাত্র ও তাম্বুলাধার, মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। বিনোদিনী ত দাসীবৃত্তি করিবার জন্য কলিকাতা আসিয়াছিল, তাহার এ ঐশ্বর্য্য কিরূপে হইল! অবশ্য বিনোদিনীর ন্যায় রূপ-যৌবনসম্পন্না রমণীগণকে সহস্র অবস্থাবিপর্য্যয় সত্ত্বেও শীঘ্র বা অধিক দিন দাসীবৃত্তি করিতে হয় না। বিনোদিনী কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর গৃহে প্রথমতঃ দাসীরূপেই নিযুক্তা হইয়াছিল বটে। কিন্তু অল্প দিন পরেই তাহার ভাগ্যপটের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। সেই ধনীর গৃহে এক নবীন যুবক ছিল, সুশিক্ষিত, কোমল হৃদয়, কুসংস্কারবিদ্বেষী, সমাজে নবশৃঙ্খলা স্থাপনপ্রয়াসী। বিনোদিনীর ন্যায় বালিকা, বিধবা হইয়া দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে ইহা ভাবিয়া তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইল। যুবক বিনোদিনীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে এবং সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। বিনোদিনীও যুবকের ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে, পোষাক পরিচ্ছদে যত্ন করিতে, যথাসময়ে পানীয়াদি দিতে মনোযোগী থাকিত। অল্পদিন পরেই উভয়ের চিত্তেই প্রেমাগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তরলচিত্ত যুবক অচিরেই প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে বিনোদিনীকে বিবাহ করিবে। আর অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা-জর্জ্জরিতা বিনোদিনী,—সে যখন মূঢ়, কর্কশ, ক্রূর যোগেন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতে পারিয়াছিল, তখন যে এই কলিকাতার সুশিক্ষিত সভ্য সুদর্শন যুবককে অতি অল্পেই চিত্ত সমর্পণ করিবে তাহাতে আর বিস্ময় কি। বিনোদিনীর দাসীবৃত্তি আর যুবকের সহ্য হইল না। সে একটি পৃথক ঘর ভাড়া করিয়া গোপনে বিনোদিনীকে সেখানে লইয়া যাইয়া রাখিল। গৃহ সুসজ্জিত ও সকল প্রকার আরামের দ্রব্যে পূর্ণ হইল। এই নির্জ্জন নিবিরোধ স্থানে প্রণয়ী যুগলের প্রেম সত্বরই পরিপুষ্ট হইয়া আবর্ত্তময় তরঙ্গভঙ্গে উভয়ের হৃদয় প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল। এইবার বিনোদিনী জীবন সার্থক ভাবিল; আর সে ঘুঘুর

রবে কেবল হতাশ ক্রন্দন শুনিতে পায় না, এখন তাহা প্রেমপরিতৃপ্ত চিত্তের শান্ত সুন্দর মধুর উচ্ছ্বাস বলিয়া বোধ হয়; দক্ষিণানিল আর কেবল দেহ দাহ করে না, এখন তাহা চন্দনতরুবাহিত সুরভি শীতল মলয় হিল্লোল; সংসার আর জনশূন্য মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় না, এখন তাহা আত্মীয়জনপূর্ণ রম্য কানন। বিনোদিনীর চিত্তে সুখ কল্পনার পর সুখ কল্পনা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, আনন্দের পর আনন্দের ধারা ছুটিতে লাগিল।

এদিকে কিন্তু যুবকের পিতা যুবকের এই প্রেমবার্ত্তা অবগত হইয়া যুবককে এক দিন দুই ধমক দিলেন, এবং তাহার সত্বর বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অচিরেই কলিকাতার এক বড় ঘর হইতে যুবকের এক জাঁকাল সম্বন্ধ আসিল। দিন কয়েক ধরিয়া সকলেরই মুখে যুবকের ভাবি শ্বশুরদের প্রাসাদ তুল্য বাড়ী ঘর, অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া, অতুল সুখ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির গল্প চলিতে লাগিল। পিতার ধমকে ও এই সকল সুখ ঐশ্বর্য্যের গল্পে লঘুপ্রাণ যুবকের কল্পনা ভিন্নপথে ঘুরিতে লাগিল। তাহার পর এক দিন একখানি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সুরঞ্জিত সুগন্ধামোদিত সুন্দর লেফেপা যুবকের হাতে পড়িল। যুবক উৎফুল্ল চিত্তে তাহা খুলিল। খুলিয়া দেখিল এক বিচিত্রপত্রপুষ্পরাশির মধ্যে দণ্ডায়মানা, বিচিত্রবসনা সুন্দরী তন্বঙ্গী যৌবনারম্ভপদার্পিতা সুরবালাসমা কিশোরীর প্রতিমূর্ত্তি; তাহার বিম্বাধরস্ফুরিত হাসির জ্যোৎস্নায় সে চিত্র যেন আলোকিত; অপরাজিতা লতিকাগ্রভাগের ন্যায় বালিকা যেন আনন্দে চঞ্চলা অথচ আশ্রয়াভিলাষিণী। ইহাই যুবকের ভাবি-পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি। যুবকের মস্তক ঘুরিল, সে বিনোদিনীকে ভুলিল। ইহার কিছু দিন পরেই, এক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে, মহা ধূমধামে, বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে কলিকাতা নগরী প্রতিধ্বনিত করিয়া, শ্রেণীবদ্ধ সুদীর্ঘ আলোকমালায় রাজপথ উদ্ভাসিত করিয়া, অশ্বরথাদি সমন্বিত হইয়া,

নুপুরনিক্কণকারিণী নর্ত্তকীবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া, শোভনযানে উপবিষ্ট হইয়া, পুষ্পমালায় শোভিত হইয়া, সেই যুবক, বিনোদিনীরই গৃহের পাশ দিয়া বিবাহ করিতে চলিয়া গেল। বিনোদিনী তাহা বাতায়নে বসিয়া দেখিল, বুঝিল, তীব্র যাতনায় ছটফট করিল, যুবককে ধিক্কার দিল, পুরুষ মাত্রকে ধিক্কার দিল, নিজ জীবনকে শত ধিক্কার দিল এবং অবশেষে গৃহতলে পতিত হইয়া, হস্তে মুখ আবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর হইতে, বিনোদিনী মনুষ্যের মমতায়, জগতের ন্যায়-পরতায় একান্ত বিশ্বাস হারাইয়া পাপের পথে অসঙ্কোচে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সেই গৃহ বহু যুবকের সমাগম স্থান হইল।

এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। আজ বিনোদিনী এই পাপ পথের মহা সঙ্কটস্থানে উপনীতা। যাহারা এতদিন সরস প্রেমের কথায় তাহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের আজ কাহারও দেখা নাই। রমণী হৃদয়ের যে স্বাভাবিক ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, গভীর, ও মধুর জননীভাব, পাপ এবং সমাজভীতির নিষ্ঠুর প্ররোচনায় বিনোদিনী তাহা উৎপাটিত করিয়াছে, এবং সেইজন্য মধ্যে মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণানল তাহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিতেছে। সে নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক কার্য্যের চিত্র কল্পনায় উদিত হইবামাত্রই বিনোদিনী হস্ত দ্বারা চক্ষু আবরণ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে কি সে চিত্র অপসারিত হয়, হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে তাহা জাগিয়া উঠিতেছে।

এই অবস্থায় বিনোদিনী বসিয়া আছে এমন সময়ে কয়েকজন সসজ্জ পুলিস কর্ম্মচারী বিনোদিনীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী ভয়-বিহ্বলা হইয়া গৃহের মধ্যে লুকাইল। প্রধানতম পুলিস কর্ম্মচারী তাহার অনুসরণ করিয়া বলিল তুমি গর্ভের সন্তান নষ্ট করিয়াছ, কোথায় রাখিয়াছ দেখাইয়া দাও, নচেৎ এখনি তোমাকে গ্রেপ্তার করিব।

বিনোদিনী কোন উত্তর করিতে পারিল না ; বাতান্দোলিত অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে নয়নাসার বর্ষণ করিতে লাগিল।

পুলিস কর্ম্মচারী সজোরে গম্ভীর ভাবে বলিল "কাঁদিলে কি হইবে এখন, কাঁদিলে কি কাজ হয়, এখন উপায় কর।"

অতঃপর বিনোদিনীর পাপসঞ্চিত যাহা কিছু ছিল তাহার সদ্ব্যয়ে সে পুলিসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু এখন সে যায় কোথায়, খায় কি? জনকোলাহলপূর্ণা কলিকাতা নগরী এখন মরুভূমি অপেক্ষাও ভীষণ আশ্রয়হীন স্থান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ; সেখানকার মনুষ্য-গুলা সিংহশার্দ্দুল প্রভৃতি হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় চিন্তা করিতে করিতে বিনোদিনীর একবার স্বগ্রাম খানি মনে পড়িল, সেই শৈশবসঙ্গিণী-গণের আনন্দকল্লোলমুখরিত, প্রিয়জনসাদরসম্ভাষণপূরিত বাল্যলীলা-ভূমি মনে পড়িল। আহা সে কি সুখের, শান্তির স্থান, কি শীতল, শ্যামতরুচ্ছায়া, কি সুমিষ্ট স্বচ্ছ দীর্ঘিকাসলিল, কি শান্তিময় পবিত্র কুটীর রাজি, প্রতিবেশীগণের কি সস্নেহ সম্ভাষণ। আহা সেখানে যে কেহই পর থাকে নাই ; কেহ বা মা বলিত, কেহ দিদি বলিত, কেহ ঠাকুরঝী বলিত, কেহ বা আদর করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিত। বিনোদিনী এ সমস্তই মনে পড়িল, অজস্র নয়নজল বর্ষণ করিল, এবং অবশেষে ভাগীরথী সলিলে স্নান করিয়া, পাপ কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রুগ্নদেহে ভগ্নহৃদয়ে স্বগ্রামার্থ যাত্রা করিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুকুমারী।

সুকুমারী এখন রামনগর গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুরাতন শক্রুদ্বয়—রামনগরের সেই যোগেন্দ্র বিশ্বাস ও খোকাবাবু,—এখন বিনষ্ট। খোকাবাবু বাস্তবিকই সর্ব্বস্ব হারাইয়া, ভগ্নহৃদয় হইয়া, কিছু দিন পথের ভিখারীর ন্যায় পরান্নপ্রত্যাশী হইয়া, অবশেষে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তাহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু এখনও জীবিত থাকিয়া, ভগ্ন ইষ্টকস্তূপের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি কুটীরে, কাঁদিতে কাঁদিতে দিনাতিপাত করিতেছেন। দেবতা ব্রাহ্মণের অভিশাপেই এইরূপ ঘটিয়াছে ভাবিয়া তিনি এখনও দেবপ্রীত্যর্থ প্রতিদিন ভক্তি সহকারে ফুলজল দিয়া পূজা করেন এবং সুকুমারীকে দেখিলেই তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া, অপরাধির ন্যায় কাঁদিতে থাকেন; সুকুমারীও গভীর মনোবেদনার অশ্রুধারা বর্ষণ করেন ও বৃদ্ধার প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করেন। যোগেন্দ্র বিশ্বাস অনেক মোকদ্দমায় এড়াইয়া অবশেষে একটি জালের মোকদ্দমায় চৌদ্দ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডিত হইয়াছে; গ্রামে তাহার ভিটায় এখন আর কেহ নাই।

সুকুমারী এখন পরমোৎসাহে, বিমল আনন্দে, ভাই শরৎকে ও গোপালচন্দ্রকে লইয়া সংসারযাত্রা অতিবাহিত করিতেছেন। শরচ্চন্দ্র এখন বিএ পাশ করিয়া কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছে, এবং বিনয়কুমারের

ভ্রাতষ্পুত্রী যোগেশবাবুর কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে।

আজ সুকুমারীর জগদ্ধাত্রী পূজা। যে চণ্ডীমণ্ডপ বিনয়কুমার এক-দিন জনমানবশূন্য, পরিত্যক্ত, অনাচ্ছাদিত ও ছাগমেষাদির মলে পূর্ণ দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা পুনঃসংস্কৃত, রঞ্জিতও সুসজ্জিত হইয়া জগ-দ্ধাত্রী প্রতিমা বক্ষে ধারণপূর্ব্বক আনন্দে হাসিতেছে। ব্রাহ্মণের মন্ত্রো-চ্চারণধ্বনি, বালক বালিকার কণ্ঠধ্বনি ও নানাবিধ বাদ্যধ্বনিতে আজ সে স্থান মহোল্লাসময়। আরতির সময় ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান হইয়া বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তে দেবীর মুখমণ্ডলের নিকট পঞ্চপ্রদীপ ঘুরাইতেছে, আর পট্টাম্বরা গললগ্নীকৃতবাসা সুকুমারী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভক্তিগদ্গদ ভাবে দেবীর সেই উজ্জ্বলীকৃত রাগরঞ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া চামর ব্যজন করিতেছেন। শরচ্চন্দ্র একটি বৃহৎ পেটা ঘড়ি এক হস্তে ঝুলাইয়া তালে তালে বাজাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে মণ্ডপপার্শ্বস্থ কুঠারীর দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা এক শোভনবসনা ধূনাধূমে কৃতরক্তিমনয়না আরতিদর্শনকুতূহলা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনশালিনী বালিকার নবনলিনীদলসম চলচল সুকোমল মুখখানির দিকে সলজ্জ সংক্ষেপ দৃষ্টি বর্ষণ করিতেছে, এবং যেই নয়নে নয়নে মিলন হইতেছে, অমনি মস্তক অবনত করিতেছে। সুকুমারী একবার এ দৃশ্য দর্শন করিলেন, আনন্দে দেহ পুলকপূর্ণ হইল, নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, ভক্তিভরে স্বগতভাবে বলিলেন "মা বিপদতারিণী এমন দিন যে আমাকে দেবেন, তাহা কখন মনে ভাবি নাই, মা সর্ব্বমঙ্গলে, আমার শরতের সমস্ত মঙ্গল কর মা।" এই বলিয়া সুকুমারী দেবীকে প্রণাম করিলেন।

আজ পূজার লোক খাওয়ান। সুকুমারী আশৈশব লোক জন খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। নিজজননী হইতেই তিনি এ প্রকৃতি

াইয়াছিলেন। আজ তাঁহার নিজের জগদ্ধাত্রীপূজার লোক খাও-
ান,—তিনি অতি যত্নে গ্রামের গৃহিণীগণের সাহায্যে নানাবিধ উপাদেয়
ভাজ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়াছেন; প্রথম বৎসরের পূজা, গ্রামের ক্ষুদ্র
হৎ, উচ্চ নীচ, পুরুষ রমণী, বালক বালিকা সকলেই নিমন্ত্রিত।
সুকুমারীদের ভিতরবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী ও বৈঠকখানাবাড়ী তিন বাড়ী-
তেই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া লোক বসিয়াছে; গোপালচন্দ্র আজ কোমরে
গামছা বান্ধিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে মহানন্দে পরিবেশন করিতেছেন;
শরচ্চন্দ্রও তাঁহাকে যথাশক্তি সাহায্য করিতেছেন; আর সুকুমারী
মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার ন্যায় স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি বাহির করিয়া দিতেছেন।
যে দিকে তিনি থাল হস্তে যাইতেছেন, লোকে বলাবলি করিতেছে
"আহা যেন স্বয়ং মা জগদ্ধাত্রী গরিব দুঃখীকে অন্ন বিতরণ করিবার
জন্য মণ্ডপ হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন।"

মধ্যে একটি গোল বাধিল। আমরা ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি
বিনোদিনী গ্রামে আসিয়াছে। উদারচিত্তা সুকুমারী তাহাকেও নিম-
ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রমণীগণের ভোজন কালে বিনোদিনী যখন আসিয়া
উপস্থিত হইল, কয়েক জন নবীনা প্রবীণা একান্তে মিলিয়া কিছু চক্ষু
টেপাটিপী ও গুপ্ত পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত করিল যে বিনোদিনীর সহিত
তাহারা একস্থানে আহারে বসিবে না। এ সিদ্ধান্ত কিন্তু গুপ্ত রহিল না।
অতি শীঘ্রই সমস্ত মেয়ে মহলে প্রচার হইয়া গেল। বিনোদিনীর বৃদ্ধা
জননীর কর্ণে একথা উঠিল। বৃদ্ধা বড় সহজে পরাস্ত হইবার লোক ছিল
না, আহারকালে "আয়গো বিনু এই দিকে বসিগে আয়" বলিয়া
বিনোদিনীকে লইয়া সেই ষড়যন্ত্রকারিণী রমণীগণের পার্শ্বে যাইয়া
বসিল। ষড়যন্ত্রকারিণীগণের মধ্যে কয়েকজন কিছু না বলিয়া, কিন্তু
মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেল, এবং খিড়কীর ঘাটে এক মহা গণ্ডগোল
বাধাইয়া তুলিল। একজন প্রবীণা বলিল, "ছি ছিঃ, মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখ,

আমরা কয়টা রাঢ়ী মানুষ একটু এক পাশে বসিলাম, তা কিনা গুণের মেয়েকে ডেকে নিয়ে গা ঘেঁসে এসে বসা হল, আমি তা কিন্তু ওর সঙ্গে বসে কখনই খাব না।" একজন নবীনা কিছু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল "তাই বটে মা, গা যেন কেমন করে; মাগো কত মুলুক মজিয়ে এল, কলকাতা মজিয়ে এল, এখন আবার সতী সাধ্বী হয়ে পাঁচ জনের একজন হ'তে আসে; বুড়ী মাগীর আবার কি তেজ গো।" কথা সুকুমারীর কাণে উঠিল। খিড়কীর ঘাটে এইরূপ সক্রোধ সমালোচনা চলিতেছে, সেই সময় সুকুমারী অতি অপ্রতিভ ভাবে নিরতিশয় বিনয়ের সহিত ক্রোধোন্মত্তাগণকে বলিলেন "তোমরা মা রাগ করিও না, আমি না হয় বিনোদিনীকে গোপনে বলিয়া তাহাকে একটু আড়ালে বসাইব।" সুকুমারী এই কথা বলিতেছেন এমন সময় বিনোদিনীর মাতা নিঃশব্দে পশ্চাতে আসিয়া বাঘিনীর ন্যায় হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল "কেন বিনোদিনী আড়ালে বসিবে, সে ত আর পেট ধুয়ে তোমার বাড়ী খেতে আসে নাই, ছিঃ নেমন্তন্ন করে এত অপমান, লজ্জায় মরে যাই।" এই বলিয়া বৃদ্ধা একটু চক্ষের জল ফেলিল; আবার তৎক্ষণাৎ সে জল মুছিয়া, পুনরায় রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল "আর লোকেরই কি অন্যায়, আমরণ, আমার মেয়েকে লয়ে খে তোমাদের আপত্তি, আর এ দিকে কার বাড়ীতে খেতে এসেচিস্ তা মনে নাই, সুকুমারীও কি সাতমুলুক মজিয়ে, কত সাহেব বাবু মজিয়ে, আইন আদালতে পর্য্যন্ত ঢাক বাজিয়ে, আসে নাই? তাতে দোষ নাই! তা থাকবে কেন, আজ তাহার ধন হয়েচে কি না। তা হোগ্ গো হো'গ।" এই পর্য্যন্ত বলিবার পর বৃদ্ধার চক্ষে আবার একটু জল দেখা দিল। সুকুমারী মাটির মানুষের ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময়ে একটি সুপ্রবীণা, সকলের সম্মানভাজনা বিধবা রমণী আসিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকার দীর্ঘ,

বর্ণ গৌর, নয়নদ্বয় স্নেহব্যঞ্জক, ভ্রূ ও ওষ্ঠাধর দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক এবং বয়ো মাহাত্ম্যে মুখভাব বিশেষ গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। একটু পরিচয় দিলেই পাঠক ইহাঁকে চিনিতে পারিবেন। ইনি বিনয়কুমারের বিমলা দিদি। বিনয়-কুমারের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত শরচ্চন্দ্রের বিবাহ হওয়ায়, সেই কুটুম্বিতা সূত্রে তিনি সুকুমারীর বাড়ী জগদ্ধাত্রী পূজোপলক্ষে আসিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই জানি তিনি বড় গুণদর্শিনী। সুকুমারীর মধুর চরিত্রে ও ধর্ম্মপ্রাণতায় তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে সুকুমারীকে আপনার কন্যার অধিক ভাবিয়া তাঁহার বাড়ীতে কার্য্য করিতেছেন। তিনি খিড়কীর ঘাটে আসিয়া গণ্ডগোলকারিণীগণকে সম্বোধন করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন "হাঁগো গ্রামের মেয়েরা, তোমাদের কিরূপ আক্কেল, ব্রাহ্মণের মেয়ে, কত কষ্টে একটি কায করিয়াছে, তা তোমরা কি পাঁচ জনে মিলিয়া এইরূপে সেটিকে পণ্ড করিবে? ছিঃ, ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এর সঙ্গে খাব, ওর সঙ্গে খাবনা, এরূপ কো'ট করা কি উচিত? এখানে বিনোদিনী ত আর রাঁধিতে আসে নাই, যে এত গোলমাল; যখন তোমাদের আপনাদের মধ্যে যজ্ঞিজ্জালা হবে, তখন এ বিচার করিও। আজ বাপু তোমাদের সকলকে এক সঙ্গে ভালমনে বসে খাইয়া যেতে হবে। আহা দেখ দেখি একবার সুকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়ে।" বাস্তবিকই এই গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায় সুকুমারীর মুখে এরূপ কাতর ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যে তাহা দেখিলে সকলেরই মন দ্রবীভূত হয়। যাহারা বিনোদিনীর সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহারে আপত্তি করিতেছিল, তাহারা শেষোক্ত প্রবীণার কথাই যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিয়া, অবশেষে তাহাতে সম্মত হইল, এবং নিজ নিজ মতের সম্মান রক্ষার্থ মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল যে তাহারা বিনোদিনীর স্বহস্ত পচিত বা স্পৃষ্ট দ্রব্য কখনও ভক্ষণ করিবে না। বিনোদিনীর মাতা কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল "যদি যজ্ঞি বাড়ীতে বিনোদিনী

ডালের হাঁড়িতে কাটি না দেয়, আর সেই ডাল তোমরা নাকচুবড়ে না খাও, তবে আমার নামই মিথ্যা।"

ফলতঃ কালে ঘটিলও তাহাই। বিনোদিনী সমাজে বেশ চল হইয়া গেল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনয়কুমার, শ্রীশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র।

সুকুমারীর জগদ্ধাত্রী পূজায় বিনয়কুমার, শ্রীশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র সকলেই নিমন্ত্রিত। বিনয়কুমার ও যোগেশচন্দ্র এখন সুকুমারীর পরম আত্মীয়। শ্রীশচন্দ্রও তদ্রূপ। সকলে দিবাভাগে কাযকর্ম্মের তত্ত্ব-তল্লাসাদি করিয়া সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতে-ছেন। পূজায় অনাহূত অভ্যাগত অনেক লোক আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে ভিখারী বৈষ্ণব বৈষ্ণবীই অধিক। ইহারাও সকলে আদর অভ্যর্থনায় পরিতুষ্ট হইয়া পানভোজন করিল। সন্ধ্যার সময় একজন সুগায়িকা বৈষ্ণবী সমাগত ব্যক্তিগণের সন্তোষার্থ কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় ভাবপূর্ণ মধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিল। তাহার বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে মধ্যে মধ্যে নিজের খাদ্‌সুরে সেই গীতের পুনরাবৃত্তি করিয়া বৈষ্ণবীর বামাকণ্ঠের মাধুর্য্য স্ফুটতর করিতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে। বিনয়কুমারও শুনিতেছেন; কিন্তু তাঁহার মন সে গীতের রসাস্বাদনে নিযুক্ত না থাকিয়া গায়িকার জীবনবৃত্তান্তের অনু-ধ্যানে মগ্ন। এই গায়িকা যে সৎকুলজাতা, কিন্তু অকালবৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া স্খলিতচরণ হওয়ায় শেষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই ভাবে জীবন কাটাইতেছে, এ বৃত্তান্ত তিনি ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। আবার আজ দুই প্রহরের সময় বিনোদিনীকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে গ্রামের স্ত্রীলোকগণ যে আন্দোলন তুলিয়াছিল তাহাও তিনি জানিতে

পারিয়াছিলেন। বিনোদিনীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, এবং যে যোগেন্দ্র বিশ্বাস সুকুমারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছিল, সেই যে বিনোদিনীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল, তাহাও শুনিয়াছিলেন। এখন তিনি মনে মনে এই দুইটি রমণীর অবস্থার তুলনা করিতেছিলেন ও গভীর মনোবেদনা অনুভব করিতেছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার সুকুমারীর বিদ্যুন্নিভ ধর্ম্মোজ্জ্বল মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় দেশ আলোকিত করিয়া উদিত হইতেছিল। সেই আলোকে কিন্তু অপর দুই রমণীর চিত্র অতিশয় মলিন, অতিশয় ঘৃণ্য বোধ হইতেছিল। বিনয়কুমার আন্দোলিতচিত্ত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিলেন এবং মণ্ডপসম্মুখস্থ ময়দানে পদচারণ করিতে লাগিলেন। হিমভারাক্রান্ত হৈমন্তিক জ্যোৎস্না নীহারশীতল রজত ধারায় প্রকৃতিকে মৃদুল স্পর্শে স্নান করাইয়া দিতেছে। চিত্তবেগতপ্ত বিনয়কুমারও সেই স্নিগ্ধ কৌমুদীধারায় অনেকটা শীতল হইলেন। তিনি একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; কিছুক্ষণ সেই ভাবে রহিলেন। যখন মস্তক অবনত করিলেন, দেখিলেন এক শীর্ণা বিশীর্ণা রমণী তাঁহার দিকে আসিয়া, একবার থমকিয়া দাড়াইল, তীব্র ভাবে তাঁহার দিকে একবার তাকাইল ও তৎপরে আপন পথে চলিয়া গেল। বিনয়কুমার একটু শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিতে লাগিলেন "এ কি দেখিলাম, এ কি রমণী মূর্ত্তি, না বিষাদময়ী হতাশা মূর্ত্তিমতী হইয়া আপনার শূন্য প্রাণ জগৎকে দেখাইয়া বেড়াইতেছে! এই না বিনোদিনী, যাহাকে লইয়া আহার করিতে আজ এত আন্দোলন হইয়াছিল? কি কষ্টকর দৃশ্য, যেন মৃত্যুর ছায়া! অসংযত চিত্তের কি ভয়ানক পরিণাম! ভগবান্ দুর্ব্বল মানবকে সংযম শক্তি প্রদান কর।" এইরূপ ভাবিয়া বিনয়কুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার পদচারণ করিতে লাগিলেন। সংযমশক্তির পূর্ণবিকাশ সমূর্ত্ত পুণ্যের ন্যায় সুকুমারীর দেবীমূর্ত্তি তাহার নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত

হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "কি ঘোর পার্থক্য, বিনোদিনীর মূর্ত্তি ও সুকুমারীর মূর্ত্তিতে কি ঘোর পার্থক্য! কিংবা কেনই না হইবে, যে দুই বস্তু আদৌ পৃথক, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কেন না হইবে! বিনোদিনী ও সুকুমারী কি এক? যে নিয়ম সুকুমারী-গণের পক্ষে খাটিবে, তাহা বিনোদিনীগণের পক্ষে খাটিবে কেন? সে শাসন বিড়ম্বনা মাত্র যাহা এরূপ দুই পৃথক্ বস্তুকে এক নিয়মাধীন করিতে চায়। আমাদের হিন্দুধর্ম্ম ত কথায় কথায় অধিকারী অনধি-কারীর ভেদ করিয়া থাকে, কিন্তু তবে বিধবা মাত্রকেই সমান অধিকারী বিবেচনা করিয়া একরূপ বিধান করিয়াছে কেন? ইহা কি যথার্থই শাস্ত্রের নিদেশ, না কপট জাত্যভিমানসঞ্জাত নিষ্ঠুর দেশাচার? এরূপ বিধানে সমাজের লাভই বা কি। এ বিধান বলে কি বিনোদিনী কখন সুকুমারীতে পরিণত হইতে পারে? অসম্ভব। এই ত বিনোদিনী অকথা কলঙ্ককালিমা মাখিয়া আসিয়া আবার সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সকলে তাহা জানিতেছে, বুঝিতেছে। অথচ কিছুকাল মধ্যে স্বাভাবিক সহানুভূতি বলে সমাজে যে সে স্থান পাইবে তাহাও নিশ্চয়; তবে জানিয়াও চক্ষু বুজিয়া এ কলঙ্কস্রোত প্রবাহিত হইতে দেওয়া, কোন প্রকার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা না করা, কি সমাজের প্রাণহীনতা, হৃদয়হীনতা ও কপটতার ফল নহে?

বিনয়কুমার এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বেড়াইতেছেন। তখনও বৈঠকখানায় বৈষ্ণবীর গান চলিতেছে। বৈষ্ণবী কীর্ত্তনের সুরে একটি মধুর ভাবপূর্ণ পদ গাইতেছে।

সেই সুমিষ্ট স্বর বিনয়কুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিনয়কুমার বৈঠকখানায় ফিরিলেন। দেখিলেন সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে, বৈষ্ণবী মুগ্ধ হইয়া গাহিতেছে, তাহার দুই চক্ষে ধারা বহিতেছে। তাহার মুখে তৃপ্তি ও শান্তির ভাব বিরাজ করিতেছে। বিনয়কুমার স্থির

হইয়া বৈষ্ণবীর কীর্ত্তন অনেকক্ষণ শুনিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মনো-যোগের সহিত শুনিলেন এবং তিনিও মুগ্ধ হইলেন। এই বৈষ্ণবীর সহিত বিনোদিনীর অবস্থা তুলনা করিয়া তাঁহার মনে একটি নূতন চিন্তা স্রোত প্রবাহিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এই বৈষ্ণবী কি বিনোদিনী অপেক্ষা সুখী নহে? কৈ ইহার মুখে ত হৃদয়রুধিরশোষণ-কারী নিষ্ঠুর নিরাশার করাল ছায়া বর্ত্তমান নাই; ইহার নয়ন হইতে ত ঈর্ষা হলাহল ক্ষরিত হয় না, ইহার দৃষ্টিতে ত কিছুমাত্র অতৃপ্তিব্যঞ্জক শূন্যতা লক্ষিত হয় না? ইহার তৃপ্তি কি তবে পাপের তৃপ্তি। তাত বোধ হয় না। পাপের তৃপ্তিতে কি শান্তি আছে? এ বৈষ্ণবীর মুখে যে বেশ শান্তির ভাব বিরাজ করিতেছে। আহা এই যে বৈষ্ণবীর নয়নে ধারা বহিতেছে।" বাস্তবিকই বৈষ্ণবী তখন গাহিতেছে,

পতিত পাবন হরি, ত্যজনা পাতকী জনে,
কৃপার সাগর তুমি, স্থান দিও ঐ শ্রীচরণে।

আর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে।

উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বিনয়কুমারের বৈঠকখানা।

বিনয়কুমার, শ্রীশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র সুকুমারীদের বাড়ী হইতে দুই দিন হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বিনয়কুমার এখন বিষয়কার্য্যে ব্রতী। যে বৈঠকখানায় আমরা এক দিন তাঁহাকে ভগ্নহৃদয়ে মলিনমুখে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা আবার সজীব উৎফুল্ল ভাব ধারণ করিয়াছে। অতি প্রত্যূষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে অবিরাম লোকস্রোত প্রবাহিত। কর্ম্মচারী, প্রজা, প্রার্থী, উপদেশাপেক্ষী, আলাপলিপ্সু প্রভৃতি নানা লোক নানা উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসিতেছে। তিনি সকলকে সদয়, বিনীত ও ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহারে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত স্নানাহারের সময় ভিন্ন তাঁহার আর মুহূর্ত্তমাত্র কার্য্যের বিরাম নাই। তিনি নিজের সুবিস্তৃত জমীদারীর সকল আবশ্যকীয় কার্য্যই স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, সকল কর্ম্মচারীর উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন, সকল সদনুষ্ঠানের আয়ব্যয় নিজে দেখিতেন, সকল প্রজারই সুখ দুঃখের, সম্পদ বিপদের সংবাদ রাখিতেন; এমন কি তাঁহার জমীদারী মধ্যে তাঁহার অগোচর কিছুই থাকিত না। সেই অসংখ্য প্রকৃতিবর্গের মধ্যে তিনি সকলেরই প্রত্যয়াস্পদীভূত হইয়াছিলেন; একাধারে সকলেরই মিত্র, পিতা, গুরু ও রাজা স্বরূপ হইয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহার ইচ্ছার তিলমাত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করিত না, তাঁহারই পরামর্শে অবস্থিত থাকিত, তাঁহারই কথায় উঠিত, তাঁহারই কথায় বসিত। তিনি সেই প্রজাবর্গের শক্তির সমষ্টি স্বরূপ একটি

মহতী শক্তিরূপে তাহাদেরই কল্যাণার্থ সুশৃঙ্খলার সহিত, নিরলস হইয়া বিষয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইহা ব্যতীত বহু স্থানের বহুবিধ সদনুষ্ঠানের তিনিই নেতা স্বরূপ। সুতরাং তাঁহাকে অতি দৃঢ় পরিশ্রম করিতে হয়।

আজ সমস্ত দিন তিনি এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় বৈঠকখানার সম্মুখস্থ উদ্যানে এক বেদীর উপর একাকী বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার সময়টি তিনি নির্জ্জন চিন্তা ও ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং সে সময়ে কোন লোক সেখানে থাকিত না। কিছুক্ষণ এইরূপ একাকী থাকিলে পর শ্রীশচন্দ্র সেখানে আসিয়া বসিলেন। দৈনিক বিষয়কার্য্যাদি সম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "দেখ বিনয়, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব কয়দিন হইতে মনে করিতেছি, কিন্তু সুযোগ পাই নাই।"

বিনয়কুমার কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা ?"

শ্রীশচন্দ্র একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "রামনগরে সুকুমারীদের বৈঠকখানায় সে দিন আমরা সকলে যখন বৈষ্ণবীর গান শুনি, তোমাকে যেন কতকটা অন্যমনস্ক ও বিচলিত বোধ হইল! তাহার কারণ কি ?"

বি। হাঁ ইহা সত্য। শ্রীশ, আমি বিস্মিত হইলাম, তুমি ঠিক আমার মনের ভাব বুঝিয়াছ। সেই দিন হইতে আমার মনে একটি ভাব উদিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমিও তোমার সহিত কথা কহিব কয় দিন হইতে মনে করিয়াছি।

এই বলিয়া বিনয়কুমার কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্রও কিছু উদ্বিগ্নভাবে নীরব হইয়া রহিলেন। একবার আতঙ্ক হইল বুঝি বা সুকুমারীকে দর্শনে বিনয়কুমারের মনে পূর্ব্ববিকারের স্মৃতি উদিত হওয়ায়, তিনি এরূপ বিচলিত হইয়াছেন। আবার ভাবিলেন, "না, তাহা অসম্ভব।"

বিনয়কুমার পরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ শ্রীশ, সে দিন স্ত্রীলোকদের আহারকালে বিনোদিনী নামে যে একটি বিধবা রমণীকে লইয়া আহার করা সম্বন্ধে একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল, সে রমণীর কথা তুমি ত সব জান। আমি তাহাকে সন্ধ্যার সময় ময়দানে বেড়াইবার কালে একবার দেখিয়াছি। সংসারে প্রবঞ্চিত অতৃপ্তাশ ভগ্ন হৃদয়ের এরূপ জ্বলন্ত মূর্ত্তি আমি আর কখনও দেখি নাই। আর সেই গায়িকা বৈষ্ণবীকেও দেখিলাম। তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্তও আমরা উভয়েই শুনিয়াছি—সেও বিনোদিনীর ন্যায় প্রবঞ্চিত হইয়া পতিতা হয়। কিন্তু বৈষ্ণবী ত বিনোদিনী অপেক্ষা স্পষ্টতঃ অনেক সুখী বলিয়া বোধ হইল। দেখ উভয়েই নিম্ন অধিকারের রমণী, উভয়েরই চিত্তসংযম-শক্তি দুর্ব্বল। কিন্তু একজন প্রকাশ্যতঃ সেই দুর্ব্বল শক্তির অনুযায়ী ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সুখী হইয়াছে, অপরে তাহা না করিয়া উচ্চাধিকারীর ব্রতাবলম্বনের ভাণ করিতে গিয়া পদস্খলিত হইয়াছে, পদে পদে প্রবঞ্চিত হইয়াছে, অতৃপ্ত পিপাসায় দগ্ধ হইয়াছে, মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছে। অথচ সে সমস্ত কপটতার আবরণে ঢাকিয়া আবার দেখ সমাজে আসিয়া মিশিয়াছে। ইহা কি সমাজের ঘোর কলঙ্ক নহে?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিনয়কুমার নীরব হইলেন।

শ্রীশচন্দ্র একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "দেখ, এ যে তর্ক তোমার মনে উঠিয়াছে, এ ত সেই ছেলেবেলার পুরাণ তর্ক; এই তর্কে, এই চিন্তায় যে ভাব উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার বিষে ত ভাই একবার জর্জ্জরীভূত হইয়াছ। আবার সেই তর্কের পুনরুত্থাপন ভিন্ন ত এ সমস্যার মীমাংসা হয় না।"

বি। শ্রীশ, তোমার কথা বুঝিয়াছি। আমি একবার বিধবা বিবাহ করিতে নিজে উদ্যোগী হইয়াছিলাম বলিয়া এ বিষয় তুমি পুনরুত্থাপন

করিতে শঙ্কিত হইতেছ, আমার চিত্তবলের প্রতি সন্দিহান হইয়াছ। না শ্রীশ, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, তুমি যে বিষে আমি জর্জ্জরীভূত হইয়াছি ভাবিতেছ, তাহাতে আমি জর্জ্জরীভূত হই নাই, বরং তাহাতেই আমি নবজীবন লাভ করিয়াছি, সেই বিষ হইতে যে নিধি পাইয়াছি, তাহা আমার জীবনের অমূল্য নিধি। যদি সুকুমারীকে আমি না জানিতাম, যদি তাঁহার অপরিমেয় চরিত্র-বলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত না পাইতাম, যদি না বুঝিতাম সুকুমারীর ন্যায় উচ্চাধিকারিণী রমণী কি প্রভূত পরাক্রমে সকল প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, সংসারের সকল সুখস্পৃহাকে পদদলিত করিয়া ধ্রুবতারার ন্যায় পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে স্থির থাকিতে পারে, তাহা হইলে কি আমার মনে ব্রহ্মচর্য্যের পিপাসা জাগরিত হইত? তোমাকে যদি হৃদয় চিরিয়া দেখাইতে পারিতাম, তবে দেখিতে সুকুমারী বঙ্গের,—শুদ্ধ বঙ্গের কেন—সমগ্র হিন্দু জাতির ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনী রমণীগণের শিরোমুকুট স্বরূপ, আমার জীবনের নিয়ামক ও গুরু স্বরূপ, হৃদয় মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন, সে উচ্চ স্থান হইতে কোন অবস্থাতেই আর বিচ্যুত হইবার নহে। শ্রীশ, তুমি এ সম্বন্ধে চিন্তিত হইও না। আমি এখন যে কথা বলিতেছিলাম, তাহা ঠিক আমাদের পূর্ব্বের তর্ক নহে। সুকুমারীর দৃষ্টান্তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যারূপ মহাব্রত অতি যত্নে রক্ষণীয়, এবং যেমন ইহা রমণীপক্ষে বিবাহের উচ্চোদ্দেশ্যের পূর্ণতাসাধন, পুরুষপক্ষেও সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনীয়। কিন্তু এ নিয়ম কেবল উচ্চাধিকারীর পুরুষ রমণীর জন্য। কিন্তু উচ্চ জাতি হইলেই যে সকল সময়ে উচ্চাধিকারী হয়, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি না। সেই জন্য নিম্নাধিকারিণী রমণীগণের তদুপযোগী বিধান থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে সমাজের অনেক কলঙ্ক, অনেক দুঃখ বিদূরিত হয়, অনেক দগ্ধহৃদয় শান্তি পায়।

শ্রী। এ কথা ত বুঝিলাম, এবং ইহার যাথার্থ্যও প্রায় সকলেই

স্বীকার করিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ উচ্চাধিকারিণীও নিম্নাধিকারিণী রমণী-গণকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করা ও তাহাদের জন্য দ্বিবিধ বিধান স্থাপন করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করা কিরূপে সম্ভব, তাহা ত বুঝিতে পারি না। আর দেখ, হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে অচলা দৃঢ়তার মূল কারণ, আমি যত দূর বুঝিতে পারি, এই অনুশাসনের অখণ্ডনীয়তা। যদি বিধবারও স্থলবিশেষে বিবাহ হইতে পারে এ ধারণা থাকিত, তাহা হইলে যাহাদিগকে উচ্চাধিকারিণী বলিতেছ, তাহাদের মধ্যে, সকলে না হউক, অনেকেই যে নিম্নাধিকারিণী হইত এই আমার বিশ্বাস।

বি। শ্রীশ, তুমি যে আশঙ্কা করিতেছ সে আশঙ্কা আমার মনে যে উদয় না হইয়াছে তাহা নহে। এ কয় দিন যাবৎ আমি এই বিষয়েই চিন্তা করিতেছি। কিন্তু আমি যত দূর বুঝিতে পারি, অলঙ্ঘনীয় সামাজিক অনুশাসনের প্রভূত বল থাকিলেও অনেক স্থলে ইহা প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উদ্দীপনা প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ; এবং সে সকল স্থলে ফল এই হয় যে, কেবল বাহ্যাকারে মাত্র সেই অনুশাসন প্রতিপালিত হইয়া সমাজে কপটতার বৃদ্ধি ও সরলতা এবং সজীবতার হ্রাস করে। দেখ, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে মানবপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক অনুশাসন প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি জনিত শক্তি অপেক্ষা সাধারণতঃ দুর্ব্বল, যেখানে এই দুই শক্তির সামঞ্জস্য আছে, সেই সমাজেই স্ফূর্ত্তি ও সজীবতা বিদ্যমান। যেখানে সে সামঞ্জস্য নাই, সেখানে প্রাকৃতিক শক্তি সমাজিক অনু-শাসনকে বিফল করিয়া কোন না কোন প্রকারে আপন আধিপত্য বিকাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লয়। এক ভাবে দেখিলে আমাদের দেশের বৈষ্ণব সমাজ সেইরূপ একটি উপায়। আমার ত বিশ্বাস, আমা-দের দেশে ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠিত সমাজের কঠোর অনুশাসন সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই চৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তান্ত্রিক এবং শৈবদিগের মধ্যেও অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ্য

বিবাহ প্রথার কঠোরতা প্রশমিত করিবার প্রয়াস হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রী। তোমার কথা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। স্বীকার করিলাম যাহারা ব্রাহ্মণ্য সমাজের কঠোরতা সহ্য করিতে অক্ষম, তাহাদের অনেকে বৈষ্ণব সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাতে লাভ কি? আজ কাল অনেক স্থলে যে বৈষ্ণবীবৃত্তি বেশ্যাবৃত্তিরই অপর নাম হইয়াছে, তাহা কি জান না?

বি। তাহা জানি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সেটি সমাজনেতাদিগের অবজ্ঞা হেতু। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এক বীজমন্ত্র দ্বারা উচ্চ নীচ, পাপী তাপী সকলকে এক পর্য্যায়স্থিত করিতে চাহিয়াছিল। সে মন্ত্র "হরি-ভক্তি।" ভক্ত মাত্রেই সমপদস্থ। তাহাদের সাধন ভজন সমস্তই এই ভাবের পরিপোষক। এবং এই ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াই এককালে চৈতন্যদেব সমগ্র দেশ ভক্তিপ্রবাহে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, অনেক পাপী তাপী ঘৃণিতের বক্ষে আশাবাণীর মধুর উৎসাহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই এই ভাবটির ন্যায় সমাজের সম্প্রসারণী শক্তি আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু কেবল ভাবের উপর সমাজ দাঁড়ায় না। সমাজে বিধি বিধান চাই, শাসন চাই। কিন্তু সমাজশাসনকর্ত্তা বিধজ্ঞ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায়কে ঘৃণার চক্ষে, ঈর্ষার চক্ষে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শাসনহীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় সুতরাং ক্রমশঃই অধঃপতিত হইতে লাগিল।

শ্রী। আমি এখনও তোমার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি দুই সমাজেরই প্রশংসাও করিতেছ, নিন্দাও করিতেছ, সামঞ্জস্য কিরূপে করিবে।

বি। বাস্তবিক দুইএরই মধ্যে নিন্দা প্রশংসার অনেক কথা আছে। দুইএর প্রধান পার্থক্য এই ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিধিবহুল, বৈষ্ণব

সমাজ ভাবচালিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিধির উদ্দেশ্য, কেবল সমাজ সংরক্ষণ, সম্বর্দ্ধন নহে, বরং ইহা সম্বর্দ্ধনের সম্পূর্ণ বিরোধী। বৈষ্ণব সমাজ পাপী তাপী, উচ্চ নীচ সকলকেই ভগবৎপ্রেম দিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, সুতরাং ইহা সম্বর্দ্ধনের উপযোগী।

শ্রী। কিন্তু ভাই, যে সমাজ এত যুগ ধরিয়া জীবিত, যাহা বিজাতি এবং বিধর্ম্মীর অসংখ্য আক্রমণ সহ্য করিয়াও অটুট অক্ষয় ভাবে দণ্ডায়মান, তাহার ভিত্তি যে অতি দৃঢ় ও নির্দ্দোষ, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে।

বি। ব্রাহ্মণ্য সমাজ বহুযুগ হইতে আছে এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু আর যে ঠিক জীবিত আছে, বা অটুট অক্ষয় আছে, এ কথা বোধ হয় সত্য নহে। দেখ কেবল সংরক্ষণ অতি বার্দ্ধক্যের লক্ষণ, তাহাতে উদ্যম উৎসাহ স্ফূর্ত্তি কিছুই নাই, তাহা মৃতপ্রায়তা। সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন দুইএর মিশ্রণই স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য এবং যৌবনের লক্ষণ। যে সমাজে সম্প্রসারণশীলতা নাই, সে সমাজে উল্লাস, উৎসাহ, উদ্যম, শ্রীবৃদ্ধি থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য সমাজের আধুনিক সংরক্ষণশীলতা অনেকটা শুষ্ক কাষ্ঠের দুর্ভেদ্যতার ন্যায়। শুষ্ক কাষ্ঠে শীঘ্র কুঠার বসে না সত্য, কিন্তু তা বলিয়া কি তাহা বর্দ্ধনশীল সরস শ্যামল, পত্রপুষ্পশোভিত জীবন্ত তরু অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও প্রশংসনীয়? আর এই যে দুর্ভেদ্যতা, তাহাও কেবল গ্রন্থিস্থলে। শুষ্ক কাষ্ঠের অপরাংশ শীঘ্রই অসার ও পল্‌কা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য সমাজের উচ্চ জাতি কয়েকটিই ইহার সারাংশ ও গ্রন্থিস্থল স্বরূপ। ইহারা অনেক দিন টিকিয়াছে এবং এখনও অনেক দিন টিকিতে পারে; কারণ ইহাদের জাতিগত উচ্চাভিমান আছে। কিন্তু সেই উচ্চাভিমানবর্জ্জিত নিম্নজাতিগুলির কথা ভাব দেখি? ব্রাহ্মণ্য সমাজের সে অংশ কি অটুট অক্ষয়? এই যে হিন্দু সমাজের কোলে কোলে মহম্মদীয় সমাজ পরিপুষ্ট

হইয়াছে ও এখনও হইতেছে, সেটি কি অনেক স্থলে এই অংশ ভাঙ্গিয়া নয় ? আর ইহাও বলি, চৈতন্যদেব যে প্রেমতরঙ্গপ্রবাহে দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, যদি তাহার আস্বাদন না পাইত, যদি তাঁহার পতিতপাবন ধর্ম্মের মধুর সস্নেহ আশ্বাসবাণী না শুনিত, তাহা হইলে এই বঙ্গদেশে যে সকল নিম্ন স্তরের হিন্দু জাতি, কি উত্তরে হিমাচলতলস্থ দেশে, কি পূর্ব্বে আসাম প্রান্তে, কি দক্ষিণে সমুদ্রতটসন্নিকটস্থ সুন্দরবনে, এখনও মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নিজত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এত দিনে তাহারা মহম্মদীয় পতাকার ছায়া আশ্রয় করিত। সেই জন্যই বলি ব্রাহ্মণ্য সমাজে এখন বৈষ্ণবদিগের ভক্তিসাম্যমূলক সহৃদয়তা ও সম্প্রসারণশীলতা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। এবং তাহা আজ কাল সম্ভব ও সহজ। কারণ দুই সমাজ এখন অঙ্গাঙ্গীন ভাবে বর্ত্তমান। আর তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বের সে বিরোধিতা নাই।

শ্রী। আচ্ছা, তাহাতে যে নিম্নাধিকারিণী বিধবাদিগের কথা হইতেছিল, তাহাদের সুবিধা কি হইল ?

বি। তাহারা সমাজে একটা আশ্রয় পায়। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী বিধবা রমণীর বহুসম্মানসূচক সংস্কার বিধি স্থাপিত হউক, গর্ব্বিতা সধবা রমণী তাঁহাকে হতভাগিনী ভাবিয়া ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া, তাঁহার চরণে প্রণতা হউক, সমগ্র হিন্দু সমাজ তাঁহাকে দেবীযোগ্য পূজা প্রদান করুক; কিন্তু সে কঠোর ব্রত পালনে অক্ষমা রমণীও সমাজের শাসন ও সহানুভূতির মধ্যে থাকিয়া বিধিমতে বিবাহিতা হইয়া নিম্নাশ্রমে স্থান পাউক। এই মর্য্যাদা বিভাগে উচ্চাধিকারিণী রমণীর যে নিম্নাভিলাষের আশঙ্কা তাহাও নিরাকৃত হয়।

এই কথার পর শ্রীশচন্দ্র অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। বিনয়কুমারও কিছু বলিলেন না। তাহার পর শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ভাই বিনয়, তুমি আজ পদস্খলিতা বিধবা রমণীর উপলক্ষে যে ভক্তিসাম্য-